Written in accordance with the Board of Secondary Education, West Bengal's prescribed Syllabus of General Science (Compulsory) for Higher Secondary and Multipurpose Schools of West Bengal.

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

(উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

ও

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

উমাপতি বাজপেয়ী

ও

এ. মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রোগ্রেশিভ থিঙ্কারস্ লাইব্রেরী

৬২।৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

১৩৬২

প্রকাশক :—
এ. মুখোপাধ্যায়
৬২।৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান—চাটার্জ্জি পাবলিশার্স
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
শ্রীশিবদুর্গা প্রেস
১৩সি, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE FOR

HIGHER SECONDARY SCHOOLS

Class IX

Course Content :	*Demonstration and Expts.*
A. MECHANICS	
1. Work and energy as illustrated by activities in men and animals.	
2. What makes work hard : force of gravitation, friction, inertia.	
3. Simple machine to make work easier , inclined plane, lever, pulleys—simple	Demonstration experiments with wheel and axle pulleys.
B. GRAVITATION	
1. Why stones roll down and in doing so gather speed , motion or velocity and acceleration related to force.	
2. Galileo and the constant acceleration of gravity.	Coin and feather expt.
3. The simple pendulum	Expt. with simple pendulum.
4. The balance , spring balance, beam balance.	Use of a balance.
5. Newton and the Law of gravitation.	
6. The solar system according to Newton's Law, simple explanation of the tides, artificial satellites— weightless state	Appropriate illustrations and slides
C. LIGHT	
1. Light travels in a straight line ; shadows, eclipses	Construction of a pinhole-camera.
2. Reflection of Light at plane and spherical mirrors—concave (no mathematical formulae).	Construction of periscope ; formation of images by mirrors.
3. Refraction ; convex lenses (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water.
4. The eye as lens ; correction for defective eye sight (simple explanation).	Formation of image by lenses , use of prism to show formation of spectrum
5. The prism, dispersion of colours.	
6. Optical instruments ; magnifying glass, camera. Description and simple explanation of its working.	
D. HEAT	
1. *Main sources of heat* , Sun, mechanical action (friction). chemical reactions (burning of fuels), electricity.	
2. *Effects of heat* ; expansion of solids, liquids, gases (examples and applications), land and sea breezes.	Ball and ring experiment, bar breaking. Expansion of different metals, of liquids, of gases.
Thermometers : fixed points and scales, maximum and minimum thermometer, clinical thermometer.	Calibration of thermometer.

4. *Change of state* : melting, evaporation, boiling, condensing, freezing, heat required for melting, evaporation.

Melting and boiling points of different substances, preparation of ice by cooling ether.

5. *How heat travels :* conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), radiation (luminous and non-luminous rays).

Conduction . Ingenhausz expt., convection of liquids and gases.
Radiation , demonstration with ether thermoscope

6. *Energy :* (steam-engines, reciprocating engine (steam-boiler), locomotive,

Demonstration of models or by use of charts.

E. CHEMISTRY

1. Oxides, acids, bases mainly by examples.
2. Some common salts we use ; their composition and principal uses , common salt, sodium carbonate, washing soda, baking soda, potassium permanganate, magnesium sulphate, smelling salts, caustic soda (n b. some other common salts are treated below)
3. *Chlorine* , Preparation of chlorine, properties of chlorine, bleaching powder ; use to bleach, to disinfect.

Appropriate expts.

4. *Nitrogen :* air and nitrogen, ammonia, nitric acid, ammonium nitrates, sulphates (fertilisers), the nitrogen cycle.
5. Lime and its products : Chalk, lime burning, quicklime and slaked lime, softening of water.

F LIVING BEINGS

1. Nutrition.

Water culture expt.

2. Soil, its relation to plants

G. THE HUMAN BODY

1. Main skeleton, bones the framework for body activities, work of muscles, attachment of arm and leg muscles. (No detailed knowledge of anatomy is required)

Charts and models of human skeleton muscles and viscera.

2. Digestive system of man , mouth, teeth, tongue, gullet, stomach, small intestine, pancreas liver. actions of enzymes in aiding digestion.
3. Excretory system of man ; skin, lungs, kidneys, large intestine and anus.
4. Nervous system ; sensory organs (elementary ideas).
5. Food ; Source of energy for man. Our food needs, balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage). Meeting our food Needs ; eating habits, food misconceptions.

সূচীপত্র

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

উপক্রমণিকা

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ 'বিশিষ্ট জ্ঞান'। সুতরাং উহা একটি বিশিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় পথ দিয়া বহির্জগতের সাড়া মস্তিষ্কে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহা হইল স্থূল জ্ঞান। **পর্য্যবেক্ষণ** (Observation), **পরীক্ষা** (Experiment) ও **গবেষণা** (Research) দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানরাজিকে যখন এরূপভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসঙ্গত করা হয় যে, তাহা দ্বারা দেখা যায়, এক ঘটনা অন্য ঘটনা হইতে প্রসূত এবং ঘটনাপরম্পরা এক সাধারণ নিয়মের অনুবর্ত্তী, তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় **বিজ্ঞান** (Science)।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান জগতে নিয়ত কত কোটি কোটি ঘটনা ঘটিতেছে। সেই অগণিত আপাত-বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে এক একটি সাধারণ নিয়মের আবিষ্কার করিয়া তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা বিজ্ঞানের একটি সাধনা। আবিষ্কৃত সাধারণ সূত্রের বলে যাহা অগণিত, তাহা গণনার বিষয়ীভূত হয়; যাহা বিশাল তাহা হয় ক্ষুদ্র; এবং যাহা অসীম, তাহা সসীমে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে জগতের অসংখ্য বস্তু ও ঘটনাবলী কতকগুলি ধারা, শ্রেণী, গণ ও জাতির অন্তর্গত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের সম্বন্ধে পর্য্যালোচনার পথ সুগম হইয়া আসে। বিজ্ঞানের বলে মানুষের স্থূল দৃষ্টিশক্তি অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরিণত হয়। তখন উহা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য যবনিকাকেও ভেদ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহার ফলে অসাধ্য হয় সাধ্য, হেঁয়ালি হয় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ সত্য এবং অবোধ্য বোধের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে।

জীব, জড় ও শক্তি লইয়া প্রকৃতি। প্রকৃতির আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান বিজ্ঞানের বিষয়। আলোচনার পথ সুগম করিবার জন্য বিজ্ঞানের নানা ধারা। আমরা বিজ্ঞানের কয়েকটি ধারা এই পুস্তকে আলোচনা করিব। বিজ্ঞানের যে কোন ধারা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ইহার **এককগুলির** (Units) সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। "পরিমাপের একক সুনির্দ্দিষ্ট না হইলে বিজ্ঞান আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়" ইহাই বৈজ্ঞানিকদের অভিমত। একটি উদাহরণ লইলে

ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। একগাছি লম্বা দড়ি দিয়া যদি বলা হয় যে উহার দৈর্ঘ্য বাহির কর তাহা হইলে উহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। একটি ফুটরুল যদি দেওয়া এবং সেই ফুটরুল দিয়া যদি মাপিয়া দড়ির দৈর্ঘ ৭ ফুট পাওয়া যায়, তবে আমরা দড়ির দৈর্ঘ বলিব ৭ ফুট। ফুটকে দৈর্ঘ্যের একক ধরিয়া দড়ির দৈর্ঘ্য মাপিলাম। প্রত্যেক রাশি মাপিবার (যেমন দৈর্ঘ্য, আয়তন, ঘনত্ব, ভর, ভার বা ওজন, সময়, কোণ, বল, চাপ, শক্তি, তাপ, উষ্ণতা ইত্যাদি) এইরূপ এককের প্রয়োজন। **দৈর্ঘ্য** (Length), **সময়** (Time) ও **ভর** (Mass) পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে **মৌলিক একক** (Fundamental Units) বলে। দেখা গিয়াছে অন্যান্য অধিকাংশ এককই মৌলিক এককের উপর ভিত্তি করিয়া গঠন করা যায় এবং সেইজন্য তাহাদিগকে **লব্ধ একক** (Derived Units) বলে। একটি উদাহরণ লইলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। একক দ্রুতি (unit speed) বা একক বেগের (unit velocity) সংজ্ঞা হইল "একক দূরত্ব একক সময়ের মধ্যে অতিক্রমণ"। এই স্থলে দেখা যাইতেছে দ্রুতি ও বেগের একক দৈর্ঘ্য ও সময়ের এককের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মৌলিক এককের উপর নির্ভরশীল। **মৌলিক এককের** ক্ষেত্রে বিজ্ঞানে দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে :

(১) বৃটিশ বা **ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড** (F. P. S.) পদ্ধতি ও (২) ফ্রেন্স বা **সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড** (C. G. S.) পদ্ধতি। F. P. S. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক যথাক্রমে ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ড। C. G. S. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক যথাক্রমে সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ড।

দৈর্ঘ্যের একক (Uuits of Length) **:** পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দৈর্ঘ্যের একক বৃটিশ বা ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড (F. P. S) পদ্ধতিতে ফুট ও ফ্রেন্স বা সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড (C. G. S) পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার। লণ্ডনে ৬২°F (ফারেনহাইট্) উষ্ণতায় রক্ষিত একটি ব্রঞ্জ দণ্ড এক **গজ** (Yard) দৈর্ঘের নির্দেশ দেয়। ইহার $\frac{১}{৩}$ ভাগ হইল এক ফুট। প্যারিসে 0 C (সেন্টিগ্রেড্) উষ্ণতায় রক্ষিত একটি প্লাটিনাম দণ্ড এক **মিটার** (Metre) দৈর্ঘ্যের নির্দেশ দেয়। ইহার $\frac{১}{১০০}$ ভাগ হইল এক সেন্টিমিটার। এই দুইটি দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক হইল নিম্নরূপ :

1 **ফুট** = (প্রায়) 30·48 **সেন্টিমিটার** অথবা ,

1 **ইঞ্চি** = (প্রায়) 2·54 **সেন্টিমিটার** (12 ইঞ্চি = 1 ফুট)

বিভিন্ন দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয় ইঞ্চি ফুট, গজ, ফারলং, মাইল ইত্যাদি এবং ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হ মিলিমিটার, সেণ্টিমিটার, মিটার, কিলোমিটার ইত্যাদি।

বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতি
- 1 মাইল = 1760 গজ বা 8 ফারলং ;
- 1 গজ = 3 ফুট ;
- 1 ফুট = 12 ইঞ্চি।

ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতি
- 1 কিলোমিটার = 1000, মিটার ;
- 1 মিটার = 100 সেণ্টিমিটার বা 1000 মিলিমিটার।
- 1 সেণ্টিমিটার = 10 মিলিমিটার

দুইটি পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ :—

1 মাইল = 1·61 **কিলোমিটার**

100 কিলোমিটার = (প্রায়) 62 মাইল

1 মিটার = (প্রায়) 1·094 **গজ**

= (প্রায়) 3·28 **ফুট**

= (প্রায়) 39·371 **ইঞ্চি**

অতি ক্ষুদ্রতম বস্তু (যেমন অণু, পরমাণু বা তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু প্রোটন ইলেকট্রন ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশালাকার বস্তুর (যেমন দেশ, মহাদেশ সমুদ্র ইত্যাদি) বিস্তার আমরা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যের ভাষায় প্রকাশ করি। একটি বস্তু হইতে অপর একটি বস্তুর দূরত্বও আমরা দৈর্ঘ্যের ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকি অতি ক্ষুদ্রতম বস্তুর ক্ষেত্রে সেণ্টিমিটারকে আরও বিভক্ত করিয়া আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় **মাইক্রন** ও **আংস্ট্রোম** ব্যবহৃত হয়। ইহা নিম্নোক্ত দৈর্ঘ্যের নির্দেশ দেয় :—

1 মাইক্রন (μ) = $\frac{1}{10,000}$ **সেণ্টিমিটার** বা 10^{-4} **সেণ্টিমিটার**

1 আংস্ট্রোম (A) = $\frac{1}{10,000}$ **মাইক্রন** বা 10^{-8} **সেণ্টিমিটার**

অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্রতম বস্তুর ব্যাস প্রকাশিত হয় আংস্ট্রোম ও তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুর ব্যাস প্রকাশিত হয় মাইক্রনে। আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার ব্যাস প্রায় 7 মাইক্রন (μ) এবং বেধ (thick-

ness) প্রায় 1 মাইক্রন (μ)। লৌহের একটি পরমাণুর ব্যাস প্রায় 2·48 অ্যাংস্ট্রোম (A)।

বড় ও বিশালাকার বস্তুর বিস্তার এবং এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর সাধারণ দূরত্ব বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে ফুটের বৃহত্তর এককগুলি ব্যবহার করিয়া (যেমন গজ, ফারলং, মাইল) এবং ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে সেণ্টিমিটারের বৃহত্তর এককগুলি ব্যবহার করিয়া (যেমন মিটার, কিলোমিটার) প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণে বৃহত্তম বিস্তার ৫,৩০০ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বৃহত্তম বিস্তার ৩,১০০ মাইল। কাপড়ের বিস্তার 10 গজ, বহর ৪৬ ইঞ্চি। ঘরের দৈর্ঘ্য 16 ফুট। কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের দূরত্ব জলপথে 759 মাইল।

জ্যোতিষ্ক লোকের দূরত্ব মাপিবার জন্য আরও বৃহত্তর মাপকাঠির প্রয়োজন হয় এবং ইহার নাম **আলোকবর্ষ** (Light Year)। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1,86,000 মাইল বা প্রায় 3,00,000 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এক বৎসরে যত মাইল বা কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করিবে তত মাইল বা কিলোমিটার দূরত্বকে এক আলোকবর্ষ বলে। বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে

1 আলোকবর্ষ = প্রায় $1,86,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365\frac{1}{4}$ মাইল ;

ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে

1 আলোকবর্ষ = প্রায় $3,00,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365\frac{1}{4}$ কিলোমিটার।

ক্ষেত্রফল ও আয়তনের একক (Units of Area and Volume) :

ক্ষেত্রফল ও আয়তনের একক **লব্ধ একক** (Derived Units) পর্য্যায়ভুক্ত কারণ এই এককগুলি দৈর্ঘ্য এককের উপর নির্ভরশীল। বৃটিশ বা F. P. S পদ্ধতিতে **ক্ষেত্রফলের** একক **1 বর্গ ফুট** (অর্থাৎ একটি বর্গক্ষেত্রের বা squareএর প্রতিটি দিক 1 ফুট) ও ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক **1 বর্গ সেণ্টিমিটার** (অর্থাৎ একটি বর্গক্ষেত্রের বা Squareএর প্রতিটি দিক 1 সেণ্টিমিটার)। ক্ষেত্রফলের দুইটি এককের মধ্যে সম্পর্ক হইল নিম্নরূপ :

1 বর্গ সেণ্টিমিটার = ·155 বর্গ ইঞ্চি।

বস্তু যতটুকু স্থান অধিকার করে তাহাকে উক্ত পদার্থের **আয়তন** (Volume) বলে। **বৃটিশ** বা **F. P. S.** পদ্ধতিতে আয়তনের একক হইল **1 ঘন ফুট** (অর্থাৎ

একটি ঘনকের প্রতিটি দিক 1 ফুট) ও ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে আয়তনের একক হইল 1 **ঘন সেন্টিমিটার** (অর্থাৎ একটি ঘনকের প্রতিটি দিক 1 সেন্টিমিটার)। ফ্রেন্স বা C G. S. পদ্ধতিতে ব্যবহারিক আয়তনের একক হইল 1 **লিটার** (Litre)। ইহা 1000 **ঘন সেন্টিমিটারের** সমান। আযতনের দুইটি এককের মধ্যে সম্পর্ক হইল নিম্নরূপ :

1 **ঘন ফুট** (1 cubic foot) = 28·31 **লিটার** (litre) ;

তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক বৃটিশ বা F. P. S পদ্ধপতিতে 1 **গ্যালন** (Gallon)। ইহা 272·274 **ঘন ইঞ্চির** সমান ;

ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের একক 1 **লিটার** (Litre)। ইহা 1000 **ঘন সেন্টিমিটারের** সমান।

(ক) জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট কঠিন বস্তুর আযতন এইভাবে মাপা হয় :

(i) আযতক্ষেত্রবিশিষ্ট ঘনবস্তুর (Parallelopiped) আয়তন

$$= \text{দৈর্ঘ্য } (l) \times \text{প্রস্থ } (b) \times \text{উচ্চতা } (h)$$

(ii) ঘনকের (Cube) আয়তন = দৈর্ঘ্য^3 (l^3)

(iii) গোলকের (Sphere) আয়তন = $\frac{4}{3}\pi \times$ ব্যাসার্দ্ধ^3

$$= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times r^3 \left[\pi = \frac{22}{7}\ ;\ r = \text{গোলকের ব্যাসার্দ্ধ}\right]$$

(খ) জ্যামিতিক আকারহীন কঠিন বস্তুর আয়তন তরল পদার্থের অপসরণ দ্বারা নিরূপণ করা যায়। এমন একটি তরল পদার্থ লও যাহাতে কঠিন পদার্থটি দ্রবীভূত হয় না বা উহার সহিত কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। একটি অংশাঙ্কিত (graduated) চোঙের খানিকটা উক্ত তরল পদার্থে ভর্তি কর। তরল পদার্থের তলের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া দেখ। এখন কঠিন পদার্থটিকে সম্পূর্ণরূপে তরল পদার্থের মধ্যে ডুবাইয়া দাও ও তরল পদার্থটির তলের অবস্থান লক্ষ্য কর। দুই অবস্থানের পার্থক্য = অপসৃত (displaced) তরল পদার্থের আয়তন = কঠিন বস্তুটির আয়তন।

(গ) তরল পদার্থের আযতন বিভিন্ন মাপিবার পাত্রে (যেমন পিপেট, অংশাঙ্কিত চোঙ ইত্যাদি) ঢালিয়া স্থির করা হয়।

ভরের একক (Units of Mass) : কোন পদার্থে যে পরিমাণ বস্তু আছে তাহাকে ঐ পদার্থের **ভর** (Mass) বলে। ফ্রেন্স বা C. G S. পদ্ধতিতে ভরের একক **গ্রাম** (Gram)। প্যারিসে রক্ষিত একটি নির্দ্দিষ্ট প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম

স্তম্ভক 1 **কিলোগ্রাম** (Kilogram) ভরের নির্দেশ দেয়। ইহার $\frac{1}{১০০০}$ ভাগ হইল এক গ্রাম। প্যারিসে রক্ষিত স্তম্ভকটিকে মূল আন্তর্জাতিক কিলোগ্রাম (International Prototype Kilogram) বলা হয়। বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে ভরের একক **পাউণ্ড** (Pound)। লণ্ডনে রক্ষিত একটি নির্দিষ্ট প্লাটিনাম স্তম্ভক 1 পাউণ্ড ভরের নির্দেশ দেয়। ভরের দুইটি এককের মধ্যে সম্পর্ক হইল নিম্নরূপ :

1 **পাউণ্ড** (1 lb) = 453·6 **গ্রাম** (Gram)

ঘনত্ব (Density) :—কোন বস্তুর একক পরিমিত আয়তনে যতটুকু ভর অবস্থান করে তাহাকে ঐ পদার্থের **ঘনত্ব** (density) বলে। মনে কর একটি বস্তুর ভর ১৫ গ্রাম। আর উহার আযতন ৫ ঘন সেন্টিমিটার তাহা হইলে ঐ পদার্থের ঘনত্ব হইবে $\frac{১৫}{৫}$ = ৩ গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটার। যদি বলা হয় বস্তুটির ওজন ১০ পাউণ্ড ও উহার আয়তন ৫ ঘন ফুট, তাহা হইলে বস্তুটির ঘনত্ব হইবে $\frac{১০}{৫}$ = ২ পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুট। C.G.S. পদ্ধতিতে ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পরিস্রুত জলের ঘনত্ব এক গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে। সাধারণতঃ এমন কোন বস্তু আমাদের জানা নাই যাহার ঘনত্ব F. P. S. পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে। F. P. S. পদ্ধতিতে এক ঘন ফুট জলের ভর প্রায় ৬২·৪৩ পাউণ্ড অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে জলের ঘনত্ব ৬২·৪৩ পাউণ্ড প্রতি ঘন ফুটে।

সময়ের একক (Units of Time) : বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে ও ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে সময়ের একক হইল 1 **সেকেণ্ড** (Seconds)। ইহা দিনের মান হইতে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির (diurnal motion) জন্য আকাশপথে সূর্য্যের আপাত গতি উৎপন্ন হয়। পরপর দুইবার মধ্যরেখা (Meridian) অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহাকে 1 **সৌর দিন** (Solar Day) বলে [ভূপৃষ্ঠের কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু ও ভৌগোলিক মেরুর মধ্য দিয়া যে সমতল পাওযা যায় তাহাই মধ্যরেখা]। বহুবিধ কারণে সৌর দিনের মান বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়। বৎসরের বিভিন্ন সৌর দিনের মানের গড়কে **গড় সৌর দিন** (Mean Solar Day) বলে। ইহার $\frac{1}{২৪\times৬০\times৬০}$ ভাগকে বা $\frac{1}{৮৬৪০০}$ ভাগকে 1 **গড় সৌর সেকেণ্ড** বা 1 **সেকেণ্ড** (Seconds) বলে।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy) :—আমরা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি।

এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, ইহার মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি—একটি **পদার্থ** (Matter) ও আর একটি **শক্তি** (Energy)। কাঠ, কয়লা, পাথর, মাটি, জল, বায়ু, বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, ধাতুদ্রব্য, খনিজ-দ্রব্য, কীট, পতঙ্গ, ঝিনুক, শামুক, পশু, পক্ষী, মৎস্য, তৃণ, লতা, বৃক্ষ ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু পদার্থ শ্রেণীভুক্ত। কারণ এই বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইহারা স্থান ব্যাপিয়া থাকে এবং ইহাদের ভর আছে। **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্থানব্যাপী ও ভরবিশিষ্ট বস্তুমাত্রকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। শক্তি কি?** শক্তি সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়। একটি বল স্থির হইয়া আছে। আমরা একটি পদার্থ দেখিতেছি। পা দিয়া বলটিতে ধাক্কা দিলাম, বলটি চলিতে লাগিল। এই চলন্ত বলে পদার্থ সেই একই আছে কিন্তু এখন উহার মধ্যে গতি শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ইহা এখন কাজ করিতে পারে। কাঠের উপর বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হইল। গতিশীল গুলিটার শক্তি আছে। তাহা দ্বারা সে কাজ করিল, কাঠের আঁইসগুলিকে সরাইয়া দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাতাস বহিতেছে। প্রবাহমান বাতাসের শক্তি আছে, তাহা দ্বারা উহা নৌকার পালে চাপ দিল; ফলে নৌকা জলের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, **কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি**। সাধারণতঃ আমরা পদার্থের সহযোগে শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। সূর্য্য হইতে আমরা যে তাপ ও আলোক পাই, তাহাতে পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তাপ, আলোক বিভিন্ন প্রকার শক্তি। বেতারবার্ত্তায় যে তাড়িত শক্তির ব্যবহার হয় তাহাতেও পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তড়িৎ এক প্রকার শক্তি। তাপ, আলোক, তড়িৎকে কেন শক্তি বলিলাম তাহা পরে আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান পদার্থ ও শক্তিকে বিভিন্ন প্রকার বস্তুরূপে গ্রহণ করিত। ইহাদের প্রভেদের মূল মাপকাঠি ছিল 'ভর' ধর্ম্ম ('mass' property)। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিল। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** প্রমাণ করিলেন যে, কোন বস্তুর গতিশক্তি (kinetic energy) ক্রমাগত বর্দ্ধিত করিতে থাকিলে ইহার ভরও উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। বস্তুটির ভরের এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, ইহা বস্তুটির গতিশক্তির ক্রমাগত বৃদ্ধির দরুণ হইয়া থাকে। যেহেতু গতিশক্তি এক প্রকার শক্তি

এবং যেহেতু বস্তুর গতিশক্তির বৃদ্ধিতে উহার ভরের বৃদ্ধি হয় তখন আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে, শক্তির 'ভর' (mass) আছে। পদার্থ ও শক্তির মূল প্রভেদের মাপকাঠি এইভাবে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হইয়া যায়। আইনষ্টাইনের **অপেক্ষবাদ** (Theory of Relativity) হইতে আর একটি মূলতত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং তাহা এই, **পদার্থ ও শক্তির পরস্পর রূপান্তর সম্ভব** (Matter and Energy are interconvertible)। সম্প্রতি আইনষ্টানের এই মূলতত্ত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। পদার্থের বিলোপে শক্তির উদ্ভব হয় এবং শক্তির বিলোপে পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব [পদার্থের বিলোপে কি বিরাট ও প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব সম্ভব তাহা আইনষ্টাইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। পরীক্ষায় তাহা আছে প্রমাণিত]। সুতরাং পদার্থ ও শক্তিকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের এই মূল উপাদান দুইটি—**পদার্থ** ও **শক্তি**—একই উপাদানের রূপান্তর বিশেষ। এই একই উপাদানটি যে কি বস্তু তাহা বিজ্ঞান আজও পর্য্যন্ত উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই।

জড় পদার্থের গঠন (Structure of Matter)—প্রত্যেক জড় পদার্থের—তাহা মৌলিক পদার্থ বা মৌলই* হউক বা যৌগিক পবার্থ বা যৌগই* হউক—বিভাজ্যতা বলিয়া একটি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। যে কোন জড় পদার্থের একটি খণ্ড লইয়া উহাকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করিলে উহা ঐ জড় পদার্থ-ই থাকিয়া যায়। এক টুক্‌রা লোহাকে উকো দিয়া ঘষিলে উহা সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হয়। এই গুঁড়াকে যদি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করিয়া যাওয়া হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছান যায় যে উহাকে আরও বিভক্ত করিলে উহার ধর্ম্ম আর অপরিবর্ত্তিত থাকে না বা উহার স্বাধীন সত্তা থাকে না। কোন জড় পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম অংশে মূল পদার্থের সকল রাসায়নিক ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে এবং যাহার স্বাধীন সত্তা আছে, তাহাকে **অণু** (Molecule) বলে। অণুগুলি আবার ক্ষুদ্রতর

* যে সকল পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে আরও সরল ও অপর কোন বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল** বলে। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের **রাসায়নিক সংযোগে** (chemical combination) যদি কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহাতে মূল পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যাহাকে বিশ্লেষণ করিলে আরও সরল ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে **যৌগিক পদার্থ** বা **যৌগ** বলে।

কণার সমষ্টি। ইহাদিগকে **পরমাণু** (Atom) বলে (উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মনে করিত যে পরমাণুকে আর বিভক্ত করা যায় না। ইহারা অখণ্ড, নিরেট ও নিত্য বস্তু। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে পরমাণুর মধ্যে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। পরীক্ষা দ্বারা আবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া নূতন পরমাণু গঠিত হইতে পারে। সুতরাং আমাদের স্বীকার করিতেই হয় পরমাণু অখণ্ড, নিরেট ও নিত্য বস্তু নহে। এ সম্বন্ধে পরে কিছু আলোচনা করা হবে)। পরমাণুর বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাদের ধর্ম্ম জড় পদার্থ বা অণুর ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন এবং ইহারা স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায ইহারা অংশ গ্রহণ করে। একই মৌলের সকল পরমাণু একই প্রকার। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন। কোন যৌগিক পদার্থ যে সকল মৌলে প্রস্তুত, ঐ যৌগের অণুতে সেই সকল মৌলের পরমাণু থাকে। জলের একটি অণুতে উদজানের দুইটি ও অম্লজানের একটি পরমাণু থাকে।

একটি জড় পদার্থ বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি। জড় পদার্থের মধ্যে অণুগুলি নিরবকাশভাবে ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। উহাদের মধ্যে খানিক অবকাশ বা ফাঁক আছে। এই ফাঁকগুলিকে **আন্তরাণবিক ফাঁক** (Intermolecular spaces) বলে। ফাঁকগুলি শূন্য নহে, ইথার* নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। অণুগুলির মধ্যে একটা আকর্ষণী শক্তি ও একটা বিকর্ষণী শক্তি রহিয়াছে। আকর্ষণী শক্তিকে **আণবিক আকর্ষণ বল** (Intermolecular force of attraction) ও বিকর্ষণী শক্তিকে **আণবিক বিকর্ষণ বল** (Intermolecular force of repulsion) বলে। এই দুই শক্তি সকল জড় পদার্থে সকল সময়ে সমান থাকে না।

আকর্ষণী শক্তি প্রবল হইলে অণুগুলি পরস্পরকে নিকটে টানিয়া আনে। উহাদিগকে সহজে সরিয়া যাইতে দেয় না। তখন উহাদের মধ্যে অবকাশ অনেক কমিয়া যায় এবং অণুগুলি এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া কাঁপিতে থাকে। এরূপ অবস্থা ঘটিলে জড় পদার্থটি নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং তখন উহা **কঠিন** (Solid) বলিয়া গণ্য হয়।

* এই ইথার জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে এমন কি, মহাশূন্যের মধ্যেও বিশ্বব্যাপিয়া বিদ্যমান। ইহা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, ভারহীন ও ইন্দ্রিয়াতীত। ইথারের অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞানীদের একপ্রকার মানস-সৃষ্টি।

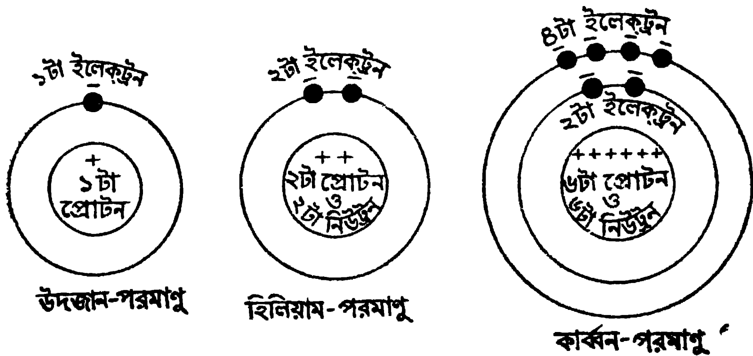
তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে ঐ আকর্ষণী শক্তি অনেক কম। কাজেই উহারা সহজে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে। সেইজন্য উহারা আধারের গায়ে গড়াইয়া পড়িয়া আধারের আকার প্রাপ্ত হয় এবং উহাদের উপরিভাগও সমতল হইয়া থাকে। তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে অবকাশও অপেক্ষাকৃত বেশী। খানিকটা জলের আয়তন মাপিয়া দেখ। পরে উহাতে খানিকটা চিনি মিশাইয়া দাও। দেখ, আয়তন বিশেষ বাড়িল না। চিনির তো একটা আয়তন ছিল। চিনির অণুগুলি জলের অণুর ফাঁকে ফাঁকে আশ্রয় লইয়াছে। সেইজন্য মোটের উপর আয়তন বাড়ে নাই। একটা পেরেক লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, উহা সহজেই জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে কারণ জলের অণুগুলি সহজে সরিয়া যাইতে পারে।

গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলির মধ্যে অবকাশ এত বেশী যে উহাদের আকর্ষণী শক্তি প্রায় কোন কাজ করে না। পক্ষান্তরে প্রবলতর বিকর্ষণী শক্তির জন্য অণুগুলি পরস্পর হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে এই হয় যে, গ্যাসীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন বা আকার থাকে না। যে কোন পাত্রে রাখিলে উহা প্রসারিত হইয়া তাহার সমস্তটাই পূর্ণ করিয়া ফেলে।

কোন কঠিন জড় পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে আণবিক বিকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে উহা প্রথমে তরল এবং তাহার পর গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার শৈত্য প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ তাপ বাহির করিয়া লইলে বিকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং গ্যাসীয় পদার্থ হইতে তরল এবং শেষ পর্য্যন্ত কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়।

পরমাণুর গঠন (Structure of Atom):—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরমাণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতম কোন অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক **ডাল্‌টনের** (Dalton) পরমাণুতত্ত্ব অনুসারে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, পরমাণু জড় পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ এবং ইহা অখণ্ড, নিরেট ও নিত্য বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এমন অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল, যাহার ফলে পরমাণুকে অখণ্ড, নিরেট ও নিত্য বস্তু বলা যায় না, যদিও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মৌলের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ একটি পরমাণু। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জড় পরমাণুর যে চিত্র কল্পনা করেন তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

প্রত্যেক জড়পরমাণুর মধ্যস্থলে একটি অতি সূক্ষ্ম গুরুভার কেন্দ্র রহিয়াছে। পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর ঐ কেন্দ্রে ঘনীভূত, ইহাকে পরমাণুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়স্ (nucleus) বলে। এই পরমাণুকেন্দ্র সর্ব্বদাই হাঁ-ধর্ম্মী তড়িৎযুক্ত (positively charged nucleus)। পরমাণুকেন্দ্রে **প্রোটন** ও **নিউট্রন** (proton & neutron) একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া অবস্থান করে। উদজান পরমাণুতে নিউট্রন থাকে না। প্রোটনের ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। নিউট্রনে কোন তড়িৎমাত্রা নাই। কিন্তু প্রত্যেক প্রোটনে হাঁ-ধর্ম্মী তড়িতের একটি একক থাকে (a unit positive charge of electricity)। কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সংখ্যা দ্বারা পরমাণুকেন্দ্রের হাঁ-ধর্ম্মী তড়িৎ-সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়। পরমাণুকেন্দ্রের হাঁ-ধর্ম্মী তড়িৎ এককের সংখ্যাকেই সেই জড় পদার্থের **পরমাণু-ক্রমাঙ্ক** (Atomic Number) বলে।



১নং চিত্র—পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্য

পরমাণুকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বসময়ে বৃত্ত বা উপবৃত্তাকার পথে প্রবল গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৩০০ মাইল বেগে) **ইলেকট্রন** (electron) ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রতি ইলেকট্রনে না-ধর্ম্মী তড়িতের একক থাকে (a unit negative charge of electricity)। কোন জড়পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা কেন্দ্রস্থ হাঁ-ধর্ম্মী তড়িৎ এককের সংখ্যার সমান। ফলে জড় পরমাণুটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ হয়। উপরে উদজান-পরমাণু, হিলিয়াম-পরমাণু ও কার্ব্বন-পরমাণুর গঠন দেখান হইল।

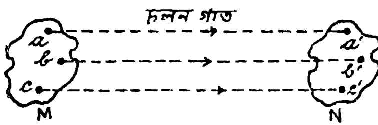
উদজান-পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন থাকে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটি ইলেক্‌ট্রন ঘুরিয়া বেড়ায়। হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ২টি ইলেক্‌ট্রন ঘুরিয়া বেড়ায়। কার্ব্বন-পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন থাকে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে ৬টি ইলেক্‌ট্রন দুইটি বেষ্টনীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিষয় অবগত আছি এবং আধুনিক বিজ্ঞান এই ৯২টি মৌলের পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্য জানিতে সক্ষম হইয়াছে। এই গঠন-বৈচিত্র্যের মূলতত্ত্ব হইল কেন্দ্রস্থ প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন বেষ্টনীতে ঘূর্ণ্যমান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা। ইহা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে নূতন পরমাণু (আমাদের জ্ঞাত ৯২টি মৌলের পরমাণু ব্যতীত) সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

উদজান-পরমাণুর পরমাণু-ক্রমাঙ্ক ১ কারণ ইহাতে একটি হাঁ-ধর্ম্মী প্রোটন আছে। উদজান-পরমাণুতে নিউট্রন থাকে না এবং ইহার **পারমাণবিক গুরুত্ব** (Atomic Weight) ঐ একটি প্রোটনের ভরের উপর নির্ভর করে, কারণ ইলেক্‌ট্রনের ভর নগণ্য বলিয়া হিসাবে ধরা হয় না। উদজান-পরমাণুর পরামাণবিক গুরুত্বকে ১ ধরা হয়। হিলিয়াম-পরমাণুতে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন আছে। ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব ৪ কারণ নিউট্রনের ভর প্রোটনের প্রায় সমান। কার্ব্বন-পরমাণুতে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন আছে। ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব ১২। আমরা যতগুলি মৌলের বিষয় অবগত আছি তাহার মধ্যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভর সবচেয়ে বেশী। ইহার কেন্দ্রে আছে ৯২টি প্রোটন ও ১৪৬টি নিউট্রন এবং কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন বেষ্টনীতে ৯২টি ইলেক্‌ট্রন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব ৯২টি প্রোটন + ১৪৬টি নিউট্রন = ২৩৮।

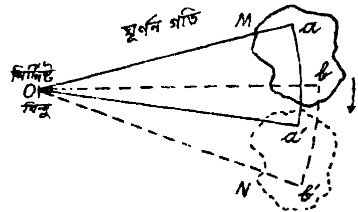
স্থিতি ও গতি (Rest and Motion) : যখন কোন বস্তু একই স্থানে থাকিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থির বিন্দুর সহিত (with respect to some point fixed in space) যে কোন সময়ে অবস্থানের কোন পরিবর্ত্তন করে না তখন বস্তুর ঐ অবস্থাকে **স্থিতি** (Rest) বলে। যখন বস্তুটি কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর সহিত সময়ের সাথে সাথে স্বীয় অবস্থানের পরিবর্ত্তন করে তখন তাহার এই অবস্থাকে **গতি** (Motion) বলা হয়। তুমি মাটিতে দাঁড়াইয়া আছ, দূরে একটি বাড়ীকে স্থির দেখিতেছ। চন্দ্রে কোন অধিবাসী থাকিলে ঐ বাড়ীটিকে লক্ষ্য

করিলে দেখিতে পাইবে যে, বাড়ীটি পৃথিবীর সহিত প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতেছে। যাহা তোমার কাছে স্থির, চন্দ্রের অধিবাসীর নিকট তাহা গতিশীল। সুতরাং বলা যায়, স্থিতি ও গতি এই দুই অবস্থা **আপেক্ষিক** (relative) অর্থাৎ ইহা পর্য্যবেক্ষকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। চরম স্থিতি (absolute rest) ও চরম গতির (absolute motion) সহিত আমরা পরিচিত নই কারণ পৃথিবী, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কই গতিশীল। স্থিতি বা গতি সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করিব তখন উহা আপেক্ষিক ইহাই বুঝিতে হইবে।

গতি প্রধানতঃ দুই প্রকার : **চলন** (Translation) ও **ঘূর্ণন** (Rotation)। (১) যখন কোন বস্তু এমনভাবে চলিতে থাকে যে চলার ফলে উহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি কণা একই দূরত্ব অতিক্রম করে তখন ঐ গতিকে **চলন** (translatory) বলে। ২নং চিত্রে দেখ, একটি দৃঢ় বস্তুর প্রথম অবস্থিতি M ও দ্বিতীয় অবস্থিতি N এবং বস্তুর প্রত্যেকটি কণা সমান দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে (যেমন $aa' = bb' = cc'$)। সুতরাং ইহা চলন গতির উদাহরণ।



২নং চিত্র—চলন গতি



৩নং চিত্র—ঘূর্ণন গতি

(২) যখন কোন বস্তু এমনভাবে চলিতে থাকে যে তাহার প্রত্যেকটি কণা একটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষ হইতে সমান দূরত্ব রাখিয়া পরিভ্রমণ করে তখন সেই গতিকে ঘূর্ণন (rotatory) বলে। ৩নং চিত্রে দেখ, একটি দৃঢ় বস্তু প্রথম অবস্থিতি M হইতে দ্বিতীয় অবস্থিত N এ এমনভাবে আসিয়াছে যে O এই নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে বস্তুটির মধ্যস্থিত যে কোন কণা সমান দূরত্বে রহিয়াছে (যেমন $oa = oa'$, $ob = ob'$)। সুতরাং ইহা ঘূর্ণন গতির উদাহরণ।

সরণ (Displacement) : কোন গতিশীল বস্তুর একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অবস্থানের পরিবর্ত্তনকে **সরণ** (displacement) বলে। চলন গতির ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ

অবস্থানের মধ্যে সরল রৈখিক দূরত্ব (straight line distance) ও ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ অবস্থানের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব দ্বারা (angular distance) সরণ মাপা হয়। সরণের **পরিমাণ** (magnitude) ও **অভিমুখ** (direction) থাকে। একটি মানুষ 8 গজ দক্ষিণদিকে গিয়া 6 গজ সোজা পশ্চিমে যায়। মানুষটির গতিপথ $8+6=14$ গজ হইল কিন্তু সরণ হয় $\sqrt{8^2+6^2}=\sqrt{100}=10$ গজ দক্ষিণ-পশ্চিম।

দ্রুতি (Speed): গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে **দ্রুতি** (Speed) বলে। একক সময়ে (unit time—1 সেকেণ্ড) অতিক্রান্ত বক্র বা সোজা পথের দৈর্ঘ্য হইল দ্রুতির মাপ। দ্রুতির সহিত অভিমুখের (direction) কোন সম্বন্ধ নাই। পরিমাণ (magnitude) দিয়া ইহাকে নির্দ্দেশ করা হয়।

বেগ (Velocity): কোন বিশেষ অভিমুখে গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্ত্তনের হারকে **বেগ** (Velocity) বলে। একক সময়ে (unit time—1 সেকেণ্ড) গতিশীল বস্তুটির অভিমুখে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য হইল বেগের মাপ। বেগ নির্দ্দেশের জন্য পরিমাণ (magnitude) ও অভিমুখ (direction) উভয়ই প্রয়োজন। কোন নির্দ্দিষ্ট অভিমুখে দ্রুতির নামই বেগ। ঘড়ির কাঁটা বৃত্তাকার পথে ঘোরে এবং প্রতি একক সময়ে একই পথ অতিক্রম করে। সমস্ত পথেই কাঁটার দ্রুতি একই হইবে কিন্তু কাঁটার বেগ প্রতি মুহূর্ত্তে এক থাকিবে না কারণ প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁটার দিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্রুতি ও বেগের ইহাই হইল পার্থক্য। দ্রুতি ও বেগ **সম** (uniform) বা **অসম** (variable) হইতে পারে। সরল রেখার দৈর্ঘ্য দ্বারা বেগের পরিমাণ ও তীর চিহ্ন দ্বারা অভিমুখ প্রকাশ করা হয়।

দ্রুতি বা বেগের একক (Units of Speed or Velocity): বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে দ্রুতি বা বেগের **একক** প্রতি সেকেণ্ডে 1 ফুট (1 ft. per sec. বা 1 ft. sec.) এবং ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে দ্রুতি বা বেগের **একক** প্রতি সেকেণ্ডে 1 সেণ্টিমিটার (1 cm. per. sec. বা 1 cm. sec.)।

ত্বরণ (Acceleration): ক্রমবর্দ্ধমান বেগের পরিবর্ত্তনের হারকে **ত্বরণ** (acceleration) বলে। বেগের ন্যায় ত্বরণের পরিমাণ (magnitude) ও অভিমুখ (direction) আছে। বেগের ন্যায় ত্বরণ সম বা অসম হইতে পারে। সমবেগের কোন ত্বরণ থাকে না।

মনে কর কোন বস্তুর বেগ প্রথম সেকেণ্ডে 2 ফুট এবং পাঁচ সেকেণ্ড পরে বেগ বাড়িয়া হইল প্রতি সেকেণ্ডে 12 ফুট। ত্বরণ বাহির করিতে হইবে।

5 সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্ত্তন = 12 ft/sec − 2 ft/sec = 10 ft/sec.

$$\therefore \text{ ত্বরণ} = \text{বেগের পরিবর্ত্তনের হার} = \frac{10 \text{ ft/sec}}{5 \text{ sec}}$$

$$= 2 \text{ ft. per.sec.per.sec. বা সংক্ষেপে } 2\text{ft/sec}$$

(প্রতি সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্ত্তনের হার 2 ফুট/সেকেণ্ড)

ত্বরণের একক Units of Acceleration) **:** বৃটিশ বা F. P. S. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক 1 ফুট/সেকেণ্ড² বা প্রতি সেকেণ্ডে 1 ফুট/সেকেণ্ড ও ফ্রেন্স বা C. G. S. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক 1 সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড² বা প্রতি সেকেণ্ডে 1 সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড।

গতি সম্পর্কীয় সমীকরণ (Equations of Motion) **:** কোন বস্তু সরল রেখায় চলিতে থাকিলে উহার সরণ, সময়, বেগ ও ত্বরণ নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা সূচিত হয়। এই সমীকরণগুলি প্রথমে বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** (Galileo) দ্বারা রচিত হয়। ধরা যাক্, কোন বস্তুর t সময়ের প্রথমে বেগ = u, ত্বরণ = f t সময়ের শেষে বেগ = v এবং t সময়ে অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য = s.

(ক) **সমবেগ সম্পন্ন গতি** (Motion with uniform velocity) বস্তুটি সমবেগে যাইতেছে, সুতরাং ইহার ত্বরণ শূন্য। প্রতি একক সময়ে বস্তুটি u একক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। t সময়ে বস্তুটি $u \times t$ একক পথ অতিক্রম করিবে। অর্থাৎ

$$s = ut \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$$

(খ) **সমত্বরণ সম্পন্ন গতি** (Motion with uniform acceleration) **:** বস্তুটির প্রাথমিক বেগ u এবং সমত্বরণ f এইভাবে চলিতেছে। প্রতি একক সময়ে বেগ f দ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছে। t সময়ে বেগ $f \times t$ বাড়িয়া যায় ; সুতরাং t সময়ের পর বস্তুটির বেগ

$$v = u + ft \quad \cdots \quad \cdots \quad (2)$$

$$\therefore \; f = \frac{v - u}{t} \quad \text{অথবা ত্বরণ} = \frac{\text{বেগের বাড়তি}}{\text{সময়ের ব্যবধান}}$$

(গ) **সমত্বরণ সম্পন্ন গতির ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত পথের পরিমাণ** (To find space described with uniform acceleration) :

প্রথম সেকেণ্ডের পর বেগ $= u + f$

শেষ সেকেণ্ডের আগের সেকেণ্ডের শেষ বেগ

i e $(t-1)$ th সেকেণ্ডে $= v - f$

$\therefore$ t সময়ের প্রথমের ও শেষের গড় বেগ

$$= \tfrac{1}{2}(u + f + v - f) = \frac{u+v}{2}$$

ত্বরণ যখন সম (uniform) তখন বস্তুটি t সময়ে এই গড় বেগ সম্পন্ন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। t সময়ে অতিক্রান্ত পথ হইবে গড় বেগ $\times$ সময়

$$= \frac{u+v}{2} \times t$$

$$= \frac{u+u+ft}{2} \times t \qquad (\text{যেহেতু } v = u + ft)$$

$$= \frac{2u+ft}{2} \times t$$

$$= ut + \tfrac{1}{2}ft^2$$

অর্থাৎ $s = ut + \tfrac{1}{2}ft^2$ ... ... (3)

নিউটনের গতি-সূত্র

(Newton's Laws of Motion)

নিউটনের গতি-সূত্রগুলি পদার্থ, গতি ও বলের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয় এবং এই সূত্রগুলি গতি-বিজ্ঞানের (Dynamics) ভিত্তিস্বরূপ।

প্রথম সূত্র (First Law) : **বাহ্যিক প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বাধ্য না হইলে, অচল বস্তু অচল অবস্থায় থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখা ধরিয়া চলিবে** (*Everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it be compelled by any external impressed force to change that*

state)। এই সূত্রটিকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম অংশে পদার্থের একটি মৌলিক ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। যে পদার্থ স্থির তাহা স্থির অবস্থায় থাকিতে চায়, আর যে পদার্থ সচল তাহা স্বাভাবিক ভাবেই সচল থাকিতে চায়। মনে কর, টেবিলের উপর একটি বল স্থির অবস্থায় আছে। উহা আপনা হইতে কখনও চলিবে না। তুমি ঠেলিয়া দিলে উহা চলিতেই থাকিবে এবং একবার চলিলে উহা সচলই থাকিবে; আপনা হইতে উহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। **পদার্থ আপন স্থিতি বা গতির অবস্থা আপনা হইতে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।** পদার্থের এই ধর্ম্মের নাম **জড়তা** (Inertia)। বলটি টেবিলের উপর গড়াইয়া খানিকটা গিয়া থামিবে, কিন্তু তাহা নিজের শক্তিতে নহে। টেবিলের ঘর্ষণে (friction) বাধা পাইয়া ও বায়ুর রোধশক্তির (বা ঘর্ষণ বাধা) জন্য উহা থামিবে। যদি ঐ ঘর্ষণজনিত বাধাগুলি না থাকিত তাহা হইলে উহা চিরদিনই সচল অবস্থায় রহিয়া যাইত। পদার্থের জড়তা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সূত্রের দ্বিতীয় অংশে **বলের** (Force) সংজ্ঞার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহা কোন বস্তুর স্থির অবস্থান বা সমগতির অভিমুখ বা পরিমাণ পরিবর্ত্তিত করে তাহাকে বল বলে। বলের এই সংজ্ঞা যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায় কিন্তু ইহা কিছু **ত্রুটিপূর্ণ**। ধরা যাউক এক ব্যক্তি ভারী কোন বস্তুকে ধাক্কা দিতেছে, কিন্তু বস্তুটি স্থির আছে অর্থাৎ চলিতেছে না। বলের উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলিতে হয় এক্ষেত্রে বল প্রযুক্ত হইতেছে না কারণ বস্তুটির অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বল প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ত্রুটি হইতে মুক্ত করিবার জন্য বলের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়: **যাহা কোন বস্তুর স্থির অবস্থান বা সমগতির অভিমুখ বা পরিমাণ পরিবর্ত্তিত করে বা করিতে প্রয়াস পায় তাহাকে বল** (Force) **বলে।**

দ্বিতীয় সূত্র (Second Law): নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে আমরা বলের (force) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয় সূত্র হইতে আমরা বিভিন্ন বল পরিমাপ করিতে ও তুলনা করিতে এবং ত্বরণের (acceleration) সহিত বলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারি। দ্বিতীয় সূত্রটি এইরূপ: **কোন বস্তুর বেগ পরিবর্ত্তন বা কোন বস্তুর ভরবেগ** (Momentum) **পরিবর্ত্তনের হার উহার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক** এবং **বল যে দিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্ত্তন সেই দিকে ঘটে** (*The change of motion or, the rate of change of*

momentum is proportional to impressed force and takes place in the direction of the straight line in which the force acts)। ভরবেগ বলিতে আমরা কোন গতিশীল বস্তুর মোট গতির পরিমাণ বুঝি। ইহা ভর ও বেগের গুণফলের সমান। ভর যদি m হয় ও বেগ যদি v হয় তবে ভরবেগ mv। বিজ্ঞানে এককের যে দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে—যথা বৃটিশ বা ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড (F. P. S.) পদ্ধতি এবং ফ্রেন্স বা সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড (C. G. S.) পদ্ধতি,—তাহার সাহায্যে ভরবেগ পরিমাপ করা হয়। F. P. S. পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড ভরের বস্তু এক সেকেণ্ডে এক ফুট যাইলে ইহার ভরবেগ 1 F. P. S. unit হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে বস্তুর ভরবেগ পাউণ্ড-ফুট-সেকেণ্ড এককে প্রকাশিত করা হয়। C. G. S. পদ্ধতিতে এক গ্রাম ভরের বস্তু এক সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার যাইলে ইহার ভরবেগ 1 C. G. S. unit হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতিতে বস্তুর ভরবেগ গ্রাম-সেন্টিমিটার-সেকেণ্ড এককে প্রকাশিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক একটি 10 পাউণ্ড ভরের বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে 50 ফুট বেগে চলিতেছে। ইহার ভরবেগ হইবে $10 \times 50 = 500$ পাউণ্ড-ফুট-সেকেণ্ড একক (500 F. P. S. units)।

ধরা যাক, কোন বস্তুর ভর m, P সমান বল এই বস্তুর উপর t সময় ক্রিয়া করার পর বস্তুটির বেগ u হইতে v-তে পরিবর্ত্তিত হইল। তাহা হইলে t অবকাশে ভরবেগের পরিবর্ত্তন $= mv - mu$

$$\therefore \text{ ভরবেগের পরিবর্ত্তনের হার} = \frac{mv - mu}{t} = \frac{m(v-u)}{t}$$

$$= mf \quad \left(\because f \text{ (ত্বরণ)} = \frac{v-u}{t} \right)$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র হইতে

$$P \propto \text{ভরবেগের পরিবর্ত্তনের হার} \propto mf$$

$$\therefore \ P = kmf \text{ [k একটি ধ্রুবক (constant)]}$$

এই ধ্রুবকের মান বলের এককের উপর নির্ভর করে। একক ভরের উপর প্রযুক্ত হইয়া যে বল একক ত্বরণ সৃষ্টি করিবে তাহাকে যদি বলের একক ধরি, তাহা হইলে উপরোক্ত সমীকরণে

$$p = 1, \ m = 1, \ f = 1$$

$$\therefore \ k = 1$$

সুতরাং উপরোক্ত মাত্রার বলকে 'একক বল' ধরিলে লেখা যায়

$$P=mf$$

[এখানে ধরা হইয়াছে m-এর মান গতির সহিত পরিবর্ত্তিত হয় নাই, আইনষ্টাইনের অপেক্ষবাদ অনুসারে mএর মান গতির সহিত পরিবর্ত্তিত হয়] ইহা বল পরিমাপের সমীকরণ।

বলের একক (Unit of Force) **:** বলের দুইটি এককের সহিত তোমাদের পরিচিত হইতে হইবে। একটি **নিরপেক্ষ একক** (Absolute unit) ও অপরটি **মহাকর্ষীয় একক** (Gravitational unit)। (**ক**) নিরপেক্ষ এককের ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে একক বলের নাম **ডাইন** (Dyne)—ইহা এমন একটি বল যাহা এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে। F. P. S. পদ্ধতিতে একক বলের নাম **পাউণ্ডাল** (Poundal)—ইহা এমন একটি বল যাহা এক পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক ফুট/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে। (**খ**) মহাকর্ষীয় এককের ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে একক বলের নাম **গ্রাম-ভার** (Gramme-Weight or Gm. wt.)—ইহা এমন একটি বল যাহা এক গ্রাম ভরকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। F. P. S. পদ্ধতিতে একক বলের নাম **পাউণ্ড-ভার** (Pound-Weight or lb. wt.)—ইহা এমন একটি বল যাহা এক পাউণ্ড ভরকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। C. G. S. পদ্ধতিতে বা F. P. S. পদ্ধতিতে পৃথিবীর আকর্ষণীয় বল এইরূপ যে প্রতি বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে 981 সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ত্বরণ বা 32·2 ফুট/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে। এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়ার ফলেও উক্ত ত্বরণ উৎপন্ন হইবে।

নিরপেক্ষ এককের ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে এক ডাইন বল এমন বল যাহা এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে। উক্ত ভরের উপর প্রতি সেকেণ্ডে 981 সেন্টিমিটার/সেকেণ্ডে ত্বরণ উৎপন্ন করিতে হইলে 981 ডাইন বলের প্রয়োজন। যেহেতু C. G. S. পদ্ধতিতে পৃথিবীর আকর্ষণীয় বল—গ্রাম-ভার (gm. wt.)—এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে 981 সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে সেহেতু **এক গ্রাম-ভার=981 ডাইন**।

F. P. S. পদ্ধতিতে পৃথিবীর আকর্ষণীয় বল এইরূপ যে প্রতি বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে 32·2 ফুট/সেকেণ্ড ত্বরণ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বের যুক্তি অনুযায়ী F.P.S পদ্ধতিতে পৃথিবীর আকর্ষণীয় বল—**পাউণ্ড-ভার** (lb. wt.) = 32·2 **পাউণ্ডাল।**

পাউণ্ডাল ও ডাইনের সম্পর্ক (Relation between a poundal and a dyne) **:** পাউণ্ডালকে ডাইনে পরিণত করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এক পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম এবং এক ফুট = 30·48 সেণ্টিমিটার।

∴ 1 **পাউণ্ডাল** = 453·6 গ্রাম × 30·48 সেণ্টিমিটার = 13825·7 **ডাইন**

তৃতীয় সূত্র (Third Law) **: প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে** (*To every action there is an equal and opposite reaction*) **:** যখনই কোন বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন উপরোক্ত সূত্র অনুসারে দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর একটি **সমান** ও **বিপরীত** বল প্রয়োগ করিবে। বস্তু দুইটি নিশ্চল বা গতিশীল থাকুক, কিংবা তাহারা পরস্পর সংস্পর্শে থাকুক বা দূরে থাকুক এই সূত্র সর্ব্বদাই খাটে। (১) তুমি মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছ। দেহের ভার থাকায় তোমার পা মারফৎ মাটির উপর চাপ পড়িতেছে; ইহা ক্রিয়া (Action)। তুমি মাটির উপর যতক্ষণ দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছ মাটিও **সমান** ও **বিপরীত** দিকে তোমার পায়ের উপর ঠেলা দিতেছে, ইহা প্রতিক্রিয়া (Reaction)। এই দুইটি বল সমান ও বিপরীতমুখী হয়। ইহা নিশ্চল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। তুমি যখন নরম ও জলাভূমির উপর দাঁড়াও তখন মাটির প্রতিক্রিয়া দেহের ভার বহন করিতে নাও পারে এবং ফলে তোমার পা আস্তে আস্তে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এক্ষেত্রে যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেহভারের একটা অংশ মাটির প্রতিক্রিয়ার সহিত সমান হয় এবং দেহভারের বাকী অংশ ক্রিয়াশীল বলের (moving force) ন্যায় কার্য্য করে। ইহার সহিত তৃতীয় সূত্রের কোন সম্পর্ক নাই; ইহার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী হইবে।

আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। পৃথিবীর আকর্ষণে একটি বারিবিন্দু ভূপৃষ্ঠে আসিতেছে। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বারিবিন্দুটি সমান বলে পৃথিবীকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন করা যায়, বারিবিন্দু ভূপৃষ্ঠের দিকে না আসিয়া পৃথিবী কেন বারিবিন্দুর দিকে ছুটিয়া যাইতেছে না? ধর বারিবিন্দুর

ভর m এবং পৃথিবীর ভর M এবং পৃথিবী বারিবিন্দুকে P বলে আকর্ষণ করে। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী বারিবিন্দু পৃথিবীকে P বলে আকর্ষণ করিবে। ধরা যাক, বারিবিন্দুর ত্বরণ f_1 ও পৃথিবীর ত্বরণ f_2। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী

$$P = mf_1 \text{ এবং } P = Mf_2$$

$$\therefore \quad mf_1 = Mf_2$$

$$\therefore \quad f_2 = \frac{mf_1}{M}.$$

পৃথিবীর ভর বারিবিন্দুর ভর অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বেশী। সুতরাং বারিবিন্দুর দিকে পৃথিবীর ত্বরণ f_2 পৃথিবীর দিকে বারিবিন্দুর ত্বরণ f_1 এর তুলনায় সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। এই কারণে সমান আকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও বারিবিন্দু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। পৃথিবী বারিবিন্দুর দিকে ছুটিয়া যায় না।

Questions

1. Write a note on the importance of 'Units' in the study of Science.
2. What is matter ? Would you consider light and heat as matter ?
3. Explain the structure of matter.
4. Explain the structure of atom.
5. Explain the following terms with illustrations : Speed, Velocity, Acceleration.
6. State and explain Newton's laws of motions.

প্রথম অধ্যায়

বলবিদ্যা (*Mechanics*)

কার্য্য ও শক্তি

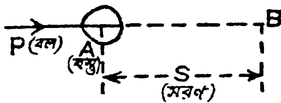
(Work and Energy)

দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যের উদাহরণ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। মুটে যখন মোট বহন করে, ঘোড়া বা গরু যখন গাড়ী টানে, কূয়া হইতে যখন আমরা জল তুলি তখন প্রত্যেকেই কিছু কার্য্য করে। সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে যে ক্রিয়ায লিপ্ত থাকিলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ ঘটে তাহাকেই আমরা কার্য্য বলি। কিন্তু বলবিদ্যায (Mechanics) কার্য্যের এই সংজ্ঞা গ্রহণীয় নয়। যদি কোন ব্যক্তি গুরুভার বস্তু বহুক্ষণ ধারণ করিয়া রাখে তাহা হইলে সাধারণ ভাষায় আমরা বলিব সে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু বলবিদ্যায় ইহা কার্য্য নহে। বলবিদ্যায় কার্য্যের সংজ্ঞা এইরূপ :

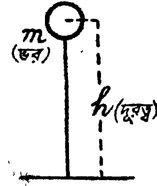
কার্য্য (Work) : কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে যদি বস্তুতে গতির সঞ্চার হয় তবে আমরা বলি বল কার্য্য করিতেছে (*A force acting on a body is said to do work when it produces motion of a body*)। বস্তুটি যদি বলের ক্রিয়া মুখে সরিয়া যায় তবে বলা হয় বল কার্য্য করিতেছে এবং বস্তুটিকে যদি বলের ক্রিয়ামুখের বিপরীত দিকে সরান হয় তখন বলা হয় বলের বিরুদ্ধে কার্য্য হইতেছে। কোন ভারী বস্তুকে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে উপরে তোলা হয়, তবে যে তুলিবে তাহাকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। গাড়ী টানিবার সময় ঘোড়া ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করে। এরোপ্লেন শূন্যে চলিতে গিয়া বাতাসের বাধার বিরুদ্ধে কার্য্য করে। কেহ যদি একখণ্ড ভারী পাথর বহুক্ষণ ধরিয়া ঠেলে কিন্তু পাথর বরাবরই স্থির থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বলিতে হইবে কোন কার্য্য হইল না।

কার্য্যের মান (Measure of Work) : কোন বল কর্ত্তৃক বা ইহার বিরুদ্ধে যে কার্য্য হয় তাহা ঐ বলের মান ও বলের ক্রিয়ামুখে বলের প্রয়োগ বিন্দুর স্থান চ্যুতির বা সরণের (displacement) গুণফল দ্বারা মাপা হয়। যদি কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল P প্রয়োগ বিন্দুকে বলের দিকে S দূরত্ব সরাইয়া লইয়া যায় এবং কার্য্য যদি W হয় তবে

$$W = P. S.$$



৪নং চিত্র—কার্য্যের মান নিরূপণ



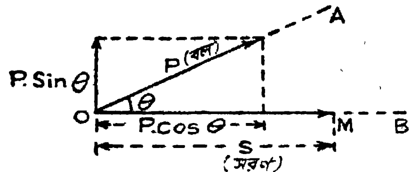
৫নং চিত্র—কার্য্যের মান নিরূপণ

যদি m ভরবিশিষ্ট বস্তুকে উল্লম্বভাবে h দূরত্ব পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ দিকে তোলা হয় এবং কার্য্য যদি W হয় তবে

$$W = mgh$$ [mg পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের মান নির্দ্দেশ দেয় যাহা m ভরের উপর কার্য্য করিতেছে]

যদি স্থানচ্যুতি বা সরণের (displacement) অভিমুখ ও বলের অভিমুখের মধ্যে কোণ উৎপন্ন হয় (অন্য বলের ক্রিয়ার জন্য এইরূপ হওয়া সম্ভব) তবে সরণের অভিমুখে P বলের উপাংশ (Component or Resolved Part) যাহা কার্য্য করিতেছে তাহার পরিমাণ হইবে $P. \cos\theta$ এবং সরণ যদি S হয় এবং W যদি কার্য্য হয় তবে

$$\therefore W = S \times P \cos\theta$$
$$= P. S \cos\theta$$



৬নং চিত্র—কার্য্যের মান নিরূপণ

বলের আর একটি উপাংশ P sin θ এবং এই দিকে সরণ শূন্য (কারণ সরণ ইহার লম্বদিকে)। সুতরাং এই উপাংশের (Component or Resolved Part) কৃত কার্য্য শূন্য। সুতরাং P বল দ্বারা কৃত মোট কার্য্য এইক্ষেত্রে

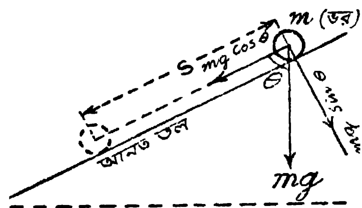
$$W = P. S \cos\theta$$

আনত তলের উপর দিয়া m ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু গড়াইয়া পড়িতেছে এবং আমাদের অভিকর্ষ দ্বারা কৃত কার্য্য পরিমাপ করিতে হইবে। বস্তুটির উপর পৃথিবীর

আকর্ষণজনিত বলের মান mg এবং ইহা উল্লম্বভাবে নিম্নদিকে কার্য্য করে। স্থানচ্যুতি বা সরণের অভিমুখ ও বলের অভিমুখের মধ্যে (ধরা যাক) θ কোণ উৎপন্ন হয়।

সরণের অভিমুখে বলের যে উপাংশ (Component or Resolved Part) কার্য্য করে তাহার পরিমাণ mg cos θ। যদি সরণ S হয় এবং W যদি কার্য্য তবে

$$W = S.mg \cos\theta$$
$$= mgs \cos\theta$$



৭নং চিত্র—কার্য্যের মান নিরূপণ

বলের আর একটি উপাংশ mg sin θ এবং এইদিকে সরণ শূন্য (কারণ সরণ ইহার লম্বদিকে)। সুতরাং এই উপাংশের কৃত কার্য্য শূন্য। সুতরাং mg বল দ্বারা কৃত কার্য্য এইক্ষেত্রে

$$W = mgs \cos\theta$$

কার্য্যের একক (Unit of Work): বল পরিমাপের সময় তোমরা দুইটি এককের সহিত পরিচিত হইয়াছ। এখানেও দুইটি এককের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। (ক) **নিরপেক্ষ এককের** (Absolute Unit) ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে এক ডাইন বল প্রয়োগ বিন্দুকে নিজের দিকে এক সেন্টিমিটার সরাইয়া দিলে যে কার্য্য হয় তাহাই এই পদ্ধতিতে কার্য্যের একক এবং ইহাকে **আর্গ** (Erg) বলে। এই এককটির মান খুব কম বলিয়া C .G. S. পদ্ধতিতে ব্যবহারিক একক **জুল*** (Joule)। F. P. S. পদ্ধতিতে এক পাউণ্ডাল বল প্রযোগ বিন্দুকে নিজের দিকে এক ফুট সরাইয়া দিলে যে কার্য্য হয় তাহাই কার্য্যের একক এবং ইহাকে **ফুট-পাউণ্ডাল** (Foot-Poundal) বলে। (খ) **মহাকর্ষীয় এককের** (Gravitational Unit) ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে এক গ্রাম ভরকে এক সেণ্টিমিটার লম্বভাবে তুলিতে যে কার্য্য হয় তাহাই ইহার একক এবং তাহাকে **গ্রাম-সেণ্টিমিটার** (Gramme-Centimetre or gm. cm.) বলে। বল পরিমাপের আলোচনাকালে তোমরা দেখিয়াছ এক গ্রাম ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণীয় বলের পরিমাণ 981 ডাইন। এই বলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এক গ্রাম ভরকে লম্বভাবে

* 1 Joule = 10^7 ergs

এক সেন্টিমিটার তুলিতে হইলে কার্য্যের পরিমাণ হইবে 981 আর্গ (কারণ এক ডাইন বল প্রয়োগ বিন্দুকে নিজের দিকে এক সেন্টিমিটার সরাইলে এক আর্গ কার্য্য হয়)। সুতরাং এক **গ্রাম-সেণ্টিমিটার** (Gravitational unit of work) = 981 **আর্গ** (Absolute unit of work)। F. P. S. পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড ভরকে লম্বভাবে এক ফুট তুলিতে যে কার্য্য হয় তাহাই ইহার একক এবং তাহাকে **ফুট-পাউণ্ড** (Foot-Pound or ft.-lb.) বলে। তোমরা জান এই পদ্ধতিতে এক পাউণ্ড ভরের উপর পৃথিবীর আকর্ষণীয় বলের পরিমাণ 32·2 পাউণ্ডাল। এই বলের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এক পাউণ্ড ভরকে লম্বভাবে এক ফুট তুলিতে হইলে কার্য্যের পরিমাণ হইবে 32·2 ফুট-পাউণ্ডাল। সুতরাং এক **ফুট-পাউণ্ড** (Gravitational unit of work) = 32·2 **ফুট-পাউণ্ডাল** (Absolute unit of work)।

ফুট-পাউণ্ডাল ও আর্গের সম্পর্ক (Relation between a Foot-poundal and an Erg) : ফুট পাউণ্ডালকে আর্গে পরিণত করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এক পাউণ্ডাল = 13825·7 ডাইন এবং এক ফুট = 30·48 সেন্টিমিটার।

∴ 1 ফুট-পাউণ্ডাল = 30·48 × 13825·7 আর্গ

= প্রায় $4 \cdot 214 \times 10^5$ আর্গ

শক্তি (Energy) : পদার্থ ও শক্তির বিষয় আলোচনাকালে আমরা দেখাইয়াছি বিশ্বের এই দুইটি মূল উপাদান একই উপাদানের রূপান্তর বিশেষ। অবশ্য এই মূল উপাদানটি যে কি বস্তু তাহা বিজ্ঞান আজও উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই। পদার্থের বিলোপে শক্তির উদ্ভব হয় ও শক্তির বিলোপে পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব —ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শক্তি সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা যোগায়। একটি বল স্থির হইয়া আছে। আমরা একটি পদার্থ দেখিতেছি। পা দিয়া বলটিকে ধাক্কা দিলাম, বলটি চলিতে লাগিল। এই চলন্ত বলে পদার্থ সেই একই আছে কিন্তু এখন উহার মধ্যে গতি শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ইহা এখন কাজ করিতে পারে। কাঠের উপর বন্দুকের গুলি ছোড়া হইল। গতিশীল গুলিটার শক্তি আছে। তাহা দ্বারা সে কাজ করিল, কাঠের আঁইসগুলিকে সরাইয়া দিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। বাতাস বহিতেছে। প্রবাহমান বাতাসের শক্তি আছে,

তাহা দ্বারা উহা নৌকার পালে চাপ দিল ; ফলে নৌকা জলের বাধা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, **কাজ করিবার ক্ষমতার নাম শক্তি** (*Energy of a body is defined as the capacity for its doing work*)। সাধারণতঃ আমরা পদার্থের সহযোগে শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে। সূর্য্য হইতে আমরা যে তাপ ও আলোক পাই, তাহাতে পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তাপ, আলোক বিভিন্ন প্রকার শক্তি। বেতার-বার্ত্তার যে তাড়িত শক্তির ব্যবহার হয় তাহাতেও পদার্থের কোন সংস্পর্শ নাই। অথচ তড়িৎ এক প্রকার শক্তি। তাপ, আলোক, তড়িৎকে কেন শক্তি বলিলাম তাহা নিম্নে আলোচিত হইবে।

শক্তির একক (Units of Energy) : বস্তু যতখানি কার্য্য করিতে পারে তাহাই শক্তির পরিমাপক। নিরপেক্ষ এককের (Absolute unit) ক্ষেত্রে C. G. S. পদ্ধতিতে কার্য্যের একক আর্গ ও F. P. S. পদ্ধতিতে কার্য্যের একক ফুট পাউণ্ডাল। এই এককগুলি শক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শক্তির প্রকারভেদ (Different Kinds of Energy) : শক্তি নানা-প্রকারে প্রকাশ পায়। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির সাতটি বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই :—(১) যান্ত্রিক শক্তি, (২) তাপ শক্তি, (৩) আলোক শক্তি, (৪) শব্দ শক্তি, (৫) তাড়িত শক্তি, (৬) চৌম্বক শক্তি ও (৭) রাসায়নিক শক্তি।

যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical Energy) :—যান্ত্রিক শক্তি দুই প্রকারের : গতিমূলক ও স্থৈতিক। সচল অবস্থায় বস্তুর কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে **গতিশক্তি** (Kinetic energy) বলে। উপরিল্লিখিত বন্দুকের গতিশীল গুলি, প্রবাহমান বাতাস ইত্যাদি গতিশক্তির দৃষ্টান্ত। কোন বস্তুর বিশেষ স্থানে স্থিতির জন্য বা বস্তুর বিভিন্ন অংশের অবস্থানের জন্য কার্য্য করিবার ক্ষমতাকে **স্থৈতিক শক্তি** (Potential energy) বলে। ঘড়িতে দম দেওয়া হইল অর্থাৎ চাবি ঘুরাইয়া ঘড়ির স্প্রিং গুটাইয়া ছোট করিয়া দেওয়া হইল। স্বাভাবিক অবস্থায় স্প্রিংএর যে অবস্থান, গুটান অবস্থায় আপেক্ষিকভাবে সেই অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এইজন্যই স্প্রিং কার্য্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিতেছে। ধনুকের ছিলা টানিয়া ধরিয়াছ। স্বাভাবিক অবস্থায় ধনুকের ছিলার যে অবস্থান, টানিয়া ধরার দরুণ সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেইজন্য ঐ ছিলা কার্য্য করিবার

সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিয়াছে। এই শক্তির সাহায্যে ছিলা ছাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বান ছুটিয়া চলিবে। সাধারণতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠকে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থান ধরা হয়। যদি কোন বস্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উপরে থাকে (ধর, একটি ইট ছাদের উপর আছে) তাহা হইলে ঐ অবস্থানের দরুণ বস্তুটি কার্য্য করিবার সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি লাভ করিবে। ঘড়ির স্প্রিং, ধনুকের ছিলা, ছাদের উপর ইট ইত্যাদি স্থৈতিক শক্তির দৃষ্টান্ত।

তাপ শক্তি (Heat Energy) :—তাপে জল বাষ্প হয়। বাষ্পের চাপে ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। চাকার এই গতিশক্তি আসে তাপ হইতে। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি।

আলোক শক্তি (Light Energy) :—প্রকৃতির একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম এই যে শক্তির বিনাস নাই, আছে কেবল রূপান্তর। যেহেতু অন্য শক্তি হইতে আমরা আলোক পাই এবং যেহেতু আলোককে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, সেহেতু আলোক এক প্রকার শক্তি। ইলেকট্রিক বাতি যখন জ্বলে, তখন তাড়িত শক্তি আলোক ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উদজান ও ক্লোরিণের মিশ্রণ সূর্য্যালোকে বিস্ফোরণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শব্দ শক্তি (Sound Energy) :—বাজি পোড়াইবার সময় সজোরে শব্দ হইলে নিকটস্থ জানালার কাচ ভাঙ্গিযা যায় ; সুতরাং শব্দের শক্তি আছে। ইহার প্রভাবে কোন কোন যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এখানে শব্দশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। টেলিফোনে যখন আমরা কথা বলি, তখন শব্দশক্তি তাড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

চৌম্বক শক্তি (Magnetic Energy) :—চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করে এবং তাহার ফলে নানাপ্রকারের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কার্য্যকরী হয। সুতরাং চুম্বকের শক্তি আছে। ইস্পাতের দ্রুত চুম্বকত্ব প্রাপ্তিতে ও হ্রাসে তাপের উদ্ভব হয়। এখানে চৌম্বক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

তাড়িত শক্তি (Electrical Energy) :—তাড়িতের সাহায্যে ট্রামগাড়ি চলে, পাখা ঘোরে ইত্যাদি। সুতরাং তড়িতের শক্তি আছে। জলের মধ্য দিয়া

তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিলে জল উদজান ও অম্লজানে বিভক্ত হইয়া যায়। এখানে তাড়িত শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

রাসায়নিক শক্তি (Chemical Energy) :—কয়লা, কেরোসিন, বাতি, প্রভৃতি পদার্থ যখন পোড়ে তখন তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়। এখানে রাসায়নিক শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

শক্তির রূপান্তর (Transformation of Energy) ঃ—প্রকৃতির একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম এই যে, শক্তির বিনাস নাই, আছে কেবল রূপান্তর। আপাতদৃষ্টিতে যাহা ধ্বংস বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে রূপান্তর মাত্র। শক্তির প্রকারভেদ আলোচনাকালে বিভিন্ন প্রকারের রূপান্তর আমরা লক্ষ্য করিযাছি। যখন ঢিল উচ্চস্থান হইতে মাটিতে পড়ে, তখন শব্দ হয় ও পরস্পরের সংঘর্ষে তাপ উৎপন্ন হয়। ঢিলের স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং গতিশক্তি তাপ ও শব্দশক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। তাড়িত শক্তি একটি সরু তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে তার উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে আলোক বিকিরণ করে। এক্ষেত্রে তাড়িত শক্তি তাপ ও আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। নিম্নে কয়েকটি রূপান্তরের কথা বর্ণিত হইল।

(১) যান্ত্রিক ও তাপ শক্তির পরস্পর রূপান্তর :—

আমবা যখন হাতে হাতে ঘর্ষণ করি, তখন আমরা নিজেদের শক্তি ক্ষয় করিয়া কার্য্য (work) করি ; এই যে কার্য্য করা হইল ইহারই ফলে তাপ শক্তির উদ্ভব হইয়া হাত দুইটি গরম করিল। সেইরূপ বাইসাইকেল যখন পাম্প করা হয় তখন পিষ্টনটির দ্বারা পাম্পের মধ্যস্থিত বায়ুকে সঙ্কুচিত করা হয়। বায়ুর এই সঙ্কোচনের জন্য আমরা যে শক্তি ব্যয় করি, তাহার কতক অংশ সঙ্কুচিত বায়ুর স্থৈতিক শক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং কতক অংশ তাপ শক্তিরূপে দেখা দেয় ; সেজন্য কিছুক্ষণ পরে পাম্পটি (pump) গরম হইয়া উঠে। এখানে দৈহিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে তাপই বাষ্প সৃষ্টি করে এবং এই বাষ্পের সাহায্যেই রেলগাড়ী চলে ; সুতরাং এখানে তাপ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে। তোমাদের হয়ত মনে হইতে পারে যে পরে রেলগাড়ীর গতিশক্তির বিনাশ হয়, কিন্তু তাহা হয় না। ঐ শক্তি রেললাইনে, বাতাসে ও গাড়ীতে তাপ, শব্দ ইত্যাদি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(২) যান্ত্রিক ও তাড়িত শক্তির পরস্পর রূপান্তর ঃ—

তাড়িত শক্তিতে পাখা ঘোরে, ট্রামগাড়ী চলে ইত্যাদি। অতএব পাখার ও ট্রামগাড়ীর গতিশক্তি তাড়িত শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। সেইরূপ তাড়িত শক্তি পাওয়া যায় ডায়নামো (dynamo) হইতে ; ষ্টীম ইঞ্জিনকে গতিশীল না করিলে তড়িতের সৃষ্টি হয় না। অতএব ষ্টীম ইঞ্জিনের যান্ত্রিক গতিশক্তি এখানে তাড়িত শক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

(৩) রাসায়নিক ও তাড়িত শক্তির পরস্পর রূপান্তর ঃ—

তোমরা মোটরগাড়ী বা রেডিওর ষ্টোরেজ সেল দেখিয়াছ। উহাতে আমরা তাড়িত শক্তি কোথা হইতে পাই ? সেলের ভিতরে কতকগুলি উপাদানের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপন্ন হয় উহাই তাড়িত শক্তিরূপে প্রবাহিত হয়। এরূপ সেলকে যখন আবার আধান (charge) করিতে হয়, তখন বাহির হইতে তাড়িত শক্তি প্রয়োগে উহাতে আবার রাসায়নিক শক্তি সৃষ্টি করিতে হয়।

(৪) যান্ত্রিক শক্তি ও শব্দ শক্তির রূপান্তর ঃ—

সেতারের তার অঙ্গুলি দিয়া টানিলে উহাতে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাহার ফলেই শব্দের উদ্ভব হয়। এখানে গতিশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

এইরূপে নানাবিধ শক্তির পরস্পরের মধ্যে রূপান্তরের অনেক দৃষ্টান্ত তোমরা নিজেরাও ভাবিয়া দেখাইতে পার।

সূর্য্যই সকল শক্তির উৎস (Sun is the sour~e of all energy) **ঃ** এই যে বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও উহাদের রূপান্তরের কথা বলা হইল, উহাদের সকলের উৎস হইল সূর্য্যের তেজ বা সৌরশক্তি। একদা সূর্য্য হইতেই গ্রহগুলির জন্ম হইয়াছে। পৃথিবী একটি গ্রহ এবং ইহা যখন সূর্য্যের শক্তি লইয়াই সূর্য্য হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, পৃথিবীপৃষ্ঠে সকল প্রকার শক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি। কয়লাখানা পুড়িতেছে অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাপ ও আলোক শক্তি প্রকাশ পাইতেছে। কয়লার রাসায়নিক শক্তির মূল কোথায় ? বহুকাল ধরিয়া অরণ্যের গাছপালা সূর্য্যের আলো ও তাপ শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহারা ঘটনাক্রমে মাটি চাপা পড়িয়া চাপ ও উত্তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত হয়। সৌরশক্তি উহার মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে। কয়লাখানা যখন পোড়ে, তখন উক্ত রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হইয়া

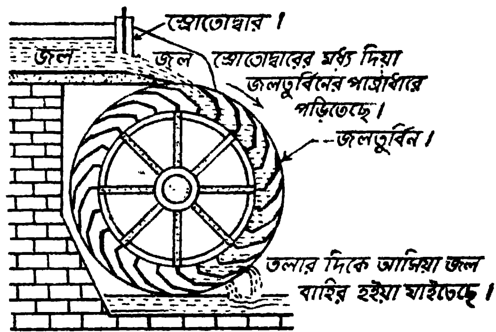
তাপ ও আলোক শক্তিতে পরিণত হয়। সেই তাপশক্তি আবার জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া বাষ্পের চাপরূপে যান্ত্রিক স্থৈতিক শক্তিতে পরিণত হইতেছে। সেই যান্ত্রিক স্থৈতিক শক্তি যখন ইঞ্জিনের চাকা ঘুরায়, তখন উহা গতিশক্তিতে পরিণত হয়। ইঞ্জিনের এই গতিশক্তি ডায়নামো যন্ত্রে প্রযুক্ত হইলে উহা তাড়িত শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সেই তাড়িত শক্তি আবার বৈদ্যুতিক পাখায় গতিশক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক আলোকে আলোক ও তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উহা লৌহমধ্যে চৌম্বক শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে, সৌরশক্তি হইতে রাসায়নিক, তাপ, স্থৈতিক, গতি, তাড়িত ও চৌম্বক শক্তির উদ্ভব হইতেছে। আর একটি উদাহরণ লওয়া যাক। সূর্য্যের তাপশক্তিতে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে প্রভূত পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হইতেছে। এই বাষ্প বায়ু হইতে লঘুতর বলিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। উচ্চস্থানে মেঘের স্থৈতিক শক্তি থাকে। মেঘ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিলে মেঘের স্থৈতিক শক্তি বৃষ্টি ও নদনদী জলের গতীয় শক্তিতে পরিণত হয়। জলের এই গতিশক্তি তুর্বিনের চাকা (turbine) ঘুরাইয়া ডায়নামো যন্ত্রে প্রযুক্ত হইলে তাড়িত শক্তির উদ্ভব হয়। সেই তাড়িত শক্তি আবার বৈদ্যুতিক পাখায় গতিশক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক আলোকে আলোক ও তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া থাকে। এখানেও আমরা সৌরশক্তি হইতে বিভিন্ন শক্তির বিকাশ দেখিতেছি।

জীবমাত্রই কার্য্য করিতে পারে। কার্য্যের জন্য যে শক্তির প্রযোজন হয়, তাহা জীব তাপশক্তি হইতে পাইয়া থাকে। জীবদেহে এই তাপশক্তির উদ্ভব হয় সঞ্চিত ও শোষিত খাদ্যবস্তুর দহনের ফলে। অধিকাংশ উদ্ভিদ্ খাদ্যবস্তু তৈযারের জন্য সূর্য্যালোকের উপর নির্ভরশীল। প্রাণীরা উদ্ভিদ্‌দেহের অংশগুলি ভোজন করিযা খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। অবশ্য মাংসাশী প্রাণীরা অপর প্রাণীর দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে সব প্রাণীর মাংস খায়, তাহাদের রক্তমাংস উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, জীবের শক্তির মূলে রহিয়াছে সৌরশক্তি। ধরাতলে যেরূপেই শক্তি প্রকট হউক না কেন, শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে **উহার উৎস সৌরশক্তি**।

সৌরশক্তির উৎস (Source of Sun's Energy) **:** সূর্য্য হইতে নিরন্তর যে প্রভূত পরিমাণ উত্তাপ ও আলোক শক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যাহার এক

অতি ক্ষুদ্র অংশ কাজে লাগিযাই পৃথিবীর বহু কাজ সংঘটিত হইতেছে, সেই **শক্তির** **উৎস কোথায়?** পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে গত ৫০ বৎসরের গবেষণার ফলে পরমাণু কোষের মধ্যে এক বিরাট তেজের উৎসের সন্ধান মিলিয়াছে। আঘাত-সংঘাতে পরমাণু-কোষ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেলে অনেক সময় এই লুকান তেজের কিছু অংশ মুক্ত হইয়া আসে। বিশাল সূর্য্য হইতে অনুক্ষণ আলোর ও তাপের রূপ লইয়া যে অজস্র তেজ বাহিরে আসিতেছে, তার উৎসের সন্ধান মিলিয়াছে **ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কতকগুলি পরমাণু-কোষের পরস্পরের আঘাত-সংঘাত এবং ভাঙা-চোরার মধ্যে**। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** পরমাণু-কোষের ভাঙ্গা-চোরার ফলে জড়ের বিলোপ হইলে কত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে তাহা হিসাব করিয়া দেখাইযাছেন। তিনিই জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তর সম্ভব তাহা প্রথম প্রচার করেন।

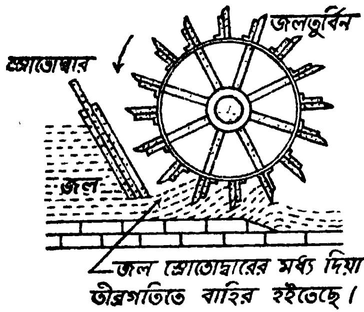
জলশক্তি (Water Power):—অবস্থানের দরুণ জলের স্থৈতিক শক্তি থাকে এবং প্রবাহের দরুণ ইহার গতিশক্তি থাকে। জলের এই দুইপ্রকার শক্তিকে উপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত করা যায়। ৮নং ও ৯নং চিত্রে দেখান হইয়াছে কিরূপে জলের স্থৈতিক শক্তি ও গতি-শক্তি জল তুর্বিনকে আবর্ত্তিত করে। প্রথমে জলের স্থৈতিক শক্তি লইয়া আলোচনা করা যাক। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টি-পাতের দরুণ জলপ্রপাতগুলি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে এবং শীতকালে বৃষ্টিপাতের অভাবে ইহারা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যাহাতে সব সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ জল সরবরাহ থাকে, সেইজন্য উপরিস্তরে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য একটি বিরাট জলাশয়ের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং শীতকালে সেই জলকে কার্য্যে লাগান হয়। জলাশয় হইতে জল পাইপ বা নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া স্রোতোদ্বারের (sluice) মুখে আসে এবং সেখান হইতে জলতুর্বিনের উপর পতিত



৮নং চিত্র—স্রোতোদ্বার হইতে নির্গত জলের স্থৈতিক শক্তির জন্য জলতুর্বিন ঘুরিতেছে

হয়। জলতুর্বিনে বহু জলাধার থাকে এবং পতিত জল ঐ পাত্রগুলিতে সঞ্চিত হয় ও পাত্রগুলি তলার দিকে আসিলে জল বাহির হইয়া যায় (৮ নং চিত্র দেখ)। যে কোন সময় জলাধারগুলির অর্দ্ধেক পতিত জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং জলের ভারে জলতুর্বিন ঘুরিতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান জলতুর্বিনের সাহায্যে কল-কারখানাকে চালু রাখা যায় ; ডায়নামোতে (dynamo) ঐ শক্তি প্রযুক্ত করিয়া তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করা যায়। তাড়িত শক্তি মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

এইবার দেখা যাক, জলের গতিশক্তি কিভাবে জলতুর্বিনকে আবর্ত্তিত করে। বাঁধের সাহায্যে জলধারার দৈর্ঘ্য সঙ্কীর্ণ করা হয় এবং সমস্ত জল স্রোতোদ্বারের (sluice) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। অত বিশাল পরিমাণ জল ছোট দ্বার দিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে বলিয়া ঐখানে স্রোতধারা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং ফলে জলের গতিশক্তি তীব্র হয়। জলের এই তীব্র গতিশক্তি স্রোতোদ্বারের নিকট অবস্থিত জলতুর্বিনের পাখাগুলিতে ধাক্কা দিতে থাকে এবং ফলে জলতুর্বিন ঘুরিতে থাকে (৯নং চিত্র দেখ)। এই ঘূর্ণায়মান জলতুর্বিনের সাহায্যে কল-কারখানা চালু রাখা যায় ; ডায়নামোতে ঐ শক্তি প্রযুক্ত করিয়া তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

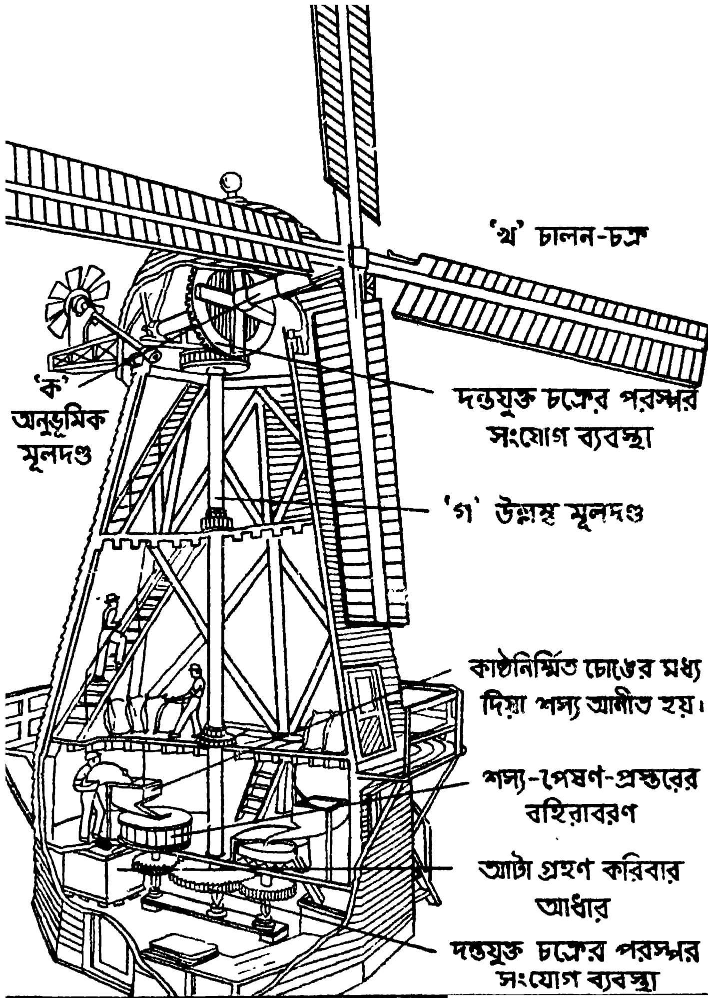


৯নং চিত্র—স্রোতোদ্বার হইতে নির্গত জলের তীব্র গতিশক্তির জন্য জলতুর্বিন ঘুরিতেছে

বায়ুশক্তি (Air-Power) :—প্রবাহমান বায়ুর যে শক্তি আছে, তাহা তোমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ। কিছুদিন আগেও ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিতে ছোট ছোট শিল্পে এই শক্তির ব্যবহার বেশ দেখা যাইত। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এখনও এই শক্তির ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এই শক্তির ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা থাকায় (যেমন বায়ুর গতি অসম, ইহা দিক পরিবর্ত্তন করে ইত্যাদি) ষ্টিম, তাড়িত ইত্যাদি শক্তি ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

বায়ুকল (Wind mill) বায়ুশক্তির সর্ব্বপ্রথম ব্যবহারিক যন্ত্র। বায়ুকল যন্ত্রটি কিরূপ তাহা ১০নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। একটি উচ্চ স্তম্ভের শীর্ষদেশে 'ক' অনুভূমির মূলদণ্ড (horizontal shaft) রোলার বিয়ারিং (roller bearing)এ

আবদ্ধ ও তাহার সহিত সংযুক্ত কতকগুলি পাখা সমেত 'খ' চালন-চক্র (propeller)।



১০নং চিত্র—বায়ুকলে গম ভাঙ্গা হইতেছে

বায়ুপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে যাহাতে চালন-চক্র সেই অভিমুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকে। বায়ুর গতিশক্তির আঘাতে

চালন-চক্র ঘুরিতে থাকে এবং ফলে অনুভূমিক মূলদণ্ড আবর্ত্তিত হয়। দন্তযুক্ত চক্রের পরস্পর সংযোগ ব্যবস্থার দ্বারা (toothed gear arrangement) 'ক' অনুভূমিক মূলদণ্ডের ঘূর্ণ্যমান গতি উল্লম্ব মূলদণ্ড (vertical shaft) 'গ'তে প্রযুক্ত হয় এবং 'গ' মূলদণ্ডের ঘূর্ণ্যমান গতির সাহায্যে অনেক কার্য্য সম্পন্ন করা যায়—যেমন গম ভাঙ্গা, জল উত্তোলন করা ইত্যাদি। চিত্রে গম ভাঙ্গান দেখান হইতেছে।

কার্য্য করিতে কষ্ট হয় কেন ?
(What makes work hard)

কার্য্যের সংজ্ঞা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ যে বল ব্যতিরেকে কার্য্য সম্ভব নয়। বাধা অতিক্রম করিবার জন্য বলের প্রয়োজন হয়। বাধা যদি না থাকিত তবে বলের ক্ষেত্র বহুলাংশে সঙ্কুচিত হইত। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বাধা থাকার দরুণ কার্য্য করিতে কষ্ট হয। এই বাধা প্রধানত: তিনটি : (১) পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বাধা বা অভিকর্ষ (Gravity), (২) ঘর্ষণজনিত বাধা (Friction) ও (৩) বস্তুর জড়তাজনিত বাধা (Inertia)। একাধিক বাধার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয় বলিয়া কার্য্য করা কষ্টকর। আমরা এখন এই তিনটি বাধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

(১) **অভিকর্ষ** (Gravity) : পৃথিবী এবং ভূপৃষ্ঠস্থ বা উহার নিকটস্থ কোন বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বলকে **অভিকর্ষ** বলে। ইহা মহাকর্ষের একটি বিশেষ নাম। পৃথিবীর ভর ভূপৃষ্ঠস্থ বা উহার নিকটস্থিত কোন বস্তুর ভরের তুলনায় এত বেশী যে পৃথিবীর আকর্ষণকেই আমরা বুঝিতে পারি, অন্য বস্তুর আকর্ষণ বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ভূপৃষ্ঠস্থিত বা উহার নিকটস্থিত কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাহাকে অভিকর্ষ বলে। যদি কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরদিকে তুলিতে হয় তাহা হইলে অভিকর্ষ বাধার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয় এবং বস্তুটির জড়তা বাধার বিরুদ্ধেও (নিউটনের প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য) কার্য্য করিতে হয়। সেইজন্য এইরূপ কার্য্য করিতে বেশ কষ্ট হয়।

(২) **ঘর্ষণ** (Friction) : একটি বস্তু Aর উপর দিয়া অপর একটি বস্তু B টানিলে স্পর্শতলে (surface of contact) Bর গতিরোধক একটি বলের উদ্ভব

হয় এবং ইহাকে **ঘর্ষণ** বলে। তলের অমসৃণতার জন্য এই বলের উদ্ভব হয়। ঘর্ষণ বলের অভিমুখ গতির বিপরীত দিকে হয় এবং স্পর্শতলের সমান্তরাল (parallel) হয়। অসমতল মাঠের উপর দিয়া যখন রোলার টানা হয় তখন মাঠ ও রোলারের ভিতর ঘর্ষণজনিত বাধা ও রোলারের জড়তাজনিত বাধা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে হয়। ফলে কার্য্য করিতে বেশ কষ্ট হয়। বড় বড় যন্ত্রপাতিতে বিভিন্ন অংশের ভিতর ঘর্ষণজনিত বাধাকে হ্রাস করিবার জন্য পিচ্ছিলকারী তৈল (lubricating oil) দেবার ব্যবস্থা আছে। একটি মটরগাড়ী বা এরোপ্লেন যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত হয় তখন বায়ুর ঘর্ষণের বল ইহার অগ্রগতিতে বাধা দেয়। এইজন্য আজকাল মোটরগাড়ী বা এরোপ্লেনের দেহ এরূপভাবে নির্ম্মাণ করা হয় যাহাতে এই ঘর্ষণজনিত বাধা যথাসম্ভব হ্রাস পায়।

(৩) **জড়তা** (Inertia): পদার্থ আপন স্থিতি বা গতির অবস্থা আপনা হইতে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; ইহাকেই পদার্থের **জড়তা** বলে। নিউটনের প্রথম সূত্র আলোচনাকালে ইহার সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখা দেওয়া হইয়াছে। পদার্থের এই ধর্ম্ম থাকার দরুণ কার্য্যের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। রেলগাড়ীর ইঞ্জিন যখন স্থির গাড়ীগুলিকে টানিতে চেষ্টা করে তখন ইহাকে দুইটি বাধা অতিক্রম করিতে হয়—চাকার ঘর্ষণজনিত বাধা ও গাড়ীগুলির জড়তা বাধা। গাড়ীকে চালু করিতে হইলে চাকার ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিতে যে বলের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক বল প্রয়োগ করিতে হইবে। এই অধিকন্তু বলটি গাড়ীর জড়তা বাধা অতিক্রম করিবার জন্য প্রযোজন হয়। গাড়ীটি গতিপ্রাপ্ত হইলে ইহার ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম এই পরিমাণ বলমাত্র প্রয়োগে গাড়ী চলিতে থাকিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে জড়তা বাধার জন্য কার্য্য করিতে কষ্ট হয়।

সরল যন্ত্র সাহায্যে কার্য্য সহজীকরণ

(Simple machines to make work easier)

কার্য্য যত কঠিন হয় মানব তাহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই কার্য্যকে সহজ করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। তাহার ফলে নানাবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ বলিয়া খ্যাত। এই যুগে মানব নানা উপায়ে তাহার কায়িক পরিশ্রমকে লঘু করিয়া কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

ভারী বোঝা আর বহুসংখ্যক লোকের সাহায্য লইয়া উপরে তুলিবার বা নীচে নামাইবার প্রয়োজন নাই—সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে ক্রেন (crane) সাহায্যে। দেশ-দেশান্তরে গমন করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া দৈহিক পরিশ্রমের দিন শেষ হইয়াছে। আজ মানব যান্ত্রিক যানে চড়িয়া বিপুল বেগে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতেছে।

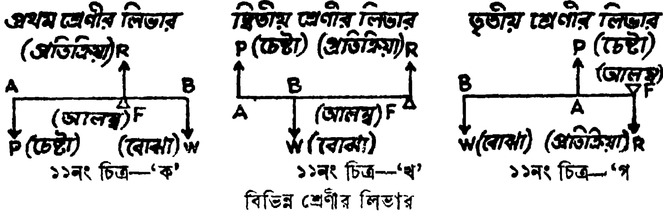
যন্ত্রের সাহায্যে অল্প বল প্রয়োগ করিয়া বিপুল বাধাকে অতিক্রম করা যায়। **একস্থানে প্রযুক্ত বলকে পরিবর্ত্তিত ও অন্যস্থানে পরিচালিত করিয়া সেই স্থানে ঈপ্সিত যান্ত্রিক ক্রিয়া** (mechanical effect) **লাভ করিবার জন্য ব্যবহৃত বস্তু ও বস্তুসমূহকে যন্ত্র** (machines) **বলে**। ঈপ্সিত ক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ এই প্রকারের হয়ঃ (১) স্বল্প বলের দ্বারা বিরাট বাধা অতিক্রম করা ; (২) মন্থর গতিকে দ্রুতগতিতে পরিণত করা ; (৩) রৈখিক গতিকে কৌণিক গতিতে পরিবর্ত্তিত করা অথবা তদ্বিপরীতকরণ। আমরা প্রথমটি লইয়া কিছু আলোচনা করিব। সরল যন্ত্রগুলি এই পর্য্যায়ে আসে এবং সরল যন্ত্রগুলির মধ্যে লিভার (Lever), আনত তল (Inclined plane), কপি ও কপিকল (Pulley) আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রযুক্ত বলকে **চেষ্টা** (Effort) ও অতিক্রান্ত বাধাকে **বোঝা** (Load) বা **বাধা** (Resistance) বলে। যদি P চেষ্টার ও W বোঝা বা বাধার পরিমাণ নির্দ্দেশ দেয় এবং কোন যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage) পাওয়া যায় তবে সেই যান্ত্রিক সুবিধার সংজ্ঞা হইল এইরূপ :

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা}}{\text{চেষ্টা}} = \frac{W}{P}$$

$\frac{W}{P}$ অনুপাত ১ অপেক্ষা বেশী হইলে যান্ত্রিক সুবিধা, ১ অপেক্ষা কম হইলে যান্ত্রিক অসুবিধা।

লিভার (Lever) **:** আলম্ব (fulcrum) নামক স্থির বিন্দুর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে এমন বক্র বা সরল দৃঢ় দণ্ডকে লিভার বলে। এই দণ্ডের দুই বিন্দুতে যথাক্রমে **চেষ্টা** (Effort) ও **বোঝা** বা **বাধা** (Load or Resistance) প্রয়োগ করা হয় এবং **আলম্ব বিন্দু** (fulcrum) চেষ্টা ও বোঝার মধ্যবর্ত্তী অথবা উহার বহির্ভাগে থাকিতে পারে। আলম্ব বিন্দু হইতে চেষ্টা ও বোঝার প্রয়োগরেখা পর্য্যন্ত লম্বভাবে দূরত্বকে লিভারের বাহু (arm of the lever)

বলে। ভ্রামকের নীতি অনুসারে (Principle of the moment of the forces) আলম্ব বিন্দুর চতুর্দ্দিকে চেষ্টার ও বোঝার ভ্রামকদ্বয় পরস্পর সমান হইবে।



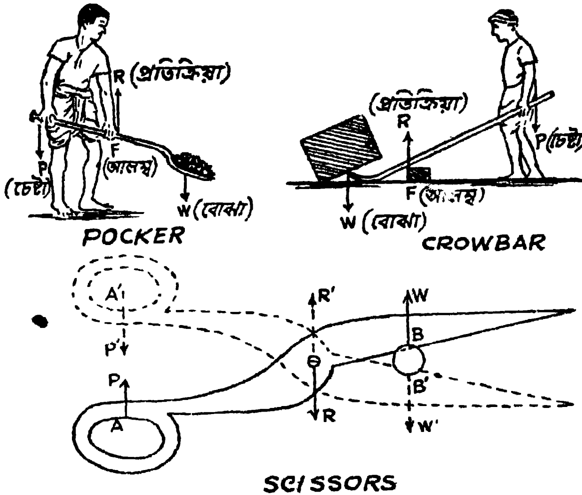
১১নং চিত্র—'ক' ১১নং চিত্র—'খ' ১১নং চিত্র—'গ'

বিভিন্ন শ্রেণীর লিভার

সাধারণতঃ লিভারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণী লিভারে আলম্ব বিন্দু চেষ্টা ও বোঝার মধ্যবর্ত্তী থাকে ও লিভারের একপ্রান্তে চেষ্টা ও অপর প্রান্তে বোঝা থাকে (১১ নং চিত্রের'ক' অংশ দেখ)। চেষ্টা লিভারের দীর্ঘতর বাহুপ্রান্তে প্রযুক্ত হইলে যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করা যায় কারণ P.AF. = W.BF.

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = \frac{AF}{BF}$$

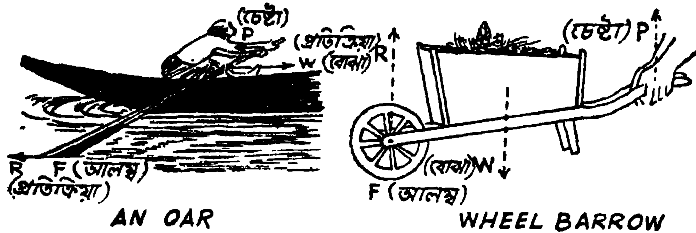
AF দূরত্ব, BF দূরত্বের চেয়ে বেশী হইলে অনুপাতটি ১ অপেক্ষা বড় হইবে এবং

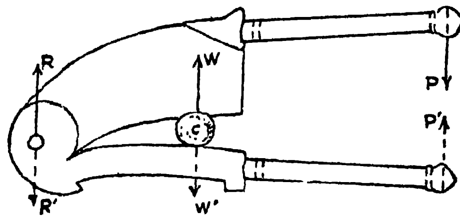


১২নং চিত্র—প্রথম শ্রেণীর লিভারের কয়েকটি উদাহরণ

ফলে যান্ত্রিক সুবিধা হইবে। প্রথম শ্রেণী লিভারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইল। কাঁচি এই শ্রেণীর ডবল লিভারেব দৃষ্টান্ত।

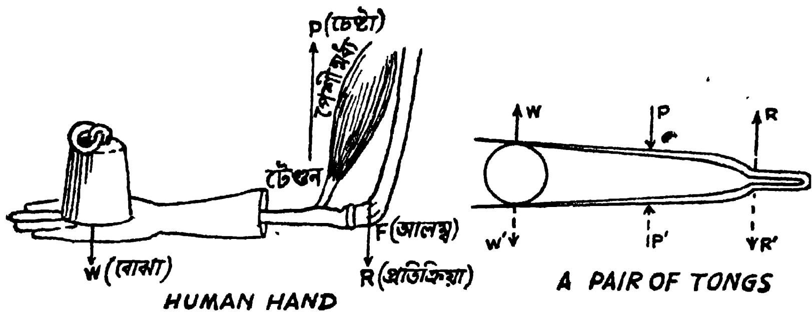
দ্বিতীয় শ্রেণী লিভারে আলম্ব বিন্দু লিভারের এক প্রান্তে থাকে ও চেষ্টা অপর প্রান্তে থাকে এবং বোঝা চেষ্টা ও আলম্ব বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী থাকে (১১ নং চিত্রের 'খ' অংশ দেখ)। এই শ্রেণীর লিভারে সর্ব্বদাই যান্ত্রিক সুবিধা থাকিবে কারণ P.AF





১৩নং চিত্র—দ্বিতীয় শ্রেণী লিভারের কয়েকটি উদাহরণ

=W.BF এবং AF দূরত্ব BF দূরত্ব অপেক্ষা বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণী লিভারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইল। যাঁতি এই শ্রেণীর ডবল লিভারের দৃষ্টান্ত।

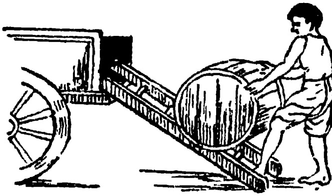


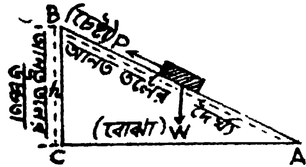
১৪নং চিত্র—তৃতীয় শ্রেণী লিভারের কয়েকটি উদাহরণ

তৃতীয় শ্রেণী লিভারে আলম্ব বিন্দু লিভারের এক প্রান্তে ও বোঝা অপর প্রান্তে এবং চেষ্টা বোঝা ও আলম্ব বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী থাকে (১১ নং চিত্রের 'গ' অংশ দেখ)।

এই শ্রেণীর লিভারে সর্ব্বদাই যান্ত্রিক অসুবিধা হইবে কারণ P.AF = W.BF এবং AF দূরত্ব BF দূরত্ব অপেক্ষা কম। তৃতীয় শ্রেণী লিভারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পূর্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। মানুষের হস্ত যখন কোন ভার গ্রহণ করে তখন কনুই-সন্ধি (eldow joint) লিভারের আলম্বের (fulcrum) কার্য্য করে ও মাংসপেশীর টান (টেণ্ডন ও পেশীমধ্যের টান) লিভারের চেষ্টা। চিমটা এই শ্রেণীর ডবল লিভারের দৃষ্টান্ত।

আনত তল (Inclined Plane): বহু প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এই যন্ত্রটির ব্যবহার দেখা যায়। ধরা যাক, W বোঝাকে আনত তলের তলদেশ হইতে P চেষ্টার দ্বারা আনত তলের উপরিভাগে আনা হইবে (১৫ নং চিত্র দেখ)। চেষ্টার দ্বারা কৃত কর্ম্মের পরিমাণ হইল $P \times l$ (‘l’ আনত তলের দৈর্ঘ্য)





১৫নং চিত্র—আনত তলের যান্ত্রিক সুবিধা

W বোঝাকে উল্লম্বভাবে আনত তলের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আনিলে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বাধার বিরুদ্ধে কর্ম্মের পরিমাণ $W \times h$(‘h’ আনত তলের উচ্চতা) এক দুইটি কৃত কর্ম্মের পরিণতি এক।

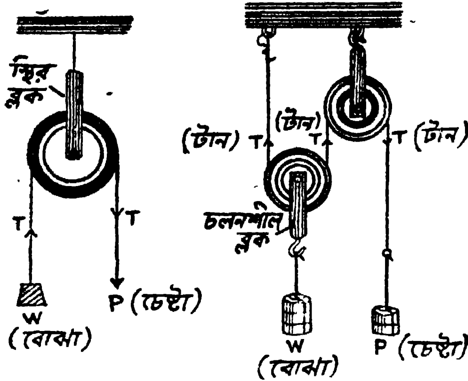
$\therefore P \times l = W \times h$ (আনত তলের ঘর্ষণজনিত বাধা অগ্রাহ্য করা হইল)

$$\therefore \frac{W}{P} = \frac{l}{h}$$

আনত তলের দৈর্ঘ্য উচ্চতার চেয়ে যত বেশী হইবে ততই l/h অনুপাত ১ অপেক্ষা বেশী হইবে এবং ফলে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে।

কপি ও কপিকল (Pulley):—পরিধিতে খাঁজ কাটা এক বা একাধিক চক্র সমন্বয়কে কপিকল বলে। এই চাকাগুলি ব্লক (block) নামক কাঠামোয় রক্ষিত অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে পারে। ব্লকটি স্থির (fixed) বা চলনশীল

(movable) হইতে পারে। ব্লকটি যখন স্থির তখন কপিকল স্থির (১৬নং চিত্র দেখ) এবং ব্লকটি যখন চলনশীল তখন কপিকল চলনশীল (১৭নং চিত্র দেখ)। যখন কপিকলে একটি কপি (pulley) থাকে এবং তাহা স্থির থাকে তখন কোন



১৬নং চিত্র—স্থির কপিকল ১৭নং চিত্র—চলনশীল কপিকল

যান্ত্রিক সুবিধা লাভ করা যায় না কারণ দড়ির টান T, W বোঝার সমান হয় এবং P চেষ্টার সমান হয়। অর্থাৎ $W = P$ এবং যান্ত্রিক সুবিধা ১ হয়। এইরূপ কপিকলে বলের অভিমুখ (direction of the force) শুধু পরিবর্তন করা যায় অর্থাৎ উর্দ্ধমুখা চেষ্টা নিম্নমুখী চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হয় (১৬নং চিত্র দেখ)।

এইবার চলনশীল কপিকলের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। একটি চলনশীল কপির (single movable pulley) ব্লকে W বোঝা ঝুলানো আছে এবং চাকাটি যে দড়ির দ্বারা ঝুলানো আছে তাহার একপ্রান্ত সরাসরি অবলম্বন দণ্ডে সংলগ্ন আছে এবং অপরপ্রান্ত একটি স্থির কপির উপর দিয়া আনা হইয়াছে। সেখানে P চেষ্টা প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি দড়ির উপর টান T হয় তবে দড়ির টান সর্ব্বত্র এক হইবে কারণ একই দড়ি কপির মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং দড়ির টান চেষ্টার সমান হইবে অর্থাৎ $T = P$। W বোঝাটি চলনশীল কপির দুইধারের দড়ির উর্দ্ধমুখী টান দ্বারা ভারসাম্য থাকে। যদি চলনশীল কপির ওজন অগ্রাহ্য করা হয় তবে :

$$2T = W$$

অথবা $2P = W$ (যেহেতু $T = P$)

$$\frac{W}{P} = 2$$

∴ যান্ত্রিক সুবিধা হইতেছে 2

ভার উত্তোলন কপির যে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায় তাহা তিনটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এ সম্বন্ধে তোমরা বড় হোয়ে বিস্তারিত পড়বে।

Questions

1. What do you mean by *work* ? How shall you measure work ? What are its Units ?
2. What do you mean by *energy* ? What are its Units ? What are the different forms of energy ?
3. You light a match. What are the transformations of energy that take place.
4. Justify the statement that Sun is the source of all energy.
5. What makes work hard ? Explain it with illustrations.
6. What is a lever ? Classify them with suitable examples.
7. Describe the working principle of an inclined plane.
8. What is a pulley ? Point out the mechanical advantage in the case of single movable pulley.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকর্ষ (Gravitation)

খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ও ইহার পরে গণিত ও বিজ্ঞানে ভারতীয় মনীষিগণের স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টজন্মের পর দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ভারতের বিরাট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যারা অগ্রণী ছিলেন তাহাদের মধ্যে **আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্যের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য উদীয়মান ছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার একটি স্তম্ভবিশেষ। এই গ্রন্থ হইতে দেখা যায় ভাস্করাচার্য্য মহাকর্ষ ও অভিকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ :

"যখনই কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠে পড়িতে দেখা যায় তাহার কারণ হইতেছে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে এই পারস্পরিক আকর্ষণ থাকার দরুণ

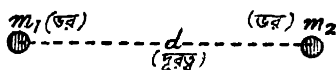
কেহই নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।" সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক **নিউটন** (Newton) স্বীয় ধীশক্তিতে এই সূত্র আবিষ্কার করেন।

মহাকর্ষ সূত্র (Law of Gravitation): বৈজ্ঞানিক **কেপলার** (Kepler) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গ্রহগুলি বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না, সূর্য্যকে একটি ফোক্‌সে রাখিয়া (the sun at one focus) সামান্য কিছুটা উপবৃত্তাকার (elliptical) পথে প্রদক্ষিণ করে। এই গতির সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সূত্র দিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক **নিউটন** এই গতির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া এবং আপেল ফলের ভূপৃষ্ঠে পতনের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া



নিউটন

মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন এবং তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ : **এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা অপর প্রত্যেকটি বস্তুকণাকে পরস্পর আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুকণা দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং উহাদের অন্তবর্ত্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক** (*Every particle of matter attracts every other particle of matter in whatever states they may exist with a force that varies directly as the product of the masses of the two particles of matter and inversely as the square of the distance between them*)। যদি দুইটি বস্তুকণার ভর m_1 ও m_2 হয় এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব d হয় এবং F যদি পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বল হয় তবে,

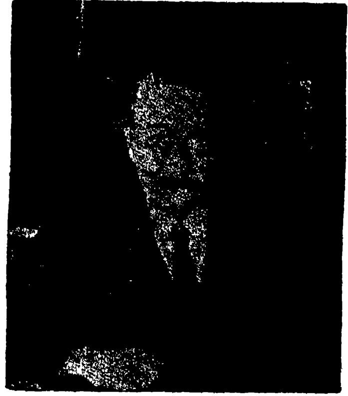


$$F \propto m_1 m_2 \text{ এবং } F \propto \frac{1}{d^2}$$

$$\therefore F \propto m_1 m_2 \frac{1}{d^2} \quad \text{or } F = G.\frac{m_1 m_2}{d^2}$$ [G একটি ধ্রুবক (constant)]

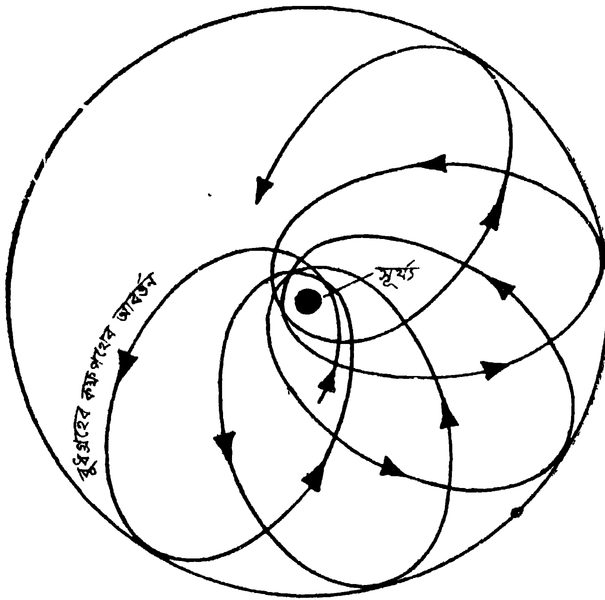
Gকে **নিউটোনিয়াম ধ্রুবাঙ্ক** বা **মহাকর্ষীয় ধ্রুবাঙ্ক** (Newtonian constant or Gravitational constant) বলে। C. G. S. পদ্ধতিতে Gএর মান দাঁড়ায় $6 \cdot 68 \times 10^{-8}$। যদি আমাদের পূর্ব্বোক্ত সমীকরণে m_1 ও m_2 এর মান এক গ্রাম করিয়া হয় ও d এর দূরত্ব এক সেন্টিমিটার হয় তবে F = G অর্থাৎ মহাকর্ষীয় ধ্রুবাঙ্কের মান পরস্পর বস্তুকণার আকর্ষণ বলের সমান হয়। অন্যভাবে বলিতে পারি যদি দুইটি এক গ্রাম ভরের বস্তুকণা এক সেণ্টিমিটার দূরত্বে অবস্থান করে তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বলের মান $6 \cdot 68 \times 10^{-8}$ **ডাইন**।

বৈজ্ঞানিক নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক জগতের ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু বিশালতম নক্ষত্রলোকের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় গলদ দেখা যায়। তাই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** (Einstein) মহাকর্ষের নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁহার মহাকর্ষ সূত্রের মধ্যে আকর্ষণ বলের কোন স্থান নাই। কোটি কোটি মাইল দূরবর্ত্তী দুইটি বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করিতে পারে তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় (the problem of action at a distance)। আইনষ্টাইনের মতে **মহাকর্ষ জড়তার অংশবিশেষ** (gravitation is simply a part of inertia)। গ্রহ, উপগ্রহদের গতি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ।


আইনষ্টাইন

গতিশীলতাই জ্যোতিষ্কদের ধর্ম্ম। এই গতিশীলতা ধর্ম্মের জন্য অর্থাৎ জড়তা ধর্ম্মের জন্য (inertia) গ্রহ, উপগ্রহগণ ঘুরিতেছে এবং কোন পথে ঘুরিবে তাহা নির্ভর করে দেশ-কাল পরিব্যাপ্তির বিশিষ্ট ধর্ম্মের উপর (metric properties of the space-time continuam)। আইনষ্টাইনের মতে দেশ-কালের পরিব্যাপ্তিতে যেখানেই পদার্থ ও গতি থাকে তার চতুর্দ্দিকে একটি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তার ফলে দেশ-কাল ঠেলা খাইয়া উত্তুঙ্গ হইয়া উঠে। ভূপৃষ্ঠে যেমন আমরা পর্ব্বত দেখিতে পাই সেইরূপ। কোন বস্তু তার গতিপথে যখন ইহার সম্মুখীন হয় তখন দেশ-কাল খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়া যাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তাই গতিশীল বস্তুটি

সহজ পথের সন্ধান নেয় এবং সেই সহজ পথটি হইতেছে পাহাড়কে প্রদক্ষিণ করা। গ্রহ, উপগ্রহদের নির্দিষ্ট কক্ষে পরিক্রমণ করার কারণ ঐ পথটি সোজা। আপেল ফল ঊর্দ্ধে না গিয়া মাটিতে পড়ে কেন? আইনষ্টাইনের মতে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্রে (gravitational field) আপেল ফলের ঐটি সোজা পথ। এ সম্বন্ধে বড় হ'য়ে তোমরা বিস্তারিত পড়বে। আইনষ্টাইনের **মহাকর্ষ সূত্রগুলি** দেশ-কাল পরিব্যাপ্তির ক্ষেত্রিক ধর্ম্মের বর্ণনা দেয় (*Einstein's gravitational laws describe the field properites of space-time continuam*)। সূত্রগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—**গঠন-সূত্র** (Structure laws) ও **গতিসূত্র** (Laws of



১৮নং চিত্র—বুধগ্রহের কক্ষের আবর্ত্তন

motion)। প্রথম সূত্রগুলি অভিকর্ষিত বস্তুর ভরের সহিত উহার চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রিক গঠনের সম্পর্ক সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয় (*the relation between the mass of a gravitating body and the structure of the field around it*) এবং দ্বিতীয় সূত্রগুলি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে (gravitational field) গতিশীল বস্তুগুলি কি পথে

ঘুরিবে তাহার নির্দ্দেশ দেয় (the paths described by moving bodies in gravitational fields)।

আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ সূত্র নিউটনের মহাক[illegible]পেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিত। নক্ষত্রজগতের বহু ঘটনাবলী হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সৌর-জগতের একটি ঘটনা নিয়ে বিবৃত হইল। বুধগ্রহ সূর্য্যের নিকটতম প্রতিবেশী। ইহার ভর অল্প ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড বেগে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী বুধগ্রহের স্বল্প ভর ও প্রচণ্ড বেগে ঘোরার দরুণ বুধগ্রহের কক্ষের কোন পরিবর্ত্তন হওযার কথা নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন এই কক্ষের সামান্যতম আবর্ত্তন সাধিত হয়। আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী ইহার কারণ সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের তীব্রতা (intensity of sun's gravitational field) ও বুধগ্রহের প্রচণ্ড বেগ (enormous speed of mercury)। আইনষ্টাইনের মতে এই কক্ষপথ এমন ভাবে আবর্ত্তিত হইবে যে প্রতি ৩০ লক্ষ বছরে ইহা একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে। বৈজ্ঞানিকেরা এই কক্ষপথের যে আবর্ত্তন লক্ষ্য করিযাছেন তাহা আইনষ্টাইনের সূক্ষ্ম হিসাবের সহিত মিলিয়া যায়। আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ সূত্রগুলি যে কত সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিত তাহা নক্ষত্রলোকের আরও বহু ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বড় হ'যে তোমরা বিস্তারিত পড়বে।

অভিকর্ষ ও অভিকর্ষজ ত্বরণ (Gravity and acceleration due to gravity): পৃথিবী এবং ভূপৃষ্ঠস্থ বা উহার নিকটস্থিত কোন বস্তুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ বলকে **অভিকর্ষ** (gravity) বলে [নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এই সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে কারণ তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক জগতের ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যায়]। ইহা মহাকর্ষের একটি বিশেষ নাম। পৃথিবীর ভর ভূপৃষ্ঠস্থ বা উহার নিকটস্থিত কোন বস্তুর ভরের তুলনায এত বেশী যে পৃথিবীর আকর্ষণকেই আমরা বুঝিতে পারি, অন্য বস্তুর আকর্ষণ বুঝিতে পারি না। সেইজন্য ভূপৃষ্ঠস্থিত বা উহার নিকটস্থিত কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাহাকে অভিকর্ষ (gravity) বলে।

নিউটনের দ্বিতীয় গতি-সূত্র অনুসারে কোন বল যদি বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তবে বস্তুর গতি ত্বরান্বিত হয় অর্থাৎ একটি ত্বরণ (acceleration) উৎপন্ন হয়।

সুতরাং পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের ক্রিয়ার যখন কোন বস্তু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় তখন তাহারও একটি ত্বরণ উৎপন্ন হয়। এই ত্বরণকে বলা হয় **অভিকর্ষজ ত্বরণ** (acceleration due to gravity)। উহা সাধারণতঃ 'g' অক্ষর দ্বারা সূচিত হয়*। m ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর অভিকর্ষজনিত বল $= G.\frac{Mm}{R^2}$ (নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; M = পৃথিবীর ভর, R = পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব) এবং এই বলের ফলে যে ত্বরণ হয় তাহা অভিকর্ষজ ত্বরণ g। নিউটনের দ্বিতীয় গতি-সূত্র অনুসারে

$$G.\frac{Mm}{R^2} = mg \qquad (P = mf \text{ সমীকরণ অনুযায়ী})$$

$$\therefore g = G.\frac{M}{R^2}$$

একই স্থানে G, M, R এর মান পরিবর্তন করে না ; সুতরাং একই স্থানে gএর মানও পরিবর্তিত হয় না। gএর মান নির্ভর করে Rএর উপর। ৪৫° অক্ষাংশে সমুদ্র-তলে gএর মানকে নির্দিষ্ট মান ধরা হয়। C. G. S. পদ্ধতিতে gএর গড় মান প্রতি সেকেণ্ডে 981 সেণ্টিমিটার/সেকেণ্ড ও F. P. S পদ্ধতিতে gএর গড় মান প্রতি সেকেণ্ডে 32·2 ফুট/সেকেণ্ড।

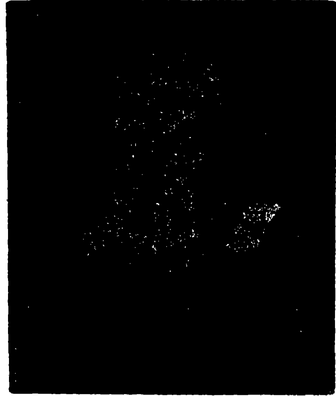
পতনশীল বস্তুর সূত্র

(Laws of Falling Bodies)

পৃথিবার আকর্ষণজনিত বলের জন্য কোন বস্তু উচ্চে অধৃত অবস্থায় থাকিলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বড় ভরের বস্তু লঘু ভরের অপেক্ষা দ্রুতবেগে পতিত হয়। পণ্ডিত এ্যারিষ্টটলও এই মত পোষণ করিতেন। 1590 খৃঃ বৈজ্ঞানিক **গ্যালিলিও** (Galileo) পাইসা নগরীতে বিখ্যাত হেলানো মিনারের চূড়া (leaning tower) হইতে বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট বস্তু নীচের দিকে ফেলিয়া তাহাদের পতন সম্পর্কে নানারূপ পরীক্ষা করেন এবং নিম্নলিখিত তিনটি সূত্র

* এই অভিকর্ষজ ত্বরণের ফলে দেখা যায় গাছ হইতে ফল পড়িলে বা কোন উচ্চ স্থান হইতে পাথর টুকরা গড়াইয়া পড়িলে যতই উহারা ভূপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয় ততই উহাদের বেগ বৃদ্ধি পায়।

আবিষ্কার করেন। উহাদের **পতনশীল বস্তুর সূত্র** হিসাবে অভিহিত করা হয়। সূত্রগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :



গ্যালিলিও

প্রথম সূত্র (First Law) : **সমস্ত বস্তু স্থির অবস্থা হইতে বিনা বাধায় নামিতে থাকিলে সমান দ্রুততায় নীচে নামে** (*In vacuum, all bodies starting from rest, fall with equal rapidity*)।

দ্বিতীয় সূত্র (Second Law) : **স্থির অবস্থা হইতে বিনা বাধায় নামিতে থাকিলে পতনশীল বস্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে বেগ অর্জ্জন করে, তাহা ঐ সময়ের সমানুপাতিক** (*In vacuum, the velocity acquired by a falling body, starting from rest, is proportional to the time of the fall*)।

তৃতীয় সূত্র (Third Law) : **স্থির অবস্থা হইতে বিনা বাধায় নামিতে থাকিলে পতনশীল বস্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহা ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক** (*In vacuum, the space traversed by a falling body in a given time, starting from rest, is proportional to the square of that time*)।

প্রথম সূত্রের প্রমাণ : (১) নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের সাহায্যে এই সূত্রটিকে প্রমাণ করা যায়। দুইটি বিভিন্ন ভরের বস্তু লওয়া যাক—একটির ভর m_1 ও অপরটি ভর m_2। প্রথমটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল $F_1 = G\frac{Mm_1}{R^2}$ ও দ্বিতীয়টির উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল $F_2 = G\frac{Mm_2}{R^2}$ [M = পৃথিবীর ভর R = পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব]

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে,

প্রথমটির ত্বরণ $= \frac{F_1}{m_1}$ or $G\frac{Mm_1}{R^2.m_1}$ (যেহেতু $F_1 = G.\frac{Mm_1}{R^2}$)

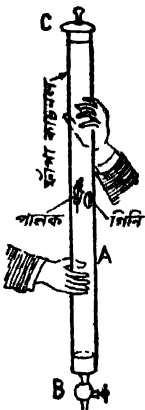
$$= G.\frac{M}{R^2}$$

দ্বিতীয়টির ত্বরণ $= \frac{F_2}{m_2}$ or $G\frac{Mm_2}{R^2.m_2}$ $\left(\text{যেহেতু } F_2 = G\frac{Mm_2}{R^2}\right)$

$$= G.\frac{M}{R^2}$$

ত্বরণ দুইটির মান যখন সমান তখন উভয় বস্তু সমান দ্রুততার সহিত পড়িবে। ইহাই পতনশীল বস্তুর প্রথম সূত্রের **গাণিতিক প্রমাণ** (mathematical proof)।

(ii) **পরীক্ষামূলক প্রমাণ** (Experimental proof) :—সূত্রটি গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও ইহার নির্ভুল প্রমাণ তাঁহার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নাই।



১৯নং চিত্র—গিনি পালক পরীক্ষা

বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র তখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় বিনা বাধায় নামিতেছে এইরূপ পতনশীল বস্তুর সম্বন্ধে পরীক্ষা করা সম্ভব হইত না। বৈজ্ঞানিক নিউটন বিখ্যাত **গিনি** ও **পালক পরীক্ষার** (Guinea and Feather Experiment) সাহায্যে এই সূত্রের অকাট্যতা প্রমাণ করেন।

প্রায় ৪০ ইঞ্চি লম্বা শক্ত ফাঁপা কাচনল A লওয়া হইল। ইহার এক মুখ একটি প্যাঁচ করা ধাতব ঢাকনি C দিয়া বন্ধ, অপর মুখে একটি প্যাঁচকল B আছে। প্যাঁচকলের সহিত একটি নল দিয়া বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যোগ করা যায়। C ধাতব ঢাকনির প্যাঁচ খুলিয়া নলের মধ্যে একটি পালক ও একটি গিনি মুদ্রা রাখিয়া উহা বন্ধ করা হইল। বায়ু-নিষ্কাশক যন্ত্র সাহায্যে কাচনলের ভিতরকার বায়ু বাহির করিয়া প্যাঁচকল বন্ধ করা হইল। এইবারে নলটি হঠাৎ উল্টাইয়া ধরিলে দেখা যাইবে পালক ও মুদ্রা একই সঙ্গে নীচে পড়িতেছে এবং একই সময়ে নলের অপর প্রান্ত স্পর্শ করিতেছে। কাচনলে বায়ু প্রবেশ করাইয়া নলটিকে পুনরায় উল্টাইয়া ধরিলে দেখা যাইবে গিনি পালকের পূর্ব্বে কাচনলের অপর প্রান্ত স্পর্শ করিতেছে। ইহা দ্বারা দেখা গেল কাচনলের মধ্যে বায়ুর বাধা দূর করিলে (কাচনলের মধ্যে বায়ুর বাধা দূর করার অর্থ হইতেছে যে গিনি ও পালক বিনা বাধায় স্থির অবস্থা হইতে নীচে নামে) গিনি ও পালক **সমান দ্রুততায়** নীচে পড়ে।

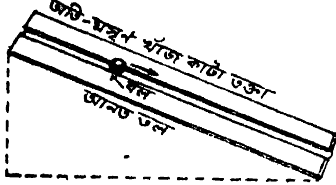
[**Note** : তোমরা প্রশ্ন করিতে পার পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া কেন সমান অভিকর্ষজ ত্বরণ সৃষ্টি করিতেছে। নিউটনের দ্বিতীয় গতি-সূত্র অনুযায়ী

তোমরা জান একই বল যদি বড় ও ছোট ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তবে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে বেশী ত্বরণ উৎপন্ন করিবে ($P = mf$ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বড় ভরবিশিষ্ট বস্তু ছোট ভরবিশিষ্ট বস্তু অপেক্ষা বেশী জড়তাজনিত বাধা (greater inertia) প্রদান করে। সমান্তরাল ক্ষেত্রে (horizontal plane) যদি বলের এই ক্রিয়া হয় তবে উল্লম্ব ক্ষেত্রে (vertical plane) তাহা না হওয়ার কারণ কি ? জড়তা ও অভিকর্ষকে তুল্যাঙ্ক (equivalence between inertia and gravitation) ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয় (অর্থাৎ বড় ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল বেশী, কারণ অধিক জড়তাজনিত বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং ছোট ভরবিশিষ্ট বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল কম কারণ অল্প জড়তাজনিত বাধা অতিক্রম করিতে হয়) এবং বৈজ্ঞানিক **নিউটন** তাহাই করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** বহুবিধ উদাহরণ সাহায্যে জড়তা ও অভিকর্ষের তুল্যাঙ্কের কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিলেন এবং তোমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ সূত্রে জড়তার অংশ বিশেষ]

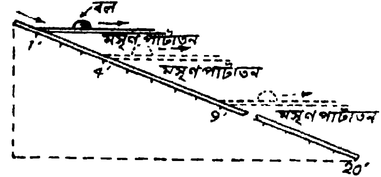
দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণঃ (i) দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণস্বরূপ প্রথমে আমরা গাণিতিক প্রমাণ দিতেছি। কোন বস্তু স্থির অবস্থা হইতে নীচে নামিতে থাকিলে t সেকেণ্ড বাদে তাহার বেগ $V = gt$ এই সমীকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় ($V = u + gt$; এখানে বস্তুটি স্থির অবস্থা হইতে নীচে নামিতেছে বলিয়া $u = 0$)। আমরা জানি g একটি ধ্রুব সংখ্যা। সুতরাং $V \propto t$ অর্থাৎ পতনশীল বস্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে বেগ অর্জ্জন করে তাহা ঐ সময়ের সমানুপাতিক। প্রথম সেকেণ্ডের শেষে বস্তুটির বেগ প্রতি সেকেণ্ডে যদি ৩২ ফুট হয়, তবে দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেষে ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে হইবে ৩২ × ২ = ৬৪ ফুট ; তৃতীয় সেকেণ্ডের শেষে ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে হইবে ৩২ × ৩ = ৯৬ ফুট ইত্যাদি।

(ii) **পরীক্ষামূলক প্রমাণ** (Experimental proof): আনত তলের (inclined plane) সাহায্যে এই সূত্রটি প্রমাণ করা যায়। একটি 20 ফুট লম্বা তক্তার সাহায্যে একটি আনত তল প্রস্তুত করা হয় এবং ইহার মাঝে লম্বালম্বি ভাবে একটি খাঁজা কাটা হয়। ঘর্ষণের বাধা যাহাতে কম হয় সেই উদ্দেশ্যে ইহাকে যথাসম্ভব মসৃণ করিয়া নেওয়া হয়। আনত তলের নির্ম্মাণ কৌশল এইরূপ হইবে যে ইহা সমতল ক্ষেত্রের সহিত প্রয়োজনমত যে কোন কোণ (angle) উৎপন্ন করিতে পারে। আনত তলের উপরে শূন্য-দাগ ধরিয়া সেখান হইতে প্রতি ফুট অন্তর দাগ কাটা হয়। শূন্য-দাগ হইতে খাঁজের মধ্য দিয়া ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত অতি মসৃণ (ঘর্ষণজনিত

বাধা কমাইবার উদ্দেশ্যে) একটি বল গড়াইয়া দেওয়া হয়। বারংবার পরীক্ষা দ্বারা আনত তলটিকে এমন কোণে (angle) স্থাপন করিতে হইবে যে বলটির একফুট দাগ



২০নং চিত্র



২১নং চিত্র

পতনশীল বস্তুর সূত্র পরীক্ষা

অবধি গড়াইয়া আসিতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। এইবার বলটির বেগ পরিমাপের জন্য প্রথম 1 ফুট দাগে একটি মসৃণ পাটাতন রাখা হয়। বলটিকে শূন্য দাগ হইতে গড়াইয়া দিলে এক সেকেণ্ড বাদে উহা 1 ফুট দাগে আসিয়া পৌঁছিবে এবং তথা হইতে মসৃণ পাটাতনের উপর দিয়া চলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতদূর দূরত্ব অতিক্রম করে তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহার বেগ কত তাহা জানা যায়। এই বেগ আনত তলের উপর দিয়া বলটি এক সেকেণ্ডে গড়াইয়া আসিয়া যে বেগ অর্জ্জন করিযাছিল তাহার সমান। 4 ফুট দাগে যদি পাটাতন রাখা হয় এবং বলটিকে শূন্য-দাগ হইতে গড়াইয়া দেওয়া হয় তবে দেখা যাইবে বলটি 2 সেকেণ্ডে ঐ দাগে পৌঁছিয়া পাটাতনের উপর দিয়া চলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কতদূর দূরত্ব অতিক্রম করিল তাহা লক্ষ্য করিয়া ইহার বেগ কত তাহা জানা যায়। প্রথম সেকেণ্ডের পর বস্তুটির প্রতি সেকেণ্ডে যে বেগ পাওয়া গিয়াছিল দ্বিতীয় সেকেণ্ডের পর (4 ফুট দাগ পর্য্যন্ত আসিতে বলটির 2 সেকেণ্ড লাগিয়াছিল) ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দ্বিগুণ পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ পতনশীল বস্তু যে বেগ অর্জ্জন করে তাহা সময়ের সমানুপাতিক।

তৃতীয় সূত্রের প্রমাণঃ (i) তৃতীয় সূত্রের প্রমাণস্বরূপ প্রথমে আমরা গাণিতিক প্রমাণ দিতেছি। কোন বস্তু স্থির অবস্থা হইতে নীচে নামিতে থাকিলে t সেকেণ্ড বাদে দূরত্ব অতিক্রান্ত $h=\frac{1}{2}gt$ এই সমীকরণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় ($h=ut+\frac{1}{2}gt^2$; এখানে বস্তুটি স্থির অবস্থা হইতে নীচে নামিতেছে বলিয়া $u=0$)। আমরা জানি g একটি ধ্রুব সংখ্যা সুতরাং $h \propto t^2$ অর্থাৎ পতনশীল বস্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহা ঐ সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। প্রথম

সেকেণ্ডে বস্তুটি যদি ১৬ ফুট পড়ে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেকেণ্ডে যথাক্রমে $2^2 \times 16 = 64$ ft., $3^2 \times 16 = 144$ ফুট পড়িবে।

(ii) **পরীক্ষামূলক প্রমাণ** (Experimental Proof) : দ্বিতীয় সূত্রের প্রমাণের জন্য যে আনত তল ব্যবহৃত হইয়াছে সেইরূপ অতি মসৃণ খাঁজ-কাটা একটি আনত তল লওয়া হইল এবং বারংবার পরীক্ষা দ্বারা আনত তলটিকে এমন কোণে স্থাপন করা হইল যে মসৃণ বলটি শূন্য দাগ হইতে 1 ফুট দাগে আসিতে 1 সেকেণ্ড সময় নেয়। যদি বলটিকে শূন্য দাগ হইতে গড়াইয়া দেওয়া হয় তবে 4 ফুট দাগ পর্য্যন্ত পোঁছিতে ইহার 2 সেকেণ্ড সময় লাগিবে ও 9 ফুট দাগ পর্য্যন্ত পোঁছিতে 3 সেকেণ্ড সময় লাগিবে। ইহাতে প্রমাণিত হইল পতনশীল বস্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহা সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।

Atwood যন্ত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের সত্যতা প্রমাণিত করা যায়।

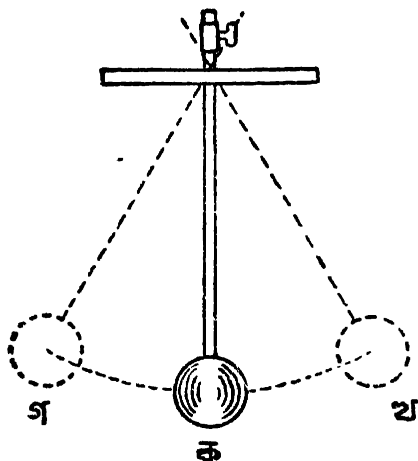
সরল দোলক

(Simple Pendulum)

সূচনা : দোলকের তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন **গ্যালিলিও** (Galileo)। তিনি ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইটালি দেশের পাইসা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিন গীর্জ্জাঘরে বসিয়া থাকাকালীন দেখিতে পান, ছাদ হইতে লম্বিত একটা লণ্ঠন দুই পাশে দুলিতেছে। তাঁহার অনুমান হইল যে লণ্ঠনটার প্রত্যেক দোলনের কাল সমান। তখনকার দিনে ঘড়ি ছিল না। তিনি নিজের হাতের নাড়ী টিপিয়া উহার স্পন্দন গণিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য। তখন তাহার মনে হইল, দোলকের সাহায্যে কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে তাহা দ্বারা সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। তারপর তিনি ঘড়ি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিন্তু কার্য্যটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর হল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক **হায়গেন্স্** (Huyghens) দোলক-ঘড়ি নির্ম্মাণ করেন।

দোলক (Pendulum) : এক গাছা সরু ভারহীন পাকশূন্য সুতার একপ্রান্ত কোনখানে বাঁধিয়া উহার অপর প্রান্তে একটা ভারী বল ঝুলাইয়া দাও। ইহাকে

দোলক (Pendulum) বলে। বলটির নাম **দুল** (Bob)। দুলের কেন্দ্র হইতে ঝুলনের স্থান পর্য্যন্ত দোলকের **দৈর্ঘ্য** (Length)। এখন বলটিকে কোন পার্শ্বে ('খ' বা 'গ') টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা এক সমতলে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ দুলিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া থামিয়া যাইবে।



২২ নং চিত্র—দোলক

চিত্রে বলটি 'খ' হইতে 'গ' আবার 'গ' হইতে 'খ' এইরূপে দুলিতেছে। দোলন আরম্ভ হইবার সময় বলটি 'ক'তে ছিল। 'কখ' বা 'কগ' এই অন্তরকে দোলনের **বিস্তার** (Amplitude) বলে। 'খ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গ' পর্য্যন্ত দুলিয়া পুনরায় 'খ'তে ফিরিয়া আসিলে দোলকের একটি **পূর্ণ দোল** (Complete Oscillation) হয়। একটি পূর্ণ দোলনের যে সময় লাগে উহার নাম **দোলনকাল** (Period of Oscillation)।

দোলকের নিয়ম (Laws of Pendulum): দোলকের দোলন ও দোলনকালের কয়েকটি নিয়ম আছে। নিম্নলিখিত সূত্রটি মনে রাখিলে দোলকের নিয়মগুলি সহজেই বুঝিতে পারিবে :—

$$\text{দোলনকাল } (T) = 2\pi\sqrt{\frac{\text{দৈর্ঘ্য } (l)}{\text{অভিকর্ষ } (g)}}$$

$$= 2 \times \frac{22}{7}\sqrt{\frac{\text{দৈর্ঘ্য } (l)}{\text{অভিকর্ষ } (g)}} \qquad (\pi = \tfrac{22}{7})$$

(১) **দোলনকাল দোলকের বিস্তারের** (amplitude) **উপর নির্ভর করে না**। দুলটিকে অল্প দূরে কিংবা কাছে টানিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাইবে যে দোলনকাল ঠিক সমান রহিয়াছে।

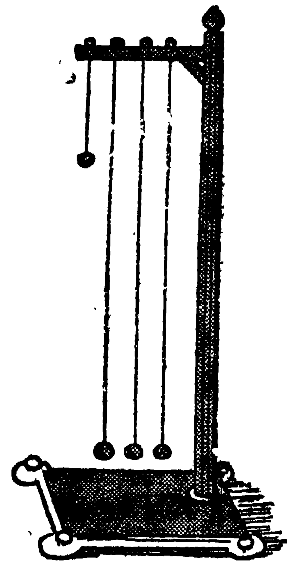
(২) **দোলনকাল দোলকের দৈর্ঘ্যের** (length) **উপর নির্ভর করে। ইহা দোলকের দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক** অর্থাৎ দৈর্ঘ্য চারিগুণ

বাড়িলে দোলনকাল দুইগুণ বাড়ে, দৈর্ঘ্য নয়গুণ বাড়িলে দোলনকাল তিনগুণ এইরূপ নিয়মে বাড়ে।

(৩) **দোলনকাল অভিকর্ষের** (gravity) **উপর নির্ভর করে। ইহা অভিকর্ষের বর্গমূলের ব্যস্ত অনুপাতিক** অর্থাৎ অভিকর্ষ চতুর্গুণ হইলে দোলনকাল অর্দ্ধেক, যোলগুণ হইলে দোলনকাল সিকি ইত্যাদি রূপ হয়।

(৪) **দোলনকাল দুলের ভর** বা **উপাদানের** (mass or material of the bob) **উপর নির্ভর করে না।**

দোলকের নিয়ম পরীক্ষা (Verification of the laws) **:** উপরের নিয়মগুলি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এজন্য বিশেষ একপ্রকার ঘড়ি ব্যবহৃত হয়। এ ঘড়ি ইচ্ছামত মুহূর্ত্তে চালানো বা বন্ধ করা যায়, এজন্য ইহাকে ষ্টপ্‌ ওয়াচ বলে। এখন পরীক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌। সীসার বলের একটি দোলক প্রস্তুত করিয়া ঝুলাইয়া দাও; কিন্তু বিস্তার যেন খুব বেশী না হয়। ষ্টপ্‌ ওয়াচের সাহায্যে 20টি পূর্ণদোলে কত সময় লাগে দেখ। ইহা হইতে আমরা দোলনকাল বাহির করিতে পারি। এইবার আবার দুলটিকে বিভিন্ন বিস্তার লইয়া দুলাইয়া দাও এবং ষ্টপ্‌ ওয়াচের সাহায্যে 10টি পূর্ণদোলে কত সময় লাগে দেখ। ইহা হইতেও আমরা দোলনকাল বাহির করিতে পারি। দেখিতে পাইবে যে দোলনকাল ঠিক সমানই আছে। অতএব **প্রথম নিয়ম প্রমাণিত হইল।**


২৩নং চিত্র—দোলকের নিয়ম পরীক্ষা

এইবার একখানা কাঠ হইতে চারিটি দোলক ঝুলাইয়া দাও। প্রথমটির দুল লোহার, দ্বিতীয়টির দুল পিতলের এবং তৃতীয়টির সীসার। কিন্তু এই তিনটি দোলকের দৈর্ঘ্য যেন একই হয়। চতুর্থ দোলকের দুলটি যে বস্তুই হউক, উহার দৈর্ঘ্য প্রথম তিনটি দোলকের দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ কর। এখন সকল দোলককেই দুলাইয়া ষ্টপ্‌ ওয়াচের সাহায্যে দোলনকাল পরীক্ষা করিয়া দেখ। প্রথম তিনটি

দোলক একই সময়ে এবং এক সঙ্গে দুলিতেছে। কিন্তু চতুর্থটি অনেক তাড়াতাড়ি দুলিতেছে ; চতুর্থ দোলকটি একবার দুলিতে যে সময় লইতেছে, প্রথম তিনটি দোলক একবার দুলিতে তাহার দ্বিগুণ সময় লইতেছে। প্রথম তিনটি দোলকের দৈর্ঘ্য চতুর্থের 4 গুণ। কাজেই দৈর্ঘ্য 4 গুণ বাড়িলে দোলনকাল 2 গুণ বাড়িয়া যায়। অতএব **দ্বিতীয় নিয়ম প্রমাণিত হইল**। আবার দেখ, প্রথম তিনটি দোলকের স্থূল ভিন্ন বস্তুতে নির্ম্মিত এবং উহাদের ভরও পৃথক। কিন্তু তাহার জন্য দোলক-গুলির দোলনকালের কোন পার্থক্য হয় নাই। অতএব **চতুর্থ নিয়মও প্রমাণিত হইল**। **তৃতীয় নিয়ম** প্রমাণিত করিতে হইলে দোলকটিকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (অভিকর্ষের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এমন স্থানে) লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। দেখা যায়, অভিকর্ষ বর্দ্ধিত হইলে দোলনকাল কমিয়া যায় অর্থাৎ দ্রুত হইয়া থাকে।

ভর ও ভার বা ওজন
(Mass and Weight)

সাধারণতঃ আমরা বস্তুর ভর ও ভার বা ওজনের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। ইহাদের একার্থজ্ঞাপক হিসাবে ব্যবহার করি কিন্তু ইহা ত্রুটিপূর্ণ। **ভর বলিতে কোন বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থ আছে তাহাই বুঝি**। ভার বা ওজন কি ? কোন বস্তু হাতের উপর লইলে অভিকর্ষের প্রভাবে হাতের উপর একটি নিম্নাভিমুখী বল অনুভূত হয়। এই বলকেই আমরা ওজন বলিয়া থাকি। অর্থাৎ **পৃথিবী যে বলে কোন বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহাই উহার ওজন**। পৃথিবী না থাকিলে ওজন থাকিবে না কিন্তু ভর থাকিবেই। ভূকেন্দ্রে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল শূন্য ; সুতরাং কোন বস্তুর ওজন ওখানে থাকিবে না কিন্তু উহার ভর একই থাকিবে। ভর বস্তুর নিজস্ব একটি গুণ, ওজন তাহা নহে। একই বস্তুর ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হইতে পারে (পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ—মেরু অঞ্চলে যত প্রবল বিষুবরেখায় তত নহে ; পৃথিবীপৃষ্ঠে যত প্রবল পৃথিবীর অভ্যন্তরে তত নহে) কিন্তু ইহার ভর একই থাকিবে। সেইজন্য ওজনকে পদার্থের অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম (essential property)

বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ভর বস্তুর একটি নিজস্ব গুণ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মনে করিত ইহার মানের কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। **আইনষ্টাইন** প্রমাণ করিলেন যে বস্তুর ভর গতির তারতম্যের জন্য পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

ভর ও ওজন সমানুপাতিক (Mass and Weight proportional): মনে কর **একই স্থানে** তিনটি বস্তু আছে এবং তাহাদের ভর যথাক্রমে m_1, m_2 ও m_3 এবং তাহাদের ওজন যথাক্রমে w_1, w_2 ও w_3। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওজনের অর্থ হইতেছে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল এবং এই আকর্ষণজনিত বলের জন্য বস্তুতে g ত্বরণ সৃষ্টি হয়। নিউটনের দ্বিতীয় গতি-সূত্র অনুসারে $w_1 = m_1 g$; $w_2 = m_2 g$; $w_3 = m_3 g$

$$\therefore\ g = \frac{w_1}{m_1},\ g = \frac{w_2}{m_2},\ g = \frac{w_3}{m_3}$$

আমরা জানি একই স্থানে gএর মান সমান

$$\therefore \frac{w_1}{m_1} = \frac{w_2}{m_2} = \frac{w_3}{m_3}$$

∴ একই স্থানে ভর ও ওজন সমানুপাতিক।

যেহেতু একই স্থানে ভর ও ওজন সমানুপাতিক সুতরাং সেই স্থানে দুইটি বস্তুর ভর সমান হইলে উহাদের ওজন সমান হইবে। সাধারণ তুলায় (Common Balance) বস্তুর ভর মাপা হয় ও স্প্রিং তুলায় (Spring Balance) বস্তুর ওজন মাপা হয়। সাধারণ তুলায় বস্তুর ওজন মাপা সম্ভবপর নয় কারণ বস্তুর ভর মাপিবার জন্য যে প্রমাণ ভরসমূহ (standard weights) ব্যবহৃত করা হয় উহারা উভয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উহার আকর্ষণজনিত বলে তারতম্যের দরুণ একই রূপে প্রভাবান্বিত হয় এবং ফলে বস্তুর ওজন নিখুঁতভাবে মাপা যায় না।

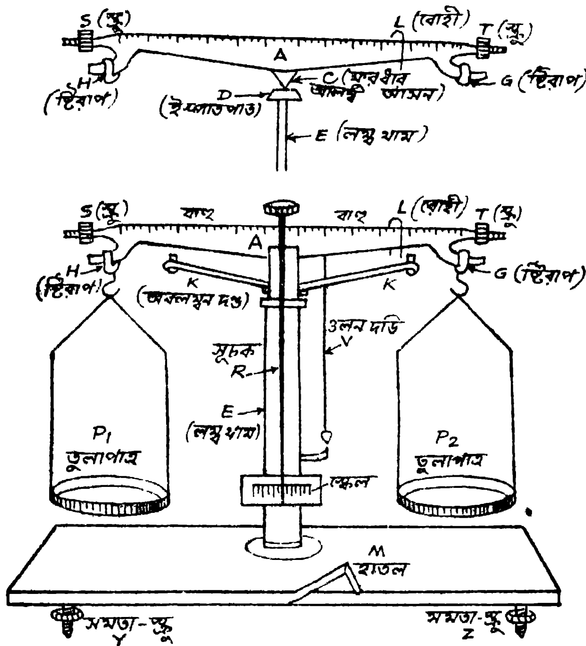
তুলা (Balance)

তুলার সাহায্যে বস্তুর ভর ও ভার বা ওজন মাপা যায়। বস্তুর ভর (mass) মাপিবার জন্য **সাধারণ তুলা** (Common Balance) ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে কোন দুই বস্তুর ভর (mass) তুলনা করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বেই তোমরা দেখিয়াছ, একই স্থানে বস্তুর ভর ও ওজন সমানুপাতিক হয় অর্থাৎ দুইটি বস্তুর ভর সমান হইলে উহাদের ওজন সমান হয়। সুতরাং প্রমাণ ভরসমূহের (standard

weights) ওজনের সহিত তুলনা করিয়া অপর বস্তুর ভর নিরূপণ করা যায়। বস্তুর ভার বা ওজন (weight) মাপিবার জন্য **স্প্রিং তুলা** (Spring Balance) ব্যবহার করা হয়। আমরা এই দুইটি তুলার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

সাধারণ তুলা (Common Balance): সাধারণ তুলার নিম্নলিখিত অংশ থাকে :

(১) **তুলাদণ্ড** (Balance Beam): ইহা একটি অনুভূমিক ধাতব দণ্ড (চিত্রের A)। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে ইস্পাত বা আগেট (agate) নির্মিত একটি ক্ষুরধার (knife-edge) আসনে (C) তুলাদণ্ডটি বসান থাকে। এই ক্ষুরধারকে



২৫নং চিত্র—সাধারণ তুলা

আলম্ব (fulcrum) বলে। আলম্বের দুই দিকের অংশকে তুলার **বাহু** (Arm) বলে। অনেক তুলায় একটি বাঁকা ধাতুর তার তুলাদণ্ডের উপর বসান থাকে। ইহাকে **রোহী** (Rider) বলে। রোহীর ভর সাধারণতঃ ১০ মিলিগ্রাম হয়।

তুলাদণ্ডের মধ্যস্থল হইতে প্রত্যেক বাহুতে কয়েকটি সমান অংশের দাগ কাটা থাকে প্রত্যেক দাগ ১ মিলিগ্রাম ভরের নির্দেশ দেয়। ১০ মিলিগ্রাম অপেক্ষা কম ভরের বস্তু তুলায় মাপিতে হইলে এই রোহীকে কার্য্যে লাগান হয়। ঘর্ষণ বাধা হ্রাস করিবার জন্য ক্ষুরধার আসনটি একটি ক্ষুদ্র ইস্পাতের পাতের (D) উপর বসান থাকে। পাতটি আবার লম্ব থামের (E-vertical pillar) উপর বসান থাকে। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা তুলাদণ্ডটি আসনের উপর দোল খাইতে পারে, কিন্তু পড়িয়া যায় না। তুলাদণ্ডটির দুই প্রান্তে আগেট নির্ম্মিত ক্ষুরধার থাকে। ক্ষুরধারের উপর দুইটি **ষ্টিরাপ** (stirup) G ও H আছে ; ইহা হইতে তুলাপাত্র ঝুলান হয়।

(২) **তুলাপাত্র** (Scale Pan) : তুলাপাত্র দুইটি (P_1 ও P_2) সমান ওজনের হয়। উহার একটিতে পরিমেয় বস্তু ও অপরটিতে প্রমাণ ভরসমূহ (Standard weights) অর্থাৎ জানা ভরের বস্তুখণ্ড প্রয়োজনমত রাখা হয়।

(৩) **হাতল** (Handle or Key) : তুলার পাটাতনের (base board) সংযুক্ত হাতল (M) ঘুরাইয়া লম্ব-থামকে উঠান বা নামান যায়।

(৪) **তুলা স্থির রাখিবার ব্যবস্থা** (Arresting arrangement) : তুলা যখন ব্যবহৃত হয় না তখন হাতল ঘুরাইয়া লম্ব-থামকে নামান হয় ; ইহাতে তুলাদণ্ডটি দোল খায় না এবং দুইটি অবলম্বনের (K) উপর স্থির থাকে এবং তুলাপাত্রটি দুইটি কাঠের পাটাতনের উপর স্থির থাকে।

(৫) **সূচক** (Pointer) : ইহা তুলাদণ্ড ABর ঠিক মধ্যস্থলে লম্বভাবে আবদ্ধ একটি সরু কাঁটা (চিত্রের R)। AB দোল খাইতে থাকিলে সূচকটিও দোলে এবং উহার নিম্নপ্রান্ত একটি স্কেলের গা ঘেঁসিয়া চলে। যখন তুলাদণ্ডটি ঠিক অনুভূমিক থাকে তখন কাঁটার নিম্নপ্রান্ত স্কেলের মধ্যবিন্দুতে স্থির থাকে। স্কেলটি থামের নিম্নদেশ আঁটা থাকে।

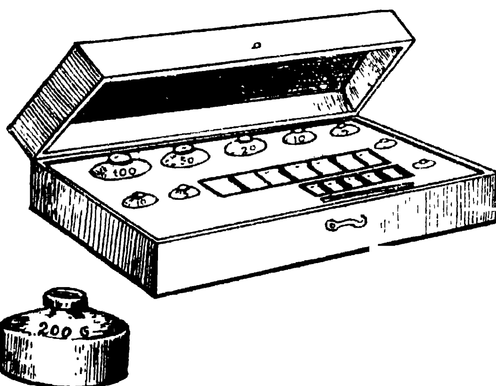
(৬) **স্ক্রু** (Screw) : তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটি স্ক্রু আছে (চিত্রের S,T) উহাদিগকে সামান্য ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডটিকে অনুভূমিক করা হয়।

(৭) **সমতা-স্ক্রু** (Levelling Screw) : পাটাতনের নীচের স্ক্রু (চিত্রের Y, Z) ঘুরাইয়া থামকে ঠিক লম্ব (vertical) রাখা হয়। থামের পাশে একটি **ওজন দড়ি** (plumb line—চিত্রের V) ঝুলান থাকে। ইহার সাহায্যে পাটাতনটি ঠিক অনুভূমিক আছে কিনা এবং থামটি ঠিক লম্ব আছে কিনা তাহা বুঝা যায়।

সমস্ত যন্ত্রটি একটি কাচের বাক্সে ঢুকান থাকে—যাহাতে ওজনের সময় যন্ত্রটি বাতাসে দোল না খায়।

(৮) **ওজনের বাক্স** (Weight-box) : ওজন-বাক্স তুলার সংলগ্ন কোন অংশ নয় তথাপি তুলার সাহায্যে ভর মাপিতে এই বাক্সের প্রয়োজন। এই বাক্সে প্রমাণ ভরসমূহ (Standard weights) অর্থাৎ জানা ভরের বস্তুখণ্ড থাকে।

ভর পরিমাপের নীতি (Method for measurement of masses) : তুলাটির যদি কোনরকম ত্রুটি না থাকে তবে সাধারণতঃ বস্তুর ভর মাপিবার জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়। পরিমেয় বস্তুটিকে বাম তুলাপাত্রে রাখিয়া ডান তুলাপাত্রে ওজনের বাক্স হইতে আন্দাজমত এক একটি করিয়া বাট-খারা বা প্রমাণ ভর বস্তু-খণ্ড রাখিতে হয় এবং দেখা হয় কখন তুলাদণ্ডটি অনুভূমিক হইল। তুলা-দণ্ডটি অনুভূমিক হইলে সূচকের তীক্ষ্ণপ্রান্ত স্কেলের 0-দাগের সহিত মিলিয়া থাকিবে। ডান তুলাপাত্রে রক্ষিত প্রমাণ ভরসমূহের মোট ভর পরিমেয় বস্তুটির ভরের সমান। তোমরা মনে রাখিবে প্রমাণ বাটখারার ভরের সহিত তুলনামূলকভাবে বস্তুটির ভর বাহির করা হইল।



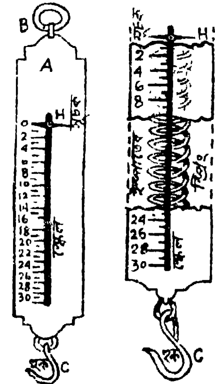
২৬নং চিত্র—ওজনের বাক্স

সাধারণ তুলার আবশ্যকীয় গুণ (Requisities of a good Balance) : সাধারণ তুলায় ভর সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে তুলার নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন : (১) তুলা **নির্ভুল** (True) হইবে অর্থাৎ সমান ভরের বস্তু দুই পাত্রে রাখিলে তুলাদণ্ড অনুভূমিক থাকিবে। নির্ভুলতার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা চাই : (ক) তুলার বাহু দুইটি সমান হইবে ; (খ) তুলাপাত্র দুইটির ওজন সমান হইবে ; (গ) তুলার ভারকেন্দ্র (centre of gravity) লম্বভাবে আলম্বের (fulcrum) নীচে থাকিবে।

(২) তুলা **সূক্ষ্ম** বা **সুবেদী** (Sensitive) হইবে অর্থাৎ দুই পাশে ভরের সামান্য ইতর বিশেষ হইলেই যেন তুলাদণ্ড অনুভূমিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়। সূক্ষ্মতা বা সুবেদীর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা চাই: (ক) তুলাদণ্ড ও তুলাপাত্রের ভার বা ওজন কম হইবে, (খ) তুলাদণ্ডের বাহু দুইটি লম্বা হইবে, (গ) সমগ্র তুলার ভারকেন্দ্র আলম্বের খুব সন্নিকটে থাকিবে।

(৩) তুলা **সুস্থিত** বা **সুপ্রতিষ্ঠিত** (Stable) হইবে অর্থাৎ সাম্য অবস্থা হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলে তুলাদণ্ড যেন অচিরেই আবার সাম্যে ফিরিয়া আসে। সুস্থিত বা সুপ্রতিষ্ঠিতার জন্য সমগ্র তুলার ভারকেন্দ্র আলম্বের বেশী নীচে থাকা দরকার। সূক্ষ্মতা বা সুবেদী সর্ত্তের ইহা অনেকটা বিপরীত। সূক্ষ্ম ওজনের তুলার ভারকেন্দ্র আলম্বের সন্নিকটে এবং সাধারণ ওজনের তুলার ভারকেন্দ্র আলম্ব হইতে দূরে থাকে।

স্প্রিং তুলা (Spring Balance): বস্তুর ভার বা ওজন (weight) মাপিবার জন্য স্প্রিং তুলা ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে: (১) **ইস্পাতের স্প্রিং**—একটি ধাতব আবরণের মধ্যে (চিত্রের A) একটি ইস্পাতের স্প্রিংএর এক প্রান্ত আবরণের মাথায় একটি আংটার (চিত্রের B) সঙ্গে আটকান থাকে এবং নিম্নপ্রান্ত একটি দণ্ডের সহিত আটকান থাকে। দণ্ডের শেষে একটি হুক (চিত্রের C) থাকে এবং যে বস্তুর ওজন বাহির করিতে হইবে তাহা হুকে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।



২৭নং চিত্র—স্প্রিং তুলা

(১) **সূচক ও স্কেল:** স্প্রিং এর সহিত একটি সরু কাঁটা সূচকের কাজ করিবার জন্য লাগান থাকে (চিত্রের H)। উহা একটি স্কেলের গা বহিয়া উঠানামা করে। দণ্ডের নীচের প্রান্তে টান পড়িলে স্প্রিং লম্বা হয় ও সূচক নামিয়া আসে। সূচক যেটুকু নামে তাহাই স্প্রিং এর দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন। ভাল স্প্রিং হইলে নির্দ্দিষ্ট বলে সর্ব্বদাই একই পরিবর্ত্তন হয় এবং বল ও দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন সমানুপাতিক।

প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বল প্রয়োগ করিয়া সূচক কতটুকু নামে তাহা লক্ষ্য করা হইল। উহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বলে সূচক কতটুকু নামিবে তাহা জানিয়া যন্ত্রের গায়ে স্কেল অঙ্কিত করা হইল। স্কেলের উপর সূচকের অবস্থা হইতেই বলের মান পাওয়া যাইবে।

কোন বস্তুকে হুক হইতে ঝুলাইয়া দিলে পৃথিবী ঐ বস্তুকে কত বলে আকর্ষণ করে তাহা সূচকের অবস্থান হইতে পাওয়া যাইবে অর্থাৎ বস্তুর ওজন পাওয়া যাইবে।

পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ। সুতরাং একটি বস্তুর ভার বা ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হয়। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে গিয়া একই স্প্রিং তুলার সাহায্যে একই বস্তুর ওজন নির্দ্ধারণ করিলে তাহাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য পাওয়া যাইবে।

সাধারণতঃ স্প্রিং তুলার গায়ে বলের দাগ কাটা থাকে না। নির্দ্দিষ্ট ভরবিশিষ্ট বস্তু ঝুলাইয়া স্কেলে ভরেরই দাগ কাটা থাকে। এইরূপ দাগ কাটা তুলায় একই বস্তু বিভিন্ন স্থানে ওজন করিলে ভরের একটু পার্থক্য পাওয়া যাইবে। ভরের এই পার্থক্যটুকু পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের তারতম্যের দরুণ হয়। তোমরা মনে রাখিবে স্প্রিং তুলা ভর মাপে না, বল মাপে।

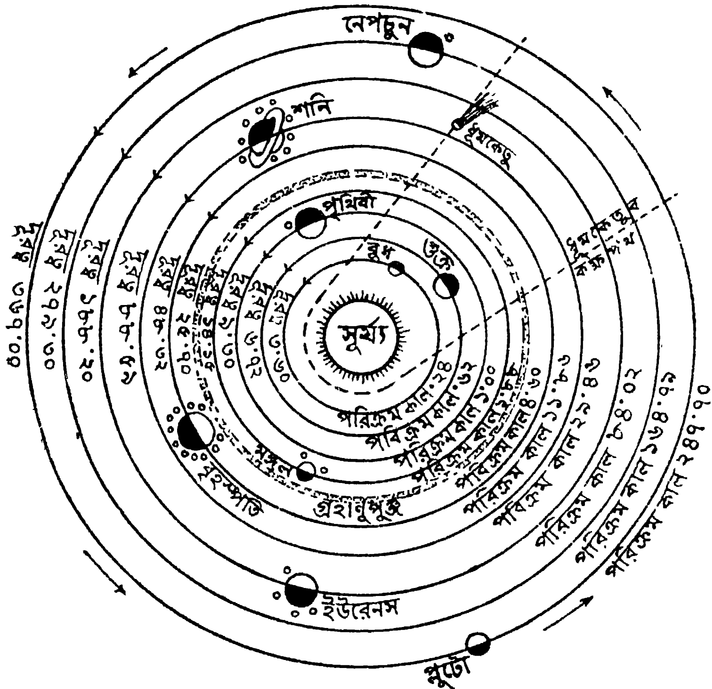
সাধারণ তুলা ও স্প্রিং তুলার তুলনা (Comparison between Common Balance and Spring Balance): দুই তুলার নীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সাধারণ তুলার এক তুলাপাত্রে বস্তু ও অপর তুলাপাত্রে প্রমাণ ভরসমূহ বা বাটখারা থাকে। বস্তু ও বাটখারার উপর পৃথিবীর যে কোন স্থানে অভিকর্ষ বল সমানভাবে ক্রিয়া করে। সেইজন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে বস্তুর ওজনের যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাহা সাধারণ তুলায় প্রকাশ পায় না। একই বস্তুর ওজন সাধারণ তুলায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই হইবে। সাধারণ তুলায় বস্তুর ভরের তুলনা করা যায়। স্প্রিং তুলায় নির্দ্দিষ্ট বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলে স্প্রিং প্রসারিত হয়। সুতরাং এই তুলায় বস্তুটির ওজন পাওয়া যায়। পৃথিবীর আকর্ষণ বল যেখানে বেশী স্প্রিং-এর প্রসারণ সেখানে বেশী হয়। স্প্রিং-তুলায় বিভিন্ন স্থানে একই বস্তুর ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরা যায়।

সৌরজগৎ ও নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র

(Solar System and Newton's Law of Gravitation)

মোটামুটি বিশ্বে আছে বহু নীহারিকা বা নক্ষত্রজগৎ। ইহারা মহাশূন্যে এক একটি দ্বীপের মত। এই দ্বীপগুলি মহাশূন্যে ভীষণ বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ, বর্ণলিপিযন্ত্র (Spectroscope) ও ফটোগ্রাফারের সাহায্যে আমরা

এ কথা জানিতে পারিয়াছি যে অধিকাংশ দ্বীপগুলি আমাদের দ্বীপ হইতে ভীষণ বেগে দূরে সরিয়া যাইতেছে। আমাদের দ্বীপটির অর্থাৎ আমাদের নক্ষত্রজগতের সীমানা ছায়াপথ পর্য্যন্ত। কোটি কোটি নক্ষত্র ইহার অন্তর্গত এবং এই নক্ষত্রগুলি এক একটি মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়া ছায়াপথে বিরাজ করিতেছে। প্রায় একশত নক্ষত্রমণ্ডলী মিলিয়া



২৮নং চিত্র—সূর্য্য ও উহার পরিবারবর্গ

[অঙ্কনের সুবিধার জন্য বৃত্তাকার পথ দেখান হইয়াছে]

আমাদের নক্ষত্রজগৎ। এই নক্ষত্রজগতের কোন এক মণ্ডলী প্রদেশের অধিবাসী হইতেছে আমাদের সূর্য্য ও তাহার পরিবারবর্গ—গ্রহ* (Planets), উপগ্রহ

* বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, গ্রহাণুপুঞ্জ, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটো।

† বুধ ও শুক্রের কোন উপগ্রহ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ এ যাবৎ দেখা গিয়াছে—ফোবস ও ডিমস। চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। বৃহস্পতির ১১টি, শনির ৯টি, ইউরেনসের ৪টি ও নেপচুনের ১টি উপগ্রহ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(Satellites), ধূমকেতু (Comets) ও উল্কা (Meteors)। ইহাই **সৌরজগৎ** (Solar System) নামে খ্যাত।

পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র—ইহাই ছিল পূর্ব্বেকার মানুষের বিশ্বাস। সূর্য্যের প্রতিদিন পূর্ব্ব গগনে উদয় ও পশ্চিম গগনে অস্ত দেখিয়া পূর্ব্বেকার মানুষ এই বিশ্বাসে দৃঢ় ছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তন বা আহ্নিক গতির (rotation) ফলে যে সূর্য্যের এই আপাত গতি সৃষ্টি হয় ইহা পূর্ব্বেকার মানুষের কল্পনাতীত ছিল। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে-গ্রীক পণ্ডিত **টলেমি** (Ptolemy) বলিয়াছেন, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। টলেমির এই উক্তি পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্ম্মাণ পণ্ডিত **কোপার্ণিকাস** (Copernicus) সিদ্ধান্ত করিলেন, সূর্য্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। গ্রহ-উপগ্রহাদি তারাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয পণ্ডিত **গ্যালিলিও** (Galileo) দূরবাক্ষণের সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহাদির বহু তথ্য নির্ণয করেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে কোপার্ণিকাসের প্রবর্ত্তিত মতের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে নিরূপিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক **কেপলার** (Kepler) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গ্রহগুলি বৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। সূর্য্যকে একটি ফোকসে রাখিয়া (the sun at one focus) সামান্য কিছুটা উপবৃত্তকার (elliptical) পথে প্রদক্ষিণ করে। এই গতির সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সূত্র দিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক **নিউটন** (Newton) এই গতির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া এবং আপেল ফলের ভূপৃষ্ঠে পতনের কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া **মহাকর্ষ সূত্র** (Law of Gravitation) আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কৃত সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া গ্রহ ও উপগ্রহগণের গতির কারণ ব্যাখ্যা করা যায। সূর্য্য ও গ্রহগণের মধ্যে মহাকর্ষজনিত বলে ক্রিয়া করিতেছে। অন্য গ্রহদের তুলনায় সূর্য্যের ভর (mass) বেশী থাকায সূর্য্যের আকর্ষণবল অধিকতর ক্রিয়াশীল। এখন প্রশ্ন হইতেছে কেন গ্রহগুলি সূর্য্যকে উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে। গতিশীলতাই জ্যোতিষ্কদের ধর্ম্ম। নিউটনের প্রথম সূত্র হইতে আমরা জানি বাহ্যিক প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বাধ্য না হইলে সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখা ধরিয়া চলে। গ্রহদের ক্ষেত্রে সূর্য্যের আকর্ষণ বলের পরিমাণ এমন যে গ্রহগুলি তাহাদের স্বাভাবিক রৈখিক গতি

(rectilinear motion) হইতে বিচ্যুত হইয়া উপবৃত্তাকার পথে ইহাকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যের আকর্ষণ বলের ফলে গ্রহদের যে নির্দ্দিষ্ট গতি থাকিলে উহারা সূর্য্যকে বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করিত তাহা অপেক্ষা উহাদের গতি অধিকতর থাকায় উহারা উপবৃত্তাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যের আকর্ষণ বল এত অধিক নয় যে উহার টানে গ্রহগুলি সূর্য্যের উপরে আসিয়া পড়ে (ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত কোন বস্তু প্রধানতঃ পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মাত্রাধিকের দরুণ ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে)। একটি উদাহরণ লইলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হইবে। তোমরা জান সূতার আগায় ঢিল বাঁধিয়া আঙ্গুল দিয়া বৃত্তপথে ঘুরাইলে সর্ব্বদা ঢিলটির উপর একটি বল প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে অভিকেন্দ্র বল বা কেন্দ্রভিগ বল (Centripetal force) বলে। ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। সুতরাং এই অভিকেন্দ্র বলেরও থাকে। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী এই দুই বলের মান সমান। অভিকেন্দ্র বল বৃত্তপথে গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। অভিকেন্দ্র বল যে প্রযোগ করে তাহার উপরে অপকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া (Centrifugal reaction) প্রযুক্ত হয়। ঢিলে সূতা বাঁধিয়া বৃত্তপথে ঘুরাইলে আঙ্গুল সূতার সাহায্যে ঢিলের উপর যে টান প্রযোগ করে তাহাই অভিকেন্দ্র বল এবং আঙ্গুলের উপর যে টান পড়ে তাহাই অপকেন্দ্রিক প্রতিক্রিয়া। অবশ্য ইহার যে কোনটিকে ক্রিয়া ও অপরটিকে প্রতিক্রিয়া ধরা যাইতে পারে। যখন ঢিল খসিয়া যায় বা সূতা ছিড়িয়া যায় অর্থাৎ যখন বল কার্য্য করে না তখন ঢিল বৃত্তপথে না ঘুরিয়া বৃত্তের স্পর্শক (tangent) বরাবর ছুটিয়া যায় অর্থাৎ ইহার স্বাভাবিক রৈখিক গতিতে ধাবমান হয়। সূর্য্যের আকর্ষণ বল অভিকেন্দ্র বলের ন্যায় ক্রিয়া করে।

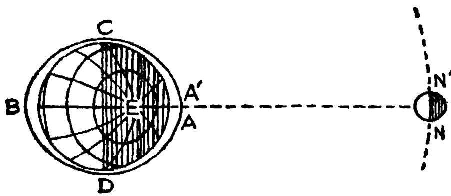
গ্রহের চতুর্দ্দিকে উপগ্রহগুলির প্রদক্ষিণের কারণ একই। উপগ্রহগুলি আপন আপন গ্রহের নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রচণ্ড মহাকর্ষীয় বল ক্রিয়া করে এবং তাহার পরিমাণ এমন যে তাহারা উপবৃত্তাকার পথে নির্দ্দিষ্ট গ্রহদের প্রদক্ষিণ করিতেছে।

আইনষ্টাইন (Einstein) মহাকর্ষের ব্যাখ্যা নূতনভাবে দিয়াছেন এবং তাহা পূর্ব্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি এবং গ্রহগুলি কেন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘোরে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যা নিউটনের ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও সুনিশ্চিত।

জোয়ার-ভাটা (Tides): প্রত্যেক দিন প্রায় ১২ ঘণ্টা অন্তর সমুদ্রের জল বহুবিধ কারণে নিয়মিত উঠা-নামা করে বলিয়া সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীর জলেও

ঐরূপ উঠা-নামা হয়। জলের এই নিয়মিত স্ফীতিকে **জোয়ার** (Flow or high tide) এবং পতনকে **ভাটা** (Ebb or low tide) বলা হয়।

পৃথিবী আপন অক্ষের (axis) উপর সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশির উপর একটি কেন্দ্রাতিগ বল (Centrifugal force) কার্য্য করে। ইহার ফলে জলরাশি সর্ব্বদা বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে চায়। জোয়ার সৃষ্টিতে ইহা কিছুটা সহায়তা করে। কিন্তু প্রধানতঃ চন্দ্রের মহাকর্ষণ বলের জন্য জোয়ার-ভাটা হয়। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক বলিয়া (চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবী হইতে প্রায় 2,39,000 মাইল) অন্যান্য জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা ইহার আকর্ষণ-শক্তি অধিকতর কার্য্যকরী হয়। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের ঠিক সম্মুখভাগে উপস্থিত হয় বা কাছে থাকে সেই অংশ চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। ভূভাগ অপেক্ষা জলরাশির উপর আকর্ষণ-শক্তির প্রভাব বেশী হওয়ায় (কঠিন স্থলের অণু অপেক্ষা তরল জলের অণু অপেক্ষাকৃত শিথিল থাকে) ঐ স্থানের জলরাশি ফুলিয়া উঠে এবং ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি ঐ অংশের দিকে প্রবাহিত হয় (পৃথিবীর মহাসাগরগুলি সব যুক্ত আছে)। চিত্রে দেখ, A স্থানের জলরাশি ফুলিয়া উঠায় C ও D স্থান হইতে জলরাশি A স্থানের দিকে আসে। উপরন্তু কেন্দ্রাতিগ বল এ প্রবাহকে সাহায্য করে। ফলে পৃথিবার ঐ অংশে জোযার সৃষ্টি হয়। ইহাকে **মুখ্য** বা **প্রত্যক্ষ জোয়ার** (Primary or Direct Tide) বলে। A স্থানের বিপরীত দিকে B স্থানে যে জলরাশি আছে তাহা পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্র হইতে প্রায় 4000 মাইল অধিক দূরবর্ত্তী (পৃথিবীর বাস প্রায় 7930 মাইল)। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্র-স্থলে চন্দ্রের আকর্ষণ B স্থানের জলরাশির উপর আকর্ষণ অপেক্ষা অধিক। আবার B স্থানের সমুদ্রতলস্থ কঠিন ভূভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। অতএব চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল চন্দ্রের দিকে সরিয়া যায় এবং তাহার সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত ভূভাগও সরিয়া আসে কিন্তু B স্থানের জলের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তাহা অতখানি সরে না। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রাতিগ বলের (Centrifugal force) প্রভাবে B



২৯নং চিত্র—জোয়ার-ভাটা

স্থানের চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। এই উভয়বিধ কারণে B স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **গৌণ** বা **পরোক্ষ জোয়ার** (Secondary or Indirect Tide) বলে।

পৃথিবীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে (ধর A স্থানে) যে সময়ে মুখ্য জোয়ার হয় এবং তাহার বিপরীত দিগস্থ স্থানে (B স্থানে) গৌণ জোয়ার হয় তখন মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে জল (পৃথিবীর মহাসাগরগুলি সব যুক্ত আছে) ঐ দুই স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে C ও D স্থানে **ভাটার** সৃষ্টি হয়। পৃথিবী তাহার অক্ষের উপর 23 ঘণ্টা 56 মিনিটে একবার আবর্ত্তিত হয় কিন্তু ইহার বার্ষিক গতির জন্য আহোরাত্র বা দিনমানের কাল 24 ঘণ্টা। সুতরাং A স্থান প্রায় 6 ঘণ্টা পরে C অবস্থানে আসে, প্রায 12 ঘণ্টা পরে B অবস্থানে আসে, প্রায় 18 ঘণ্টা পরে D অবস্থানে আসে এবং প্রায় 24 ঘণ্টা পরে A অবস্থানে আসে। সুতরাং প্রতিদিনে A স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার, একবার গৌণ জোয়ার ও দুইবার ভাটা হইবে। অর্থাৎ প্রতি স্থানে দৈনিক **দুইবার জোয়ার** ও **দুইবার ভাটা** হয়।

চন্দ্রের পরিভ্রমণ গতির জন্য (revolution) পৃথিবীর যে স্থান কোন দিন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রের ঠিক সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহার পর দিন ঠিক সেই সময়ে (অর্থাৎ 24 ঘণ্টা পরে) পৃথিবীর সেই স্থান চন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না। প্রায় 52 মিনিট আরও বেশী সময় লাগে। চিত্রে দেখ, চন্দ্রের অবস্থান যখন N স্থানে তখন পৃথিবীর A স্থান উহার সম্মুখ ভাগ। 24 ঘণ্টা পরে পৃথিবী আবার ঐ অবস্থানে আসিবে। কিন্তু তখন চন্দ্রের অবস্থান প্রায় N´ স্থানে (চন্দ্র প্রায় 27⅓ দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে)। চন্দ্রের সম্মুখে আসিতে হইলে A স্থানকে A´ স্থানে আসিতে হইবে। আবর্ত্তন গতি দ্বারা এই দূরত্বটুকু আসিতে প্রায় 52 মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ আজ যে স্থানে যে সময়ে মুখ্য জোয়ার প্রায় 24 ঘণ্টা 52 মিনিট পর সেই স্থানে আবার মুখ্য জোযার হইবে।

সূর্য্য বহু দূরে আছে (পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল) বলিয়া তাহার আকর্ষণ তত প্রবলভাবে কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীর একই দিকে অবস্থান করে এবং সেইজন্য পৃথিবীর উপর ইহাদের মিলিত আকর্ষণ খুবই প্রবল হয় সেদিন পৃথিবীর যে স্থানে মুখ্য চান্দ্র জোয়ার হয়, ঠিক সেই স্থানে মুখ্য সৌর জোয়ারও হয়। এবং তাহার

বিপরীত দিগস্থ স্থানে গৌণ চান্দ্র ও গৌণ সৌর জোয়ার হয়। ফলে জোয়ারের জল বেশ উঁচু হইয়া উঠে এবং ইহাকে **ভরা কটাল** বা **তেজ কটাল** বা **ভরা জোয়ার** (Spring tide) বলে। পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একদিকে চন্দ্র ও অপরদিকে সূর্য্য থাকে। সেদিন চন্দ্রের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী স্থানে মুখ্য চান্দ্র জোয়ার ও গৌণ সৌর জোয়ার হয় এবং তাহার বিপরীত দিগস্থ স্থানে গৌণ চান্দ্র জোয়ার ও মুখ্য সৌর জোয়ার হয়। জোয়ারের তীব্রতা বেশী থাকায় ইহাকেও **ভরা কটাল** বা **তেজ কটাল** বা **ভরা জোয়ার** (Spring tide) বলে। সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থান প্রায় পৃথিবীর সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যে স্থানে জোয়ার হয় সূর্য্যের আকর্ষণে সেইস্থানে ভাটা (চিত্রের A ও C স্থান লক্ষ্য কর —A স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ ও C স্থানে সূর্য্যের আকর্ষণ) হয়। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বলের কার্য্যের দরুণ জোয়ারের জল বেশী উঁচু হইয়া উঠিতে পারে না। ইহাকে **মরা কটাল** বা **মরা জোয়ার** (Neap tide) বলে।

জোয়ারের বেগ প্রধানতঃ চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল হইলেও বায়ুর বেগ, সমুদ্রের গভীরতা, তলদেশের ঘর্ষণ ইত্যাদি ইহাকে প্রভাবিত করে। গভীর সমুদ্রে জোয়ারের জল 3/4 ফুটের বেশী উঁচু হয না। উপকূলের নিকটে 10/12 ফুট হইতে 30/40 ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া থাকে। ভূমধ্য সাগরে ও কৃষ্ণ সাগরে জোয়ার হয় না। পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তিত হইতেছে, ফলে জোয়ারের স্রোত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয। এই স্রোতকে **জোয়ার-ভাটার টান** (tidal current) বলে। মাঝে মাঝে জোযারের জল নদীমুখে প্রবেশ করিবার সময় খুব উঁচু হইয়া সবেগে অগ্রসর হয়। ইহাকে **বান ডাকা** (tidal bore) বলে। নদীর খরপ্রবাহ, নদীমুখে বালুচর ও ফানেল আকারের নদীমুখ এই তিনটি কারণে বান দেখা দেয়। পশ্চিম বঙ্গের হুগলী, চীনের ইয়াং সিকিয়াং, ইংলণ্ডের সেভার্ণ প্রভৃতি নদীর বান অতিশয় প্রবল।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও **গ্রহ** (Artificial Satellite and Planet) **:** সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানুষ মহাশূন্য পরিক্রমার স্বপ্ন দেখিয়াছে। 1957 সালের 4th অক্টোবর রুশ বৈজ্ঞানিকগণ মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (artificial satellite) উৎক্ষেপণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর 1958 সালের 2nd ফেব্রুয়ারী মার্কিণ বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। 1959 সালের

2nd জানুয়ারী রুশ বৈজ্ঞানিকগণ যে রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছেন তাহা চন্দ্রালোক অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের দিকে ধাবমান হইয়া কৃত্রিম গ্রহে (artificial planet) পরিণত হইয়াছে। এই সাফল্য অদূর ভবিষ্যতে মানুষের মহাশূন্য পরিক্রমার স্বপ্নকে যে বাস্তবে রূপায়িত করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই কৃত্রিম উপগ্রহ ও গ্রহের সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

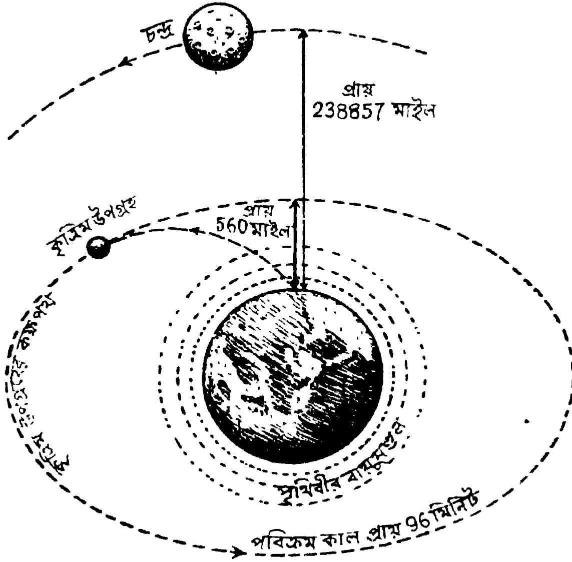


৩০নং চিত্র—কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত তিন স্তরবিশিষ্ট রকেট

ঊর্দ্ধদিকে কোন বস্তু ছুড়িয়া দিলে তাহা আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। ইহার প্রধান কারণ অভিকর্ষ বল (force of gravity)। তাছাড়া বস্তুটি ঊর্দ্ধদিকে যাইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণজনিত বলের জন্য বাধা পায়। ধরাতল হইতে ঊর্দ্ধদিকে 500 মাইলের অধিক দূরত্ব পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। কোন বস্তুকে ঐ দূরত্ব বা উহার ঊর্দ্ধে লইয়া যাওয়া যায় তবে বস্তুটির উপর ঘর্ষণজনিত বাধা প্রায় নগণ্য হইবে, থাকিবে শুধু অভিকর্ষ বল (force of gravity) এবং এই কারণে উহা ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিবে। এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে চন্দ্র (পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় 2 লক্ষ 39 হাজার মাইল) কেন পৃথিবীর আকর্ষণে ধরাতলে নামিয়া না আসিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরিতেছে। ইহার কারণ নিম্নরূপ। গতিশীলতাই জ্যোতিষ্কদের ধর্ম্ম। চন্দ্রের নিজস্ব গতি উহাকে স্বাভাবিক সরল পথে লইয়া যাইতে চায়। পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান চন্দ্রকে নীচের দিকে টানিয়া আনিতে চায়। এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির সামঞ্জস্যের দরুণ চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিরা থাকে [সুতার আগায় ঢিল বাধিয়া আঙ্গুল দিয়া উহাকে ঘুরাইলে যেমন হয় ইহা অনেকটা সেইরূপ]। সুতরাং আমরা যদি কোন বস্তুকে বহু ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া এমন গতিসম্পন্ন করিতে পারি যে উহা অভিকর্ষজ টানের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তবে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। রুশ বিজ্ঞানীরা বা মার্কিণ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে তাহাই

করিয়াছেন। বহু ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দ্দিষ্ট গতিসম্পন্ন করিতে তাঁহারা বহু স্তরবিশিষ্ট রকেটের (multi-stage rocket) সাহায্য লইয়াছেন [পূজার সময় তোমরা হাউই বাজি পোড়াও। নীচে আগুন ধরাইয়া দিলে উহা প্রবলবেগে আকাশের দিকে উঠিয়া যায়। হাউইতে আগুন দিলে হাউই-এর তলা দিয়া প্রবল-বেগে গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস-নির্গমন হইল ক্রিয়া (action)। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী ইহার সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা দিবে এবং গ্যাস যত বেগে হাউই-এর তলা দিয়া বহির্গত হইবে প্রতিক্রিয়া তত বেগে হাউইকে উপর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। যে হাউই-এর জ্বালানি (fuel) সরেস তাহা আকাশে বেশী দূরত্ব পর্য্যন্ত উঠিবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া উপগ্রহ ও গ্রহ উৎক্ষেপণের রকেট নির্ম্মিত হয়]। বায়ুর ঘর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিবার জন্য একটি রকেট না লইয়া বহু স্তরবিশিষ্ট রকেট লওয়া হয়। কারণ একটি রকেট লইলে কৃত্রিম উপগ্রহকে ঊর্দ্ধস্তরে নির্দ্দিষ্ট গতিসম্পন্ন করিতে ইহাকে বায়ুর মধ্য দিয়া অতি প্রচণ্ড গতিতে ধাবমান হইতে হয় এবং ঘর্ষণের ফলে যে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয় তাহাতে কৃত্রিম উপগ্রহ যে কোন ধাতু দিয়া প্রস্তুত হউক না কেন তাহা গলিয়া যায়। যতই ঊর্দ্ধে যাওয়া যায় ততই বায়ুর ঘনত্ব কমিয়া আসে এবং ফলে কোন বস্তু প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইলে ঘর্ষণজনিত যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তাহাতে উহার অবস্থান্তর (change of state) ঘটে না। এই কারণে বহু স্তরবিশিষ্ট রকেটের দ্বারা গতি ক্রমশঃ তীব্র করা হয়। রুশ বিজ্ঞানীরা 1957 সালের 4th অক্টোবর যে কৃত্রিম উপগ্রহ সমেত রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছিলেন তাহা তিন স্তরবিশিষ্ট ছিল। প্রথম স্তর রকেট কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় 36 মাইল ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া ঘণ্টায় প্রায় 1700 মাইল গতিসম্পন্ন করিয়াছিল। এই স্বল্প বেগের জন্য ঘর্ষণজনিত তাপ কম ছিল। দ্বিতীয় স্তর রকেট কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় 140 মাইল ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়াছিল এবং ঘণ্টায় প্রায় 10,000 মাইল গতিসম্পন্ন করিয়াছিল। গতি বেশী হওয়া সত্ত্বেও ঘর্ষণজনিত তাপ দারুণ বাধা সৃষ্টি করে নাই কারণ উপরিস্তরে বায়ুর ঘনত্ব কম এবং ফলে ঘর্ষণজনিত তাপ কম হয়। তৃতীয় স্তর রকেট কৃত্রিম উপগ্রহকে প্রায় 560 মাইল ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া উহাকে ঘণ্টায় প্রায় 18,000 মাইল গতিসম্পন্ন করিয়াছিল। পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান এবং কৃত্রিম উপগ্রহের এই রৈখিক গতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ফলে কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীকে

প্রদক্ষিণ করিতেছে। রুশ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা হইতে জানা যায় ঘণ্টায় প্রায় 18,000 মাইল বা 28,800 কিলোমিটার দ্রুতি **প্রথম মহাজাগতিক দ্রুতি** (first cosmic speed) যাহার ফলে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হইয়া **পৃথিবীর খুব সন্নিকটে** (close to earth) উহাকে প্রদক্ষিণ করিবে। ঘণ্টায় প্রায় 21,318 মাইল বা 34,322 কিলোমিটার দ্রুতি **দ্বিতীয় মহাজাগতিক দ্রুতি**



৩১নং চিত্র—কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ

(second cosmic speed) যাহার ফলে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু পৃথিবীর অভিকর্ষ বাধা অতিক্রম করিয়া মহাশূন্যে ধাবমান হইবে এবং সৌরজগতের একটি কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হইবে। রুশ বিজ্ঞানীরা 1959 সালের 2nd জানুয়ারী যে বহুস্তরবিশিষ্ট রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছেন তাহা আজ কৃত্রিম গ্রহে (artificial planet) পরিণত হইয়াছে।

ভারশূন্য বা **ওজনশূন্য অবস্থা** (Weightless state) : পৃথিবী যে বলে কোন বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাহাই উহার ভার বা ওজন। **ভূকেন্দ্রে** পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল শূন্য, সুতরাং কোন বস্তুর ভার বা ওজন ঐখানে থাকিবে না এবং সেই অবস্থাকে বস্তুর ভারশূন্য বা ওজনশূন্য অবস্থা বলা যায়। আবার যদি কোন বস্তুকে উর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপণ করিয়া এমন গতি সম্পন্ন করা যায় যে ইহার

স্বাভাবিক রৈখিক গতি (rectillinear motion) ও পৃথিবীর অভিকর্ষ টানের ফলে বস্তুটি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে (যেমন কৃত্রিম উপগ্রহ করিতেছে) তবে বস্তুটির যে অবস্থার উদ্ভব হয় তাহাকে ভারশূন্য বা ওজনশূন্য অবস্থা বলে। এইরূপ ভারশূন্য বা ওজনশূন্য অবস্থায় যদি মানুষ গিয়া পড়ে তবে কি ব্যাপার ঘটে দেখা যাক। এখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা বেশ কষ্টকর কারণ পৃথিবীর অভিকর্ষজ টান ক্রমাগত নিম্নের দিকে টানে ; কিন্তু তখন এ অসুবিধা থাকিবে না। হঠাৎ যদি পা হড়কায় তবে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়বারও ভয় থাকবে না। তুমি খাট হইতে জোরে মেঝেতে নামিলেই মেঝের প্রতিক্রিয়া তোমাকে অমনি ছাদের দিকে ঠেলিযা দিবে (নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে), আবার ছাদে মাথা ঠেকিলে ছাদের প্রতিক্রিয়া তোমাকে মেঝের দিকে ঠেলিযা দিবে। এইরূপে তুমি উপর নীচে করিতে থাকিবে। জল দিয়া কুলি করিলে, খুব জোরে জল বাহির না করিলে জল মুখের ভিতর থাকিয়া যাইবে। কোন খাদ্যই গলার নালী দিযা নীচের দিকে নামিবে না। তুমি ইচ্ছা করিলে দেওয়ালের উপর দিয়া হাঁটিয়া অন্য দেওয়ালে যাইতে পারিবে। পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় এইরূপ বহুবিধ বিপর্য্যয দেখা দিবে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেন অভ্যাসের ফলে এইরূপ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে।

Questions

1. State and explain Newton's law of gravitation.
2. State the laws of falling bodies and explain how you would verify them experimentally.
3. What is meant by acceleration due to gravity ? State its value in C. G. S. and F. P. S. units.
4. State the laws of a Simple Pendulum and explain how you would verify them experimentally.
5. Distinguish between mass and weight of a body and show that masses and weights are proportional.
6. Describe and explain the action of a Common Balance.
7. Describe and explain the action of a Spring Balance.
8. Explain the Solar system in the light of Newton's law of gravitation.
9. Explain the formation of tides.
10. State what you know about artificial satellite.
11. What do you mean by weightless state. What will be the position of a man in his normal activities ?

তৃতীয় অধ্যায়

আলোক (*Light*)

আলোক (Light) : দর্শন অনুভূতির জন্য দুইটি বস্তুর প্রয়োজন :—প্রথম চক্ষু ও দ্বিতীয় আলোক। যে কোন একটির অভাবে সমস্ত অন্ধকার। **যে বাহ্যিক কারণে আমাদের চক্ষুতে দর্শন অনুভূতি জাগ্রত হয়, তাহাকে আলোক বলে।** আলোক ইথার* তরঙ্গের গতীয় শক্তি। ইহা অক্ষিপটের (retina) উপর আঘাত করে এবং অক্ষিপটের সহিত সংযুক্ত চক্ষুনার্ভ (optic nerve) উত্তেজিত করিয়া দর্শনের অনুভূতি জাগ্রত করে। বিজ্ঞানের ভাষায় কোন উত্তপ্ত পদার্থ হইতে বহির্গত দৃশ্য বিকীর্ণ শক্তি হইতেছে আলোক (Light is visible radiant energy)।

আলোক অদৃশ্য (Light is invisible) : সমস্ত শক্তির ন্যায় আলোক সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আমরা আলোক দেখি না ; আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত পদার্থ দেখি। ধূলিশূন্য ঘরের কোন ছোট ছিদ্র দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে দিলে রশ্মির পথ দেখা যায না। যদি ঘরে ধূলিকণা উড়াইয়া দেওয়া হয তবে ধূলিকণা হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকে আমরা ধূলিকণা দেখিতে পাই।

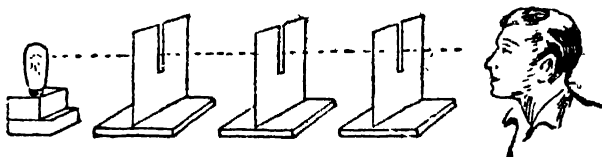
আলোকের উৎস (Sources of light) : সূর্য্য-তারকাদি জ্যোতিষ্ক, উত্তাপ, তড়িৎ ও রাসাযনিক ক্রিয়া হইতে আলোক উৎপন্ন হইযা থাকে। কতকগুলি পদার্থ (ফস্‌ফরাস, বেরিয়াম সালফাইড, ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফাইড) এবং কতকগুলি প্রাণী—জোনাকি পোকা, কযেক জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবাণু তাহাদের দেহ হইতে আলোক উৎপন্ন করে। এইগুলি **স্বপ্রভ আলোক উৎসের** (Luminous sources of light) উদাহরণ। আর একটি আলোকের উৎস আছে—ইহাদের **অপ্রভ আলোক উৎস** (Non-luminous sources of light) বলে। যে

* এই ইথার জল, স্থল, বাযুর মধ্যে, এমন কি মহাশূন্যের মধ্যেও, বিশ্বব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহা পূর্ণস্থিতিস্থাপক, ভারহীন ও ইন্দ্রিয়াতীত। ইথারের অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞানীদের একপ্রকার মানস-সৃষ্টি। ইথারকে মানিয়া লইলে বিকীর্ণ শক্তির অনেক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া যায়।

সকল বস্তু আলোক উৎপন্ন করে না কিন্তু অন্য সপ্রভ বস্তু হইতে পতিত আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া (diffused) আমাদের চক্ষুনার্ভকে (optic nerve) উত্তেজিত করে তাহাদিগকে অপ্রভ বস্তু বলে। উদাহরণস্বরূপ গ্রহ, চন্দ্র ও পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু।

আলোকের ঋজুরেখ গতি (Straight line propagation of light): আলোক যে স্থান ও পদার্থের ভিতর দিয়া গমন করে, তাহাকে উহার **মাধ্যম** (medium) বলা হয়। জল, বায়ু, কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ (যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া আলোক অবাধে চলিতে পারে উহাদিগকে স্বচ্ছ পদার্থ বলে) এবং রিক্ত (vacuous) স্থান আলোকের মাধ্যম। উজ্জ্বল পদার্থ হইতে আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়। যে মাধ্যমের রাসায়নিক গঠন (chemical composition) এবং ঘনত্ব (density) সর্ব্বত্র একরকম, তাহার ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি সরল রেখায় গমন করে। একরূপ মাধ্যম হইতে আলোক যখন অন্যরূপ মাধ্যমে প্রবেশ করে অথবা উহা যখন কোন স্বচ্ছ পদার্থের উপর পতিত হয়, তখন উহার গতিপথের পরিবর্ত্তন হয়। নূতন গতি পথটিও হয় সরল রেখা। বহুবিধ **পরীক্ষা** ও **ঘটনা** হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। নিম্নে দুইটি পরীক্ষা বিশদভাবে বর্ণিত হইল। প্রথমটির নাম **কার্ডবোর্ড পরীক্ষা** (Cardboard Experiment) ও দ্বিতীয়টিকে **সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা পরীক্ষা** (Pin-hole Camera Experiment) বলে। ছায়ার উৎপত্তি (origin of shadows) ও গ্রহণ (eclipses) এই নিয়মকে প্রমাণিত করে।

কার্ডবোর্ড পরীক্ষা (Cardboard Experiment): একটি আলোকের সম্মুখে টেবিলের উপর কয়েকখানি পাতলা তক্তা খাড়াভাবে বসাও। প্রত্যেক তক্তা খানিকটা করিয়া চেরা আছে। তক্তাগুলির বিপরীত দিকে চোখ রাখিয়া



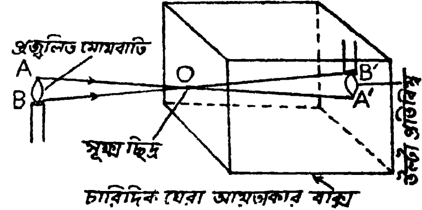
৩২নং চিত্র—আলোকের ঋজুরেখ গতি পরীক্ষা

দেখ, তক্তার ফাঁকগুলি যখন এক সরলরেখাবর্ত্তী, কেবল তখনই আলোক দেখা যাইতেছে। তক্তাগুলি একটু সরাইয়া দিলে উহাদের ফাঁকগুলি আর এক সরলরেখা

থাকে না ; তখন আলোক আর দেখা যায় না। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায় যে **আলোক সরল রেখায় গমন করে** (৩২নং চিত্র দেখ)।

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা পরীক্ষা (Pin-hole Camera Experiment) **:**

আলোকের ঋজুরেখ গতি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণের জন্য এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা একটি চারিদিক ঘেরা আয়তাকার বাক্স (rectangular box)। ইহার সম্মুখের দেওয়ালে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে (৩৩নং চিত্রে O বিন্দু) এবং পশ্চাতের দেওয়ালে ঘসাকাচ বা ফটোগ্রাফ্-প্লেট থাকে। বাক্সের ভিতরটি কালো রঙ করা। ইহাতে আলোকের প্রতিফলন হয় না। একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি যন্ত্রটির সম্মুখে রাখিলে আলোকশিখার একটী উল্টা প্রতিবিম্ব (inverted) ঘসাকাচের উপর বা ফটোগ্রাফিক প্লেটে উঠিবে। এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন উল্টা প্রতিবিম্ব প্রমাণ করে যে আলোক সরল রেখায় গমন করে। আলোকশিখার শীর্ষদেশীয় A বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে গমন করে এবং O সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া AO আলোকরশ্মি গমন করে এবং আলোকশিখার শীর্ষদেশীয় প্রতিবিম্ব A′ উৎপন্ন করে (৩৩নং চিত্র দেখ)। সেইরূপ আলোর শিখায় নিম্নদেশীয় B বিন্দু হইতে O সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া BO আলোকরশ্মি গমন করে এবং আলোকশিখার নিম্নদেশীয় প্রতিবিম্ব B′ (৩৩নং চিত্র দেখ) উৎপন্ন করে। আলোকশিখার প্রতিটী অংশ হইতে আলোকরশ্মি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া এইভাবে গমন করিয়া উল্টা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। আলোক সরল রেখায় গমন না করিলে মোমবাতি-আলোকশিখার উল্টা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন এই ক্ষেত্রে সম্ভব হইত না। সুতরাং এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে **আলোক সরল রেখায় গমন** করে।



৩৩নং চিত্র—আলোকের ঋজুরেখ গতি পরীক্ষা

সূচী-ছিদ্র ক্যামেরা সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি মনে রাখিবে :

(১) ছিদ্রের পরিসর বৃদ্ধি করিলে প্রতিবিম্বের কোন স্পষ্ট সীমারেখা পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হইবে। ইহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইল। একটি বড় ছিদ্রকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রের সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রতিটি

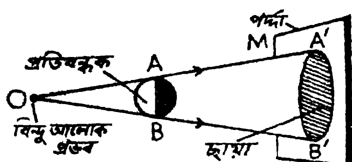
সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে উৎপন্ন স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পরস্পরের উপর পড়িয়া প্রতিবিম্বকে অস্পষ্ট করিয়া দেয়। সেই কারণে যন্ত্রটিতে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ব্যবস্থা আছে।

(২) পর্দাটি (৩৩নং চিত্রের ঘসাকাচ বা ফটোগ্রাফ্ প্লেট) যথাস্থানে রাখিয়া লক্ষ্যবস্তু সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে দূরে সরাইলে প্রতিবিম্বের আকার ছোট হইয়া যায়।

(৩) লক্ষ্যবস্তু যথাস্থানে রাখিয়া পর্দাটি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে দূরে সরাইলে প্রতিবিম্বের আকার বড় হয়।

ছায়া (Shadow): আলোক সরল রেখায় গমন করে বলিয়া আলোকের গতিপথে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ (যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়া আলোক চলিতে পারে না উহারা অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ পদার্থ) থাকিলে পদার্থটির পশ্চাতে খানিকটা স্থান হয় অন্ধকারময় (আলোক যদি বক্রপথে চলিতে পারিত তবে অস্বচ্ছ পদার্থটির পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত হইতে পারিত)। সেই অন্ধকারময় স্থানকে পদার্থের **ছায়া** (shadow) বলে। অসচ্ছ পদার্থটি আলোকের প্রতিবন্ধক। ছায়ার আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে আলোক উৎসের ও অস্বচ্ছ পদার্থের আপেক্ষিক আয়তনের উপর এবং প্রতিবন্ধক হইতে পর্দাটির দূরত্বের উপর। নিম্নে ইহার আলোচনা করা হইল:

(১) **বিন্দু আলোক প্রভব ও বিস্তৃত প্রতিবন্ধক** (Point source and an extended obstacle): আলোকের উৎস দীপশিখাটি আকারে যদি বিন্দুবৎ হয় এবং প্রতিবন্ধক আকারে বড় হয় তাহা হইলে বিপরীত দিকে পর্দায় যে ছায়া পড়ে তাহা সব সময় প্রতিবন্ধক অপেক্ষা বড় হয় এবং পর্দা যতদূরে সরান হয় ছায়ার আকার তত বাড়ে। এই ছায়ার সব স্থানেই সমান অন্ধকার দেখায়।

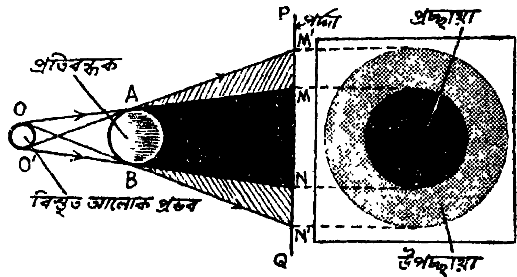


৩৪নং চিত্র—ছায়া

চিত্রে দেখ O একটি বিন্দু আলোক প্রভব, AB প্রতিবন্ধক ও M পর্দা। বিন্দু প্রভব O হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে গমন করে এবং যে রশ্মিগুলি AB প্রতিবন্ধকের ধার ঘেঁসিয়া গমন করে (যেমন OA, OB রশ্মি প্রভৃতি) তাহারা M পর্দায় গিয়া পড়ে। OA ও OB রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ আলোক শঙ্কু (cone of light) AB প্রতিবন্ধক দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় এবং পর্দায় A'B' ছায়া পড়ে। এই ছায়া OA' ও

OB' রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। লক্ষ্য করিয়া দেখ ছায়ার আকার প্রতিবন্ধক অপেক্ষা বড় এবং পর্দাটি দূরে সরাইলে ছায়ার আকার বাড়িবে।

(২) **বিস্তৃত আলোক প্রভব ও বৃহত্তর প্রতিবন্ধক** (Extended source and an obstacle larger in size than source) : আলোকের উৎস দীপশিখাটি যদি আকারে বড় হয় কিন্তু প্রতিবন্ধক অপেক্ষা ছোট হয় তাহা হইলে বিপরীত দিকে পর্দায় দুই প্রকার ছায়া পড়ে। মাঝের ছায়াটি ঘন কালো, উহা **প্রচ্ছায়া** (Umbra)। এখানে মোটেই কোন আলোক নাই। সেই প্রচ্ছাযার চারিদিকে আর একটি পাতলা ছায়া পড়ে। উহাকে বলে **উপচ্ছায়া** (Penumbra)। উপচ্ছাযার মধ্যে কিছু আলোক আসে বলিযা উহাকে পাতলা দেখায়। ৩৫ নং চিত্র দেখ OO' বিস্তৃত আলোক প্রভব, AB প্রতিবন্ধক ও PQ পর্দা। AB প্রতিবন্ধক OO' আলোক প্রভব অপেক্ষা বৃহত্তর। বিস্তৃত আলোক প্রভব OO'কে কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত আলোক বিন্দুর সমষ্টি ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য পর্দায় AB প্রতিবন্ধকের ছায়া পড়ে। O বিন্দুর জন্য ছাযা MN' অঞ্চল ব্যাপিযা পড়ে এবং O' বিন্দুর জন্য ছায়া M'N অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে MN অঞ্চল বিস্তৃত প্রভবের কোন অংশ হইতে আলোক পায় না। সেইজন্য এই অংশ সম্পূর্ণ গাঢ় অন্ধকারে থাকে। ইহাই **প্রচ্ছায়া** (Umbra)। M'M ও N'N অংশে বিস্তৃত প্রভব OO'এর কিছু অংশ হইতে আলোক পায়। এই অংশ দুইটি আংশিক অন্ধকারে থাকে। ইহাই উপচ্ছায়া (Penumbra)। M'N'ইর বাহিরে সমস্ত স্থানেই OO'ইর সকল বিন্দু হইতে আলোক পড়ে।

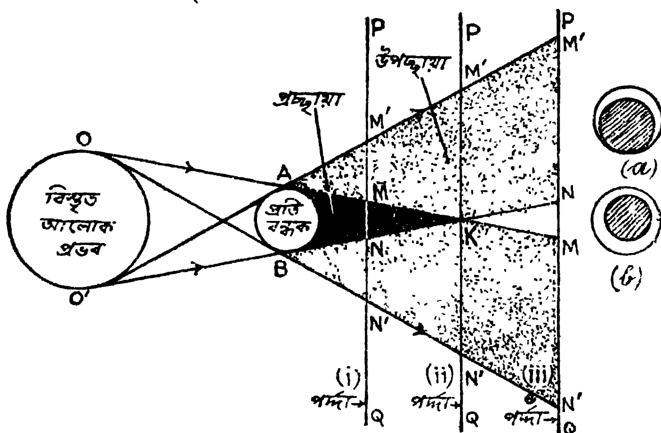


৩৫নং চিত্র—প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া

(৩) **বিস্তৃত আলোক প্রভব ও ক্ষুদ্রতর প্রতিবন্ধক** (Extended source and an obstacle smaller in size than the source) : আলোক উৎস বড় এবং প্রতিবন্ধক ছোট হইলে পর্দার উপর যে ছায়া পড়ে, তাহার বিস্তার

পর্দ্দার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পর্দ্দাখানা প্রতিবন্ধকের নিকটে থাকিলে প্রচ্ছায়ার আকার কিছু বড় থাকে। পর্দ্দাখানা যতই দূরে সরান যায়, প্রচ্ছায়াটি ততঃ ছোট হইতে থাকে এবং শেষে উহা একটি বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয়। পর্দ্দা আরও দূরে লইয়া গেলে প্রচ্ছায়া আর থাকে না। কিন্তু উপচ্ছায়ার আয়তন বাড়িতে থাকে। উপচ্ছায়ার আয়তন বাড়িতে থাকিলে উপচ্ছায়ার অন্ধকারের গাঢ়তা কমিতে থাকিবে। পর্দ্দাকে বহুদূরে লইয়া গেলে ছায়া এত পাতলা হইবে যে আলো ও ছায়ার পার্থক্য বোঝা যাইবে না। এইজন্য সূর্য্যালোকে খুব উচ্চে উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া ধরাতলরূপ পর্দ্দায় পড়ে না।

৩৬নং চিত্রে OO′ বিস্তৃত আলোক প্রভব, AB ক্ষুদ্রতর প্রতিবন্ধক ও PQ পর্দ্দা। বিস্তৃত আলোক প্রভব OO′কে কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত আলোক বিন্দুর সমষ্টি ধরা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য পর্দ্দায় AB প্রতিবন্ধকের ছায়া পড়ে। পূর্ব্বের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া উৎপন্ন



৩৬নং চিত্র—পর্দ্দার দূরত্বের উপর ছায়ার অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহার পরীক্ষা

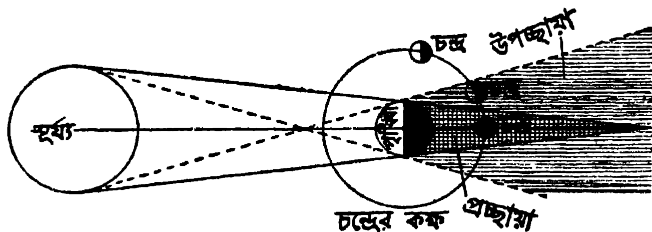
হয়। MN অংশ প্রচ্ছায়া এবং MM′ ও NN′ অংশ উপচ্ছায়া। পর্দ্দাখানি যদি ক্রমশঃ দূরে সরান যায় তবে প্রচ্ছায়া আয়তনে ক্রমশঃ কমিবে ও উপচ্ছায়া আয়তনে ক্রমশঃ বাড়িবে। পর্দ্দার দ্বিতীয় অবস্থানে প্রচ্ছায়া K বিন্দুতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সমস্ত ছায়াটি এখন উপচ্ছায়া। ABK অংশকে প্রচ্ছায়া শঙ্কু (umbral cone) বলে। পর্দ্দা আরও দূরে সরাইলে সমস্ত ছায়াটি উপচ্ছায়াই থাকিবে এবং

উহার আয়তন বাড়িবে। পর্দ্দার তৃতীয় অবস্থানে MN অংশ আলোক প্রভাব OO′ এর বাহিরের দিক হইতে আলোক পায় কিন্তু মধ্যভাগ হইতে আলোক পায় না। এই অংশে অবস্থিত কোন ব্যক্তি আলোক প্রভবের দিকে তাকাইলে AB বস্তুকে সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত দেখিবে ও ইহার চতুর্দ্দিকে একটি আলোকিত অংশ দেখিবে (৩৬নং চিত্রের '*b*' অংশ)। বলয়গ্রহণের সময় ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটে। পর্দ্দার তৃতীয় অবস্থানে M′N ও MN′ এর মধ্যবর্ত্তী যে কোন স্থান হইতে OO′ আলোক প্রভবের দিকে তাকাইলে উহাকে ৩৬নং চিত্রের '*a*' অংশের ন্যায় দেখা যাইবে। পর্দ্দা আরো দূরে সরাইলে উপচ্ছায়ার আয়তন বাড়িতে থাকে। উপচ্ছায়ার আয়তন বাড়িতে থাকিলে উপচ্ছাযার অন্ধকারের গাঢ়তা কমিতে থাকে। পর্দ্দাকে বহুদূরে লইয়া গেলে ছায়া এত পাতলা হয় যে আলো ও ছাযার পার্থক্য বোঝা যায় না। এই জন্য সূর্য্যালোকে খুব উচ্চে উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়া ধরাতলরূপ পর্দ্দায় পড়ে না।

গ্রহণ (Eclipses): গ্রহণ **আলোকরশ্মির সরলরেখায় গমনের** জন্য ছায়ার উৎপত্তির একটি প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত। সূর্য্য হইতে আলোকরশ্মি চন্দ্র ও পৃথিবীতে পড়ে। চন্দ্র ও পৃথিবী অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ পদার্থ ও উহারা সূর্য্যালোকের গতিরোধ করে। পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিভ্রমণ কালে সূর্য্যালোক গতিরোধকারী চন্দ্রের ছায়া যখন পৃথিবীর উপর পড়ে তখন হয় **সূর্য্যগ্রহণ** এবং সূর্য্যালোক গতিরোধকারী পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রের উপর পড়ে তখন হয় **চন্দ্রগ্রহণ**। নিম্নে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল।

চন্দ্রগ্রহণ (Lunar eclipse): পৃথিবী একটি অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ পদার্থ। উহা সূর্য্যালোকের গতিরোধ করে। তাহার ফলে সূর্য্যের বিপরীত দিকে উহার ছায়া পড়ে। চন্দ্র পৃথিবীকে পরিক্রম করিতেছে। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষতল ও পৃথিবীর কক্ষতল এক সমতলে নাই। ৫° ডিগ্রী কোণ করিয়া ঈষৎ হেলিয়া আছে এবং চন্দ্রের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলকে দুইটি পাতে ভেদ করিতেছে। পূর্ণিমার দিন পৃথিবীর এক দিকে সূর্য্য ও তাহার বিপরীত দিকে চন্দ্র থাকে। সেই সময় যদি চন্দ্র পাতে অথবা উহার খুব সন্নিকটে থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র প্রায় এক সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়। ইহার ফলেই চন্দ্রগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। প্রতি পূর্ণিমায় সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র প্রায় এক

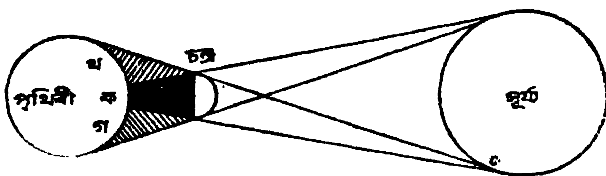
সরল রেখায় অবস্থান করে না বলিয়াই প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য আয়তনে অনেক বড়; সেইজন্য পৃথিবীর প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া দুইই হয়। যদি চন্দ্রের সমস্তটা পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার ভিতরে আসে, তাহা হইলে চন্দ্র



৩৭নং চিত্র—চন্দ্রগ্রহণ

একেবারেই ঢাকিয়া যায়। ইহাকে **পূর্ণগ্রাস** গ্রহণ বলে। কিন্তু যদি চন্দ্রের কোন অংশ এই প্রচ্ছায়ার ভিতরে পড়ে এবং বাকীটা তাহার বাহিরে থাকে, তাহা হইলে **আংশিক** বা **খণ্ডগ্রাস** গ্রহণ হইয়া থাকে। যে অংশটি প্রচ্ছায়ায় পড়ে, শুধু সেই অংশেই গ্রহণ হয়। চন্দ্রের সমগ্র অংশ যখন উপচ্ছায়ায় থাকে তখন কিন্তু কোন গ্রহণ হয় না, কেবল উহার উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়।

সূর্য্যগ্রহণ (Solar eclipse): অমাবস্যার দিন সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে থাকে অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয়। যদি সেই সময় চন্দ্র পাতে

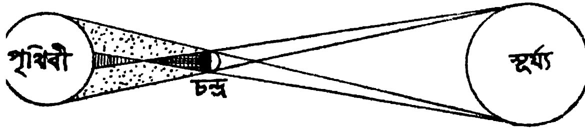


৩৮নং চিত্র—সূর্য্যগ্রহণ (পূর্ণ ও আংশিক)

অথবা উহার খুব সন্নিকটে থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখাবর্ত্তী হয় এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে ও সূর্য্যগ্রহণ হয়। প্রতি অমাবস্যায় এরূপ ঘটে না বলিয়াই প্রতি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় না। চন্দ্র অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ পদার্থ এবং সূর্য্য অপেক্ষা ছোট। কাজেই সূর্য্যের বিপরীত দিকে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া দুইই পড়ে (৩৮নং চিত্রে 'ক' স্থান প্রচ্ছায়ার মধ্যে ও 'খ' ও 'গ' স্থান উপচ্ছায়ার মধ্যে)। চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে স্থানে পড়ে সেখানকার লোক

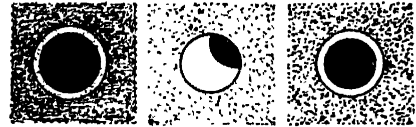
সূর্য্যকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ সেখান হইতে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ ঢাকা দেখা যায়; সেইজন্য সেখানে **পূর্ণাগ্রাস** সূর্য্যগ্রহণ হয়। যেখানে চন্দ্রের উপচ্ছায়া পড়ে সেখান হইতে সূর্য্যকে আংশিক ঢাকা দেখা যায়, ফলে সেখানে **আংশিক** বা **খণ্ডগ্রাস** সূর্য্যগ্রহণ হয়। পৃথিবীর **ক**-স্থানে (৩৮নং চিত্র দেখ) পূর্ণগ্রাস গ্রহণ এবং **খ** ও **গ**-স্থানে (৩৮নং চিত্র দেখ) খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখা যাইবে।

অপরপক্ষে এমন ব্যাপারও ঘটিতে পারে যে পৃথিবী নিজ উপবৃত্ত কক্ষে পরিক্রমের ফলে চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অপেক্ষা কম হইল। পূর্ণগ্রহণের



৩৯নং চিত্র—বলয়গ্রহণ

অনুকূল অবস্থা হইলেও প্রকৃতপক্ষে পূর্ণগ্রহণ না হইয়া **বলয়গ্রহণ** হইয়া থাকে। পৃথিবী দূরে অবস্থিত বলিয়া সূর্য্যপৃষ্ঠের সম্পূর্ণটা আবৃত না করিয়া পরিধির কিছুটা অংশ অনাবৃত রাখে। সুতরাং এই অবস্থায় একটা জ্যোতির্ম্ময় বলয় দৃষ্ট হয়। এই গ্রহণ সচরাচর দেখা যায় না; এই প্রকার বলয়গ্রহণ কিন্তু চন্দ্রের বেলায় সম্ভব নয় কারণ পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার বাহিরে চন্দ্র কোনরূপেই অবস্থান করিতে পারে না। উপরে তিন প্রকার গ্রহণের চিত্র দেওয়া হইয়াছে।



পূর্ণগ্রাস খণ্ডগ্রাস বলয়গ্রাস

৪০নং চিত্র—সূর্য্যগ্রহণের প্রকারভেদ

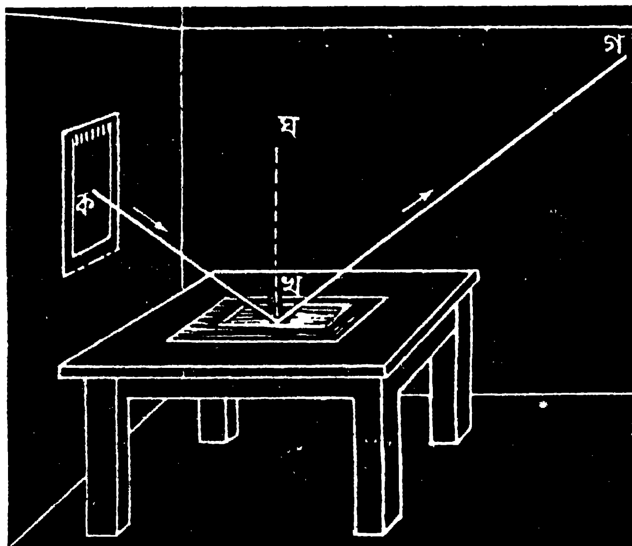
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য আছে। চন্দ্র যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। পৃথিবী বৃহত্তর; সুতরাং ইহাদের ছায়াও বড়। সেইজন্য সে সময়ে পৃথিবীর যে অঞ্চলে রাত্রি সে অঞ্চলের সকল স্থান হইতেই চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় পৃথিবীর উপরে যে ছায়া পড়ে, তাহা ছোট। কারণ চন্দ্র আয়তনে ছোট। সেইজন্য পৃথিবীর যে অঞ্চলটা সেই ছায়ার ভিতরে থাকে সেইখানেই সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়; তাহার বাহিরে দেখা যায় না।

সমতলে আলোকের প্রতিফলন

(Reflection of light at plane surfaces)

কোন স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলোক সরল রেখায় গমন করে ; যখন আলোক এক মাধ্যম হইতে কোন দ্বিতীয় মাধ্যমের তলে আপতিত হয় তখন এই তিনটি ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে পারে : (ক) আপতিত অলোকের কিয়দংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তল হইতে পুনরায় প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে বা **প্রতিফলিত** (reflected) হয় ; (খ) কিয়দংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের তলে **শোষিত** (absorbed) হয় ; (গ) দ্বিতীয় মাধ্যম যদি স্বচ্ছ হয় তবে কিয়দংশ দ্বিতীয় মাধ্যমের ভিতর দিয়া সরল রেখার ভিন্ন পথে চলিয়া যায় বা **প্রতিসৃত** (refracted) হয়।

সমতলে আলোকের প্রতিফলন (Reflection of light at plane surface): আলোকরশ্মি যখন কোন দর্পণের (mirror) উপর পতিত হয়



৪১নং চিত্র—আলোকরশ্মির প্রতিফলন পরীক্ষা

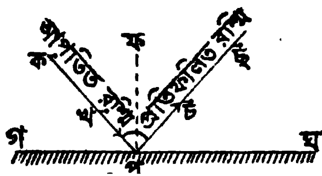
(যে কোন মসৃণ তলকে দর্পণ বলে যথা আয়না, পারদতল, চক্‌চকে ধাতব পাত্র ইত্যাদি) তখন উহার গতিপথের পরিবর্তন ঘটে। নূতন গতিপথটি হয় ঋজু।

ইহাকে আলোকের **প্রতিফলন** (reflection) বলে। যে রশ্মিটি উৎস হইতে আসিয়া মসৃণ পদার্থের উপর পড়ে, তাহাকে বলে **আপতিত রশ্মি** (incident ray ; ৪১নং চিত্রের কখ রেখা) এবং যে রশ্মিটি মসৃণ পদার্থের উপর হইতে অন্য পথে যায়, তাহাকে **প্রতিফলিত রশ্মি** (reflected ray ; ৪১নং চিত্রের খগ রেখা) বলে। যে পদার্থের পৃষ্ঠ হইতে আলোকের প্রতিফলন হয় তাহাকে **প্রতিফলক** (reflector) বলে। পারদ ও রৌপ্যের ন্যায় পালিশ করা ধাতু উৎকৃষ্ট প্রতিফলক। **আপতিত রশ্মির সমস্তটাই প্রতিফলিত হয় না,** উহার কতকটা প্রতিফলক শোষণ করিয়া থাকে। প্রতিফলককে আপতিত রশ্মি যেস্থানে স্পর্শ করে তাহাকে **পাতন বিন্দু** (point of incidence ; ৪১নং চিত্রের 'খ' বিন্দু) বলে। পাতন বিন্দু হইতে প্রতিফলকের উপর লম্বরেখাকে **অভিলম্ব** (normal ; ৪১নং চিত্রের খঘ রেখা) বলা হয়। আপতিত রশ্মি **কখ** এই অভিলম্বের সহিত যে কোণ ∠**কখঘ** (৪১নং চিত্র দেখ) করে, তাহাকে **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ঐ অভিলম্বের সহিত যে কোণ ∠**গখঘ** (৪১নং চিত্র দেখ) করে তাহাকে **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection) বলে।

প্রতিফলনের সূত্র বা **নিয়ম** (Laws of Reflection): প্রতিফলন দুইটি সূত্র বা নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় : (ক) **আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত সমান কোণ করে** অর্থাৎ **আপতন কোণ=প্রতিফলন কোণ**। (খ) **আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে।**

প্রতিফলন সূত্রের প্রমাণ (Verification of the Laws): প্রতিফলনের এই* দুইটি সূত্র নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। অনুভূমিক ড্রয়িং বোর্ডের (drawing board) উপর সাদা কাগজ আটা হইল। একটি গঘ সমতল পাতলা দর্পণ খাড়াভাবে লাগাইয়া দর্পণের গা ঘেঁসিয়া উহার অবস্থিতি নির্দেশ করিবার জন্য একটি সরল রেখা টানা হইল। এইবার দর্পণের সম্মুখে দুইটি পিন ক ও খ লম্বভাবে বোর্ডের উপর এইরূপ ভাবে লাগান হইল যে, কখ সংযোজক রেখা দর্পণ তল আনতভাবে স্পর্শ করে। এইবার দর্পণের মধ্য দিয়া ক ও খ পিনের দুইটি প্রতিফলন দেখা যাইবে। চক্ষু সরাইয়া দর্পণের মধ্য দিয়া

দেখিতে হইবে যতক্ষণ না দুইটি প্রতিফলন এক রেখায় অর্থাৎ ক এর প্রতিফলন খ-এর প্রতিফলনের ঠিক পশ্চাতে যায়। চক্ষুকে সেই অবস্থায় স্থির রাখিয়া অপর দুইটি পিন চ ও ছ লম্বভাবে বোর্ডে লাগান হইল যাহাতে উপরোক্ত দুইটি প্রতিফলন এবং চ ও ছ পিন একই সরল রেখায় দেখা যায়। পিনগুলির অবস্থান চিহ্নিত করা হইল ও দর্পণ সরাইয়া লওয়া হইল। কখ ও চছ সরলরেখা আঁকিয়া বর্দ্ধিত করিলে উহারা গঘ-এর উপর 'প' বিন্দুতে মিলিত হইবে। প বিন্দুতে পফ অভিলম্ব অঙ্কিত করা হইল। কখপ আপতিত রশ্মি, পচছ প্রতিফলিত রশ্মি প্রকাশ করে। সুতরাং ∠কপফ আপতন কোণ ও ∠ফপছ প্রতিফলন কোণ। এই দুই কোণ মাপিলে সমান দেখা যাইবে। ইহা হইতে প্রথম সূত্র বা নিয়ম প্রমাণিত হইল।



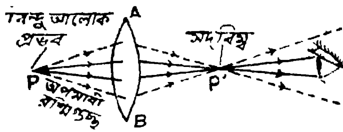
৪২নং চিত্র—প্রতিফলন সূত্রের পরীক্ষা

কখপ, পচছ ও পফ রেখাত্রয় যথাক্রমে আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব প্রকাশ করে। উহারা কাগজের তলে অবস্থিত। ইহা দ্বিতীয় সূত্র বা নিয়ম প্রমাণিত করিল।

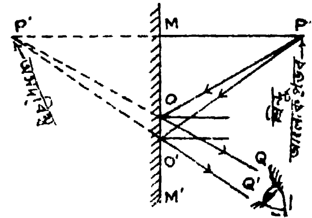
আলোকীয় প্রতিবিম্ব (Optical Image): আলোকরশ্মি যখন কোন বস্তু (বস্তুটি সপ্রভ বা অপ্রভ যাহাই হউক না কেন) হইতে বাহির হইয়া বরাবর ঋজুপথে আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে, তখন বস্তুটি ঠিক যেস্থানে আছে আমরা উহাকে ঠিক সেই স্থানেই দেখিতে পাই। কিন্তু যদি আলোকরশ্মি প্রতিফলন বা প্রতিসরণের জন্য বাঁকিয়া আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে তাহা হইলে বস্তুটি তাহার স্বকীয় স্থানে না থাকিয়া অন্যত্র আছে বলিয়া মনে হয়। চক্ষুতে যে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে তাহা পিছন দিকে বর্দ্ধিত করিলে রেখাগুলি যে বিন্দুতে ছেদ করে বস্তুটি সেখানে আছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে স্বকীয় স্থানেই থাকে। নূতন অবস্থানে আমরা যাহা দেখি তাহা উহার প্রতিবিম্ব (Image)। সুতরাং আমরা বলিতে পারি **কোন বিন্দু আলোক প্রভব** (Point Source) **হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ যখন প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়** (appears to diverge) **তখন এই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দু আলোক**

প্রভবের প্রতিবিম্ব বলা হয়। প্রতিবিম্ব দুই প্রকার : **সদ্‌বিম্ব** (Real Image) ও **অসদ্‌বিম্ব** (Virtual Image)।

সদ্‌বিম্ব (Real Image) : যখন কোন বিন্দু আলোক প্রভব (point source) হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ (divergent rays) কোন বস্তুতে প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর প্রকৃতই কোন দ্বিতীয় বিন্দুতে মিলিত হয় (actually converges to a second point) তখন প্রতিবিম্বকে **সদ্‌বিম্ব** বলে। অবতল দর্পণে Concave mirror) ও উত্তল লেন্সে (Convex lens) সদ্‌বিম্ব উৎপন্ন হয়। পরে ইহা আমরা আলোচনা করিব। ৪৩নং চিত্রে P বিন্দু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ AB উত্তল লেন্সে প্রতিসরিত হইয়া P′ বিন্দুতে মিলিত হইতেছে। P′ হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ চোখে প্রবেশ করে। P′ P বিন্দুর সদ্‌বিম্ব। P′ বিন্দুতে কোন পর্দা রাখিলে পর্দার উপর P বিন্দুর প্রতিবিম্ব পড়িবে। লেন্সের খুব কাছে চোখ রাখিলে এই প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে না।



৪৩নং চিত্র—সদ্‌বিম্ব



৪৪নং চিত্র—অসদ্‌বিম্ব

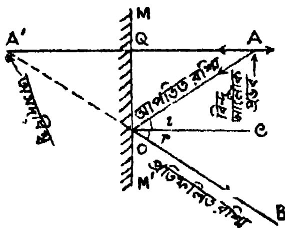
অসদ্‌বিম্ব (Virtual Image) : যখন কোন বিন্দু আলোক প্রভব (point source) হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ কোন বস্তুতে প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর রশ্মিগুলি অন্য এক দ্বিতীয় বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় (appears to diverge from a second point) তখন প্রতিবিম্বকে **অসদ্‌বিম্ব** বলে। সমতল দর্পণে (Plane mirror), উত্তল দর্পণে (Convex mirror) ও অবতল লেন্সে (Concave lens) সর্ব্বদাই অসদ্‌বিম্ব উৎপন্ন হয়। অবতল দর্পণে (Concave mirror) ও উত্তল লেন্সে (Convex lens) ফোকাসের মধ্যে বস্তু

[**Note :** সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার যে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় তাহা আলোকীয় প্রতিবিম্ব (Optical image) নহে। ইহার কারণ এইগুলি : (ক) ইহাতে রশ্মি ভিন্ন পথে যায় না ; (খ) রশ্মির প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয় না ; (গ) রশ্মিগুলি পর্দায় মিশে না।]

থাকিলে অসদ্‌বিম্ব উৎপন্ন হয়। পরে ইহা আমরা আলোচনা করিব। ৪৪নং চিত্রের P বিন্দু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ MM′ সমতল দর্পণে প্রতিফলনের পর যখন দর্শকের চোখে পৌঁছায় তখন তাহারা আপাতদৃষ্টিতে P′ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং P′ বিন্দু P বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব। P′ বিন্দুর স্থলে কোন পর্দা রাখিলে প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে না। অসদ্‌বিম্বকে কেবলমাত্র চোখে দেখা যায়।

সদ্‌ ও অসদ্‌ বিম্বের পার্থক্য (Differences between the real and virtual image) : সদ্‌বিম্ব রশ্মিগুচ্ছের প্রকৃত মিলনে উৎপন্ন হয়। পর্দায় এই প্রতিবিম্ব ফেলা যায়। ইহা আসল বস্তুর উল্টা (inverted) আকৃতির হয়। অসদ্‌বিম্ব কাল্পনিক রশ্মিগুচ্ছের মিলনে উৎপন্ন হয়। ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই ও পর্দায় এই প্রতিবিম্ব ফেলা যায় না। ইহা আসল বস্তুর ন্যায় সোজা (erect) হয়।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব (Image by a plane mirror) : পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমতল দর্পণে অসদ্‌বিম্ব উৎপন্ন হয়। MM′ একটি সমতল দর্পণ ও A উহার সম্মুখে অবস্থিত একটি বিন্দু আলোক প্রভব (point source)। A হইতে AQ রশ্মি দর্পণে অভিলম্বরূপে আপতিত হইয়া QA পথে প্রতিফলিত হয় (অভিলম্বরূপে আপতিত রশ্মি ঐ পথেই প্রতিফলিত হয়)। A হইতে AO রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া OB পথে গমন করে। OC যদি অভিলম্ব হয় তবে ∠AOC = ∠COB।



৪৫নং চিত্র—সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

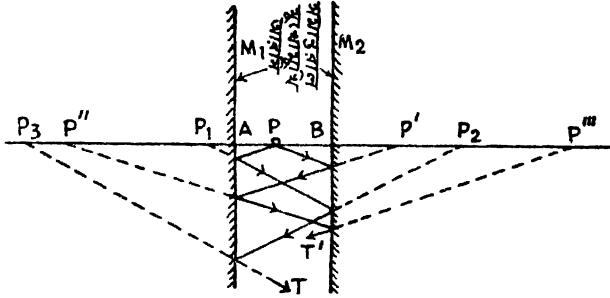
OA ও OB রশ্মি পিছনে বর্দ্ধিত করিলে A′ বিন্দুতে মিলিত হয়। অর্থাৎ দর্শকের কাছে প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় A′ বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। সুতবাং A′ বিন্দু A বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব। ∠AOC = ∠OAQ (ইহারা একান্তর বা alternate কোণ ; QA এবং OC সমান্তরাল এবং AO তাহাদের ছেদ করে)। আবার ∠BOC = ∠OA′Q (বহিঃস্থ বা exterior কোণ অন্তঃস্থ বা interior কোণের সমান ; AA′ ও OC সমান্তরাল এবং A′B তাহাদের ছেদ করে)। এখন Δ˚OAQ এবং OA′Q সর্ব্বতোভাবে সমান কারণ

∠OAQ = OA′Q (∵ ∠AOC = ∠BOC)

∠OQA = ∠OQA′ (প্রতিটি সমকোণ) এবং OQ সাধারণ বাহু।

সুতরাং QA = QA অর্থাৎ A বিন্দুর প্রতিবিম্ব দর্পণের পিছনে সমান দূরে অবস্থিত। **সমতল দর্পণে বস্তুর যে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহা হয় অসদ্ এবং প্রতিবিম্বটি দর্পণের পিছনে সমান দূরে অবস্থিত থাকে।**

আলোকের একাধিক প্রতিফলন (Multiple reflection) **:** একই রশ্মিকে একাধিক দর্পণের সাহায্যে বার বার প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। তাহার ফলে একই পদার্থের একাধিক প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। একটা প্রজ্বলিত বাতির

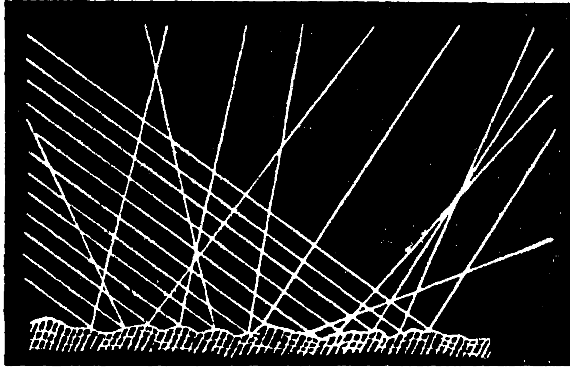


৪৬নং চিত্র—আলোকের একাধিক প্রতিফলন

দুইপাশে দুইখানা আরসি **মুখোমুখি ও সমান্তরালভাবে** রাখিয়া দেখ, উভয় আরসির পশ্চাতে রাজপথের আলোকমালার ন্যায় সারি সারি আলো জ্বলিতেছে। আরসি দুইখানা মিলাইয়া কোণ করিয়া রাখিলে অনেকগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

বিক্ষিপ্ত আলোক (Diffused light) **:** আরসির ন্যায় মসৃণপৃষ্ঠ প্রতিফলক হইতে আলোকরশ্মি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রতিফলিত হইয়া প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রতিফলকের পৃষ্ঠ যদি মসৃণ না হয়, অর্থাৎ যদি উহা উঁচু-নীচু হয় তাহা হইলে আপতিত রশ্মি উহার উপর হইতে এলোমেলোভাবে নানাদিকে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এরূপভাবে প্রতিফলিত আলোককে **বিক্ষিপ্ত আলোক** (Diffused light) বলে। ইহা দ্বারা প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিফলকটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে সূর্য্যরশ্মি সরাসরিভাবে পড়িতে পারে না, সেখানে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া থাকে। তাহা দ্বারা তোমরা ঘরের ভিতরে চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য জিনিসপত্রগুলিকে দেখিতে পাও (৪৭নং চিত্র)। ঘরের মেঝে যদি পালিশ

করা থাকে, তাহা হইলে উহার উপর গেলাস, বাটি বা কোন জিনিস রাখিলে নীচে তাহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু মেঝে পালিস করা না হইলে প্রতিবিম্ব দেখা



৪৭নং চিত্র—বিক্ষিপ্ত আলোক

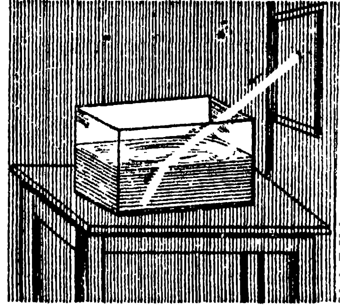
যায় না। কাঠ, কাগজ প্রভৃতি পৃষ্ঠ অমসৃণ। উহা হইতে বিক্ষিপ্ত রশ্মির সাহায্যে আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই, কিন্তু কোন প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় না।

সমতলে আলোকের প্রতিসরণ

(Refraction of light at plane surfaces)

কোন স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি সরলরেখায় গমন করে। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি বক্রভাবে এক স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং মাধ্যম দুইটার ঘনত্ব (density) সমান না হয় তাহা হইলে আলোক-রশ্মিটি যেখানে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশ করিতেছে, সেখান হইতে একটু বাঁকিয়া যায় অর্থাৎ দিক পবিবর্ত্তন করিয়া সরলরেখায় গমন করে। ইহাকে আলোকের **প্রতিসরণ** (refraction) বলে। প্রথম মাধ্যমে অলোকরশ্মির পথকে **আপতিত রশ্মি** (incident ray) বলে। আপতিত রশ্মি যে বিন্দুতে দ্বিতীয় মাধ্যমের উপর পড়ে তাহার নাম **পাতন বিন্দু** (point of incidence)। দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোকরশ্মির পথকে **প্রতিসরিত রশ্মি** (refracted ray) বলে। পাতন বিন্দু হইতে দ্বিতীয় মাধ্যমের পৃষ্ঠদেশের উপর লম্ব টানিলে **অভিলম্ব** (normal)

পাওয়া যায়। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, উহার নাম **আপতন কোণ** (angle of incidence) এবং প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, উহার নাম **প্রতিসরণ কোণ** (angle of refraction)। আলোকরশ্মি যখন লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন উহা অভিলম্বের দিকে হেলিয়া থাকে। কিন্তু যখন উহা ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমের মধ্যে যায়, তখন উহা অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিবে। বাতাসের ঘনত্ব জল অপেক্ষা কম। আলোকরশ্মি যখন বাতাস হইতে জলে প্রবেশ করে, তখন উহা অভিলম্বের দিকে হেলিয়া যায় (৪৮নং চিত্র দেখ)। কিন্তু জলের ভিতর হইতে আলোকরশ্মি যখন বাতাসের মধ্যে আসে, তখন উহা অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিয়া থাকে (৪৮নং চিত্র দেখ)। কিন্তু আপতিত রশ্মি যদি অভিলম্বকে আশ্রয় করিয়া খাড়াভাবে এক মাধ্যম হইতে অপর মাধ্যমে প্রবেশ করে তবে রশ্মিটির গতিপথ আদৌ পরিবর্তন হইবে না।

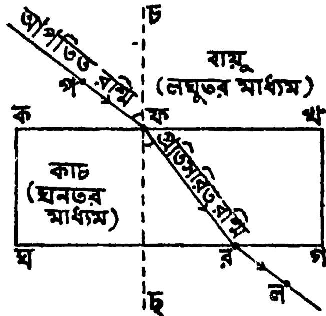


৪৮নং চিত্র—আলোকরশ্মির প্রতিসরণ পরীক্ষা

প্রতিসরণের সূত্র বা **নিয়ম** (Laws of Refraction): দুইটি বিশিষ্ট সূত্র বা নিয়মকে আশ্রয় করিয়া আলোকের প্রতিসরণ ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে : (ক) **প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের ঘনত্ব অনুসারে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা লঘুতর মাধ্যমে বড় এবং ঘনতর মাধ্যমে ছোট হয়;** (খ) **আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং অভিলম্ব সর্ব্বদাই এক সমতলে থাকে।**

প্রতিসরণ সূত্রের প্রমাণ (Verification of Laws): প্রতিসরণের এই দুইটি সূত্র নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। অনুভূমিক ড্রয়িং বোর্ডের (drawing board) উপর সাদা কাগজ আঁটা হইল। কাচের একখানা আয়তাকার ফলক (rectangular slab) কখগঘ বোর্ডের উপর রাখিয়া উহার অবস্থান নির্দেশ করার জন্য কখ ও গঘ রেখা আঁকা হইল (৪৯নং চিত্র দেখ)। কখ

পৃষ্ঠের গা ঘেঁসিয়া একটি পিন ফ লম্বভাবে পোতা হইল এবং একই দিকে একটু দূরে প পিন এরূপভাবে পোতা হইল যে পফ সরল রেখা তির্য্যকভাব কখ তলে ফ বিন্দুতে মিশে। কাচফলকের অপর পার্শ্বে গঘ হইতে কাচফলকের মধ্য দিয়া প ও ফ পিনকে তির্য্যকভাবে দেখিয়া কাচফলকের গঘ পৃষ্ঠের গা ঘেঁসিয়া একটি পিন র এবং একটু দূরে ল পিন এমনভাবে পোতা হইল যাহাতে প, ফ, র, ল পিনগুলি এক সরল রেখায় মনে হয়। ফলক ও পিনগুলি এইবার সরাইয়া পিনের ছিদ্রগুলি পফ, ফর, রল রেখা দ্বারা যুক্ত করা হইল। ফ বিন্দুতে ফচছ অভিলম্ব টানা হইল। পফ আপতিত রশ্মি, ফর প্রতিসরিত রশ্মি, ∠পফচ আপতন কোণ ও ∠ছফর প্রতিসরণ কোণ। এই দুইটি কোণ মাপিলে দেখা যাইবে আপতন কোণ ∠পফচ প্রতিসরণ কোণ ∠ছফর অপেক্ষা বড়। বায়ু লঘুতর মাধ্যম ও কাচ ঘনতর মাধ্যম। প্রতিসরণের প্রথম স্বত্রানুযায়ী প্রতিসরণ কোণ ঘনতর মাধ্যমে আপতন কোণ অপেক্ষা ছোট হয়। আমাদের পরীক্ষা হইতে ইহাই পাওয়া গিয়াছে। অতএব প্রথম সূত্র বা নিয়ম প্রমাণিত হইল। পফ, ফর ও চফছ রেখাত্রয় যথাক্রমে আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি ও অভিলম্ব প্রকাশ করে। উহারা কাগজের তলে অবস্থিত। ইহা দ্বিতীয় স্বত্র বা নিয়ম প্রমাণিত করিল।

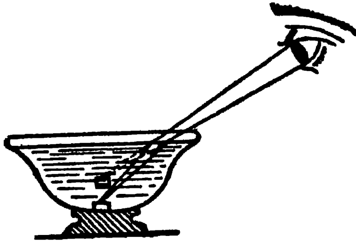


৪৯নং চিত্র—প্রতিসরণ সূত্রের পরীক্ষা

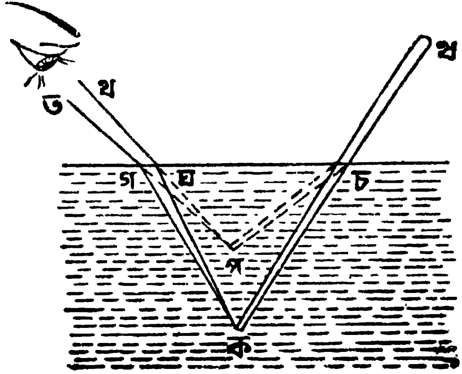
প্রতিসরণের কতকগুলি সাধারণ দৃষ্টান্ত (Familiar illustrations of refraction): আলোকরশ্মির প্রতিসরণের ফলে অনেক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার দেখা যায়। তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটি আলোচনা করিব।

(১) পিতলের বাটির মধ্যে একটা টাকা রাখিয়া দাও। একখানা টুলের উপর বাটিটিকে এরূপভাবে রাখ, যেন বাটির কিনারা দ্বারা টাকাটির দৃশ্য প্রতিহত হয়। এখন যদি কেহ ঐ বাটির মধ্যে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথমে টাকাটির কিনারা, তারপর উহার অর্দ্ধেক এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার সমস্তটাই তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু টাকাটি বাটির ঠিক যে স্থানে আছে, তাহার কিছু উপরে উহাকে দেখা যাইবে। প্রতিস্থত রশ্মির বক্রতাহেতু এইরূপ হইয়া থাকে (৫০নং চিত্র দেখ)।

(২) একখানা লাঠির খানিকটা জলে বাঁকাভাবে ডুবাইয়া ধরিলে দেখা যায়, যেখানে উহা জলে প্রবেশ করিতেছে সেই স্থান হইতে উহার নিমজ্জিত অংশটুকু যেন উপরদিকে বাঁকিয়া রহিয়াছে (৫১নং চিত্র দেখ)। চিত্রে **'কখ'** লাঠি **'চ'** বিন্দুতে জলের মধ্যে প্রবেশ করিযাছে। **'ক'** বিন্দু হইতে আপতিত রশ্মি **'কগ'** ও **'কঘ'** জলপৃষ্ঠে প্রতিসৃত হইয়া **'গত'** ও **'ঘথ'** পথে বাহির হইতেছে। কাজেই **'তথ'** স্থানে চক্ষু রাখিয়া দেখিলে, **'ক'** বিন্দুকে

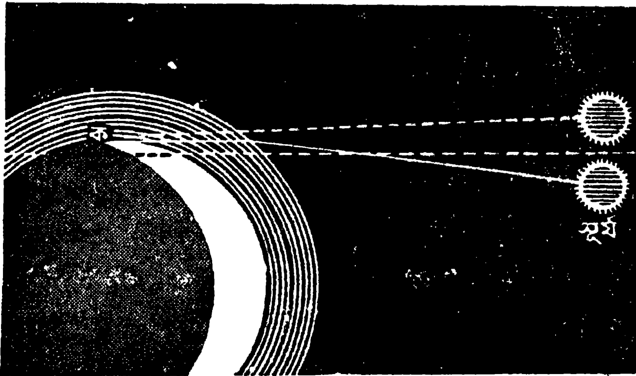


৫০নং চিত্র—প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত



৫১নং চিত্র—প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত

'তগ' ও **'থঘ'** এর সংযোগ স্থান **'প'** বিন্দুতে দেখা যাইবে। সেইজন্য লাঠিটির **'কচ'** অংশ **'পচ'** এর ন্যায় দেখায়। কাজেই লাঠিটি বাঁকিয়া আছে মনে হয়।



৫২নং চিত্র—প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত

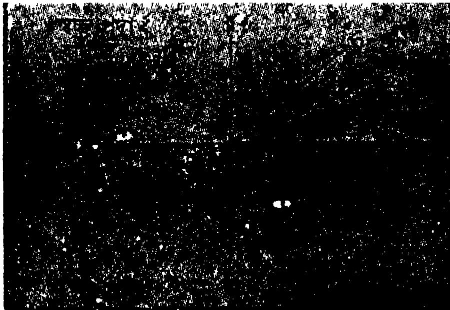
(৩) ঊর্দ্ধস্তরের চাপ বশতঃ বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তর ঊর্দ্ধস্তর অপেক্ষা ঘনতর। সেইজন্য উদয়ের কিছু আগে এবং অস্তের কিছু পরে সূর্য্য যখন দিগন্ত রেখার নীচে

থাকে, তখনও আমরা উহাকে দেখিতে পাই। ইহার কারণ সূর্য্যরশ্মি বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট বায়ুস্তর ভেদ করিবার সময় প্রতিসৃত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রতিসৃত রশ্মির সাহায্যে আমরা সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাকি (৫২নং চিত্র দেখ)।

তারার ঝিকিমিকি (Twinkling of stars): কোন উত্তপ্ত বস্তুর উপরকার বায়ুর ঘনত্ব অনবরত পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য এইরূপ বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়া দূরে অবস্থিত কোন বস্তুকে দেখিলে বস্তুটিকে কম্পমান মনে হয়।

নানাবিধ কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও সাথে সাথে ইহার ঘনত্ব পরিবর্ত্তিত হয়। সেইজন্য জ্যোতিষ্ক হইতে আগত আলোকরশ্মির পথ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এই কারণে বহু দূরবাসী নক্ষত্র হইতে আগত রশ্মির দীপনমাত্রা (intensity of illumination) ক্ষণে ক্ষণে হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কোন দর্শকের চক্ষে নক্ষত্রকে একবার বেশী উজ্জ্বল একবার কম উজ্জ্বল প্রতীয়মান হয়। ইহাকে তারার ঝিকিমিকি (twinkling of stars) বলে। গ্রহগুলি পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বলিয়া উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি এইভাবে ঘটে না।

সঙ্কট কোণ ও সম্পূর্ণ প্রতিফলন (Critical angle and Total reflection): পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করিলে উহা অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিবে।



৫৩নং চিত্র—সম্পূর্ণ প্রতিফলনের পরীক্ষা

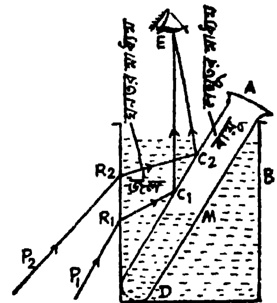
৫৩নং চিত্রে কাচের মধ্য দিয়া বায়ুতে আসার সময় '**কপ**', '**খপ**' ও '**গপ**' রশ্মি যথাক্রমে '**পচ**' '**পছ**' '**পফ**' রেখায় প্রতিসরিত হইয়াছে। দেখ, আপতন কোণ (∠**কপল**, ∠**খপল**, ∠**গপল**) যতই বড় হইতেছে, প্রতিসরণ কোণও (∠**বপচ**, ∠**বপছ**, ∠**বপফ**) সেই অনুপাতে অনেক বেশী বড় হইতেছে। লক্ষ্য কর, আপতন কোণ যখন ∠**গপল**, তখন প্রতিসরিত কোণের বৃদ্ধির জন্য প্রতিসরিত রশ্মি '**পফ**' দুই মাধ্যমের মিলনস্থল ঘেঁসিয়া যাইতেছে। আপতন কোণকে বর্দ্ধিত করিয়া এমন একটি স্থানে

আনা যায় যখন প্রতিসরিত রশ্মি বায়ুতে বাহির হইবার সময় কাচ-ফলকের উপর দিয়া চলিয়া যায় অর্থাৎ প্রতিসরিত কোণ তখন ৯০° ডিগ্রী। ঐরূপ আপতন কোণকে **সঙ্কট কোণ** (critical angle) বলা হয়। সুতরাং দেখা গেল যে, **আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময় পাতন বিন্দুতে লম্বের সহিত যে আপতন কোণ সৃষ্টি করিলে প্রতিসরিত রশ্মি লম্বের সহিত সমকোণ সৃষ্টি করে, সেই আপতন কোনকে সঙ্কট কোণ** (critical angle) বলা হয়।

আপতন কোণ ইহার অধিক হইলে আর প্রতিসরণ হয় না, তখন আলোকরশ্মির সম্পূর্ণ প্রতিফলন (total reflection) হয়। চিত্রে **'টপ'** রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া **'পঠ'**র দিকে যাইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, **যদি কোন আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমের পৃষ্ঠদেশে এমনভাবে আপতিত হয় যে আপতন কোণ সঙ্কট কোণ অপেক্ষা বড়, তখন আলোকরশ্মি প্রতিসরিত না হইয়া ঘনতর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয় এবং ইহাকে সম্পূর্ণ প্রতিফলন** (total reflection) বলে।

সম্পূর্ণ প্রতিফলনের কতকগুলি সাধারণ দৃষ্টান্ত (Familiar illustrations of total reflection): আলোকরশ্মির সপূর্ণ প্রতিফলনের জন্য নানারূপ ব্যাপার দেখা যায়। তাহার মধ্যে আমরা কয়েকটি আলোচনা করিব।

(১) একটি পরীক্ষ-নলের (test tube) কিছু অংশ জলে ভরিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে কাত করিয়া রাখা হইল। উপর হইতে পরীক্ষ-নলটিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে পরাক্ষ-নলের জলশূন্য অংশ রূপার ন্যায় চক্‌চক্‌ করিতেছে, কিন্তু নিম্নাংশে সেইরূপ কিছু ঘটিতেছে না। পরীক্ষ-নলের উপরের অংশে আলোকরশ্মি R_1C_1, R_2C_2 ইত্যাদি পাত্রের ঘনতর মাধ্যম জল হইতে পরীক্ষ-নলের মধ্যস্থ লঘুতর মাধ্যম বায়ুর স্পর্শতলে সঙ্কট কোণের বেশী কোণে আপতিত হইয়া জলেই পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া C_1E, C_2E ইত্যাদি পথে চোখে পড়ে। সেই কারণে ঐ অংশকে অত উজ্জ্বল দেখায়। পরীক্ষ-



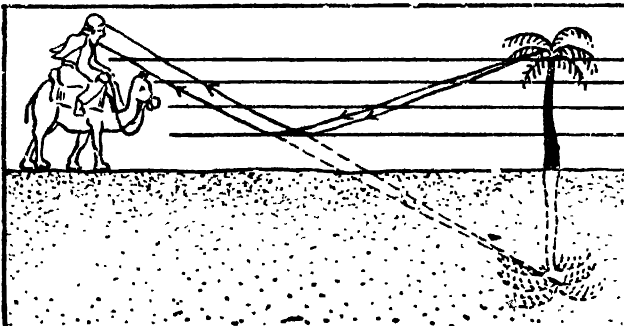
৫৪নং চিত্র—সম্পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত

নলের নীচের অংশে আলোকরশ্মি জল হইতে কাচের মধ্য দিয়া জলেই প্রতিসৃত হয়, সম্পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভব হয় না। সেই কারণে নীচের অংশ অত উজ্জ্বল দেখায় না।

(২) জলপূর্ণ কাচের গ্লাস চোখের উপর আস্তে আস্তে তুলিতে থাকিলে এক সময়ে দেখা যাইবে যে জলের উপরের পৃষ্ঠ চক্‌চক্‌ করিতেছে। জলের উপরিভাগে পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য এইরূপ ঘটে।

(৩) একটি ভুষোকালি মাখান লোহার বলকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইল। বলের উপরতল কালি মাখান হইলেও উজ্জ্বল দেখাইবে। ইহার কারণ বলের উপরিভাগ ও জলের মধ্যে বায়ুর একটি পাতলা স্তর থাকে। জল হইতে বায়ুতে আলোকরশ্মির পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য বলটিকে উজ্জ্বল দেখায়।

(৪) **মরীচিকা** (Mirage): মরীচিকা পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত। বিস্তৃত খুব উষ্ণ অঞ্চলে যেমন মরুভূমি অথবা খুব শীতল অঞ্চলে দূরের কোন বস্তু যে **দৃষ্টি-বিভ্রম** (optical illusion) সৃষ্টি করে যাহার ফলে বস্তুর একটি উল্টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহাকে **মরীচিকা** (mirage) বলে। উষ্ণ অঞ্চলের মরীচিকা নিম্নে বিবৃত করা হইল।



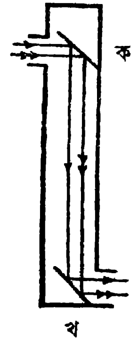
৫৫নং চিত্র—সম্পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত

মরুভূমির বালুময় ভূমি সূর্য্যতাপে দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। উহার সংস্পর্শে যে বায়ুস্তর থাকে তাহাও উত্তপ্ত হইয়া লঘু হয় ও উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু মরুভূমিতে যে কোনও মুহূর্ত্তে গড়ে উপরের বায়ুস্তর অপেক্ষা নীচের বায়ুস্তরগুলি হাল্‌কা থাকে। মরুভূমি হইতে দূরে কোথাও কোন গাছপালা হইতে আলোকরশ্মি তির্য্যক্‌-ভাবে নীচের দিকে আসিতে থাকিলে, তাহা অভিলম্ব হইতে দূরের দিকে হেলিয়া

এক স্তর হইতে অন্য স্তরে চলিতে থাকে। ফলে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে আসিবার সময় আপতন কোণ ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে ও শেষে নীচের কোনও এক স্তরে আসিয়া ঐ বিশেষ স্তরের সঙ্কট কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণে আপতিত হয় ও সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। এই প্রতিফলিত রশ্মি আবার হাল্‌কা বায়ু হইতে ঘন বায়ুর মধ্যে কয়েকবার প্রতিসরিত হইয়া যখন কোন পথিকের চোখে পড়ে, তখন পথিক শেষ যে রেখায় আলোক তাঁহার চোখে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রেখার বর্দ্ধিত অংশে গাছের একটা প্রতিবিম্ব নীচের দিকে দেখিতে পায়। বায়ুস্তরগুলির ঘনত্বের ক্রমাগত পরিবর্ত্তনহেতু গাছ বা বস্তুটির একই স্থান হইতে আলোক আসিয়া সর্ব্বদা পথিকের চক্ষের দিকে প্রতিফলিত হয় না। সেইজন্য পথিক প্রতিবিম্বটি স্থির দেখে না—সর্ব্বক্ষণই কাঁপিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই পথিক উহাকে কোন জলাশয়ে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বলিয়া ধারণা করে। জলের আশায় ঐ দিকে পথিক অগ্রসর হয়। ফলে ঐ গাছ হইতে আগত রশ্মি আর পথিককের চোখে পৌঁছায় না; দূরে অন্য কোন স্থানে অবস্থিত কোন গাছ হইতে পূর্ণ প্রতিফলিত রশ্মি চোখে পৌঁছায়। পথিক অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে কাল্পনিক জলাশয়ও দূরে দূরে সরিয়া যায়। পথিকের জল আর মেলে না।

সমুদ্র হইতে নাবিকেরা সময় সময় আকাশের গায়ে সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের প্রতি-বিম্ব দেখিয়া থাকে। ইহাও আলোকরশ্মির প্রতিসরণ ও সম্পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য ঘটিয়া থাকে।

পেরিস্কোপ (Periscope): সম্মুখের বাধা অতিক্রম করিয়া কোন জিনিস দেখিতে হইলে **পেরিস্কোপ** নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। উহার মধ্যে দুইটি দর্পণ সমান্তরালভাবে অবস্থিত থাকে; ভূমিতলের সহিত দর্পণ দুইটি ৪৫° কোণ করিয়া একটি উপরে (চিত্রের 'ক' স্থানে) এবং আর একটি নীচে (চিত্রের 'খ' স্থানে) বসান থাকে। সম্মুখের বাধার অপর দিক হইতে আগত আলোকরশ্মি উপরের দর্পণে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া নীচের দর্পণে আসিয়া পড়ে। ফলে আবার নীচের দর্পণে ঐ আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়। ইহাতে দর্পণে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।



৫৬নং চিত্র—পেরিস্কোপ

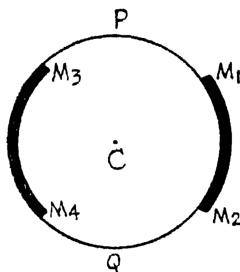
ফুটবল খেলার মাঠে খুব ভিড়ে পিছন হইতে খেলা দেখিবার জন্য এই যন্ত্র অত্যন্ত

ব্যবহৃত হয়। ডুবোজাহাজে (submarine) এই পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের ভিতর থাকিয়াও বাহিরের অবস্থা দেখা যায়।

গোলীয় তলে আলোকের প্রতিফলন
(Reflection of light at spherical surfaces)

দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল না হইয়া গোলক (sphere), পরবলয় (parabola) বা স্তম্ভক আকার (cylindrical) হইতে পারে। নানাবিধ যন্ত্রে বিবিধ প্রকার দর্পণের ব্যবহার দেখা যায়। আমরা পূর্ব্বে সমতল দর্পণে আলোকের প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এইবার গোলীয় দর্পণে আলোকের প্রতিফলন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। সমতলে আলোকের প্রতিফলন সূত্র গোলীয় তলেও প্রযোজ্য।

গোলীয় দর্পণ (Spherical Mirror): কোন ফাঁপা গোলক PQ-র বাহির তলের কোন অংশ (M_1M_2) বা ভিতর তলের কোন অংশ (M_3M_4) মসৃণ ও চকচকে থাকিলে তলের সেই মসৃণ অংশকে **গোলীয় দর্পণ** (spherical mirror) বলে।

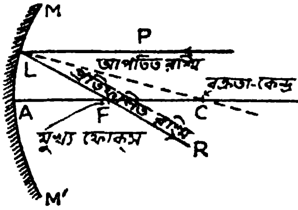


৫৭নং চিত্র—গোলীয় দর্পণ

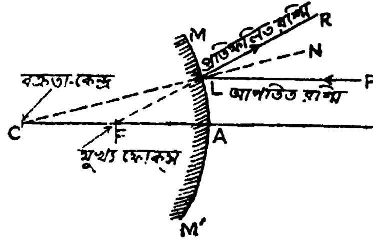
গোলীয় দর্পণ দুই প্রকারের: (ক) **অবতল দর্পণ** (concave mirror)—গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলন হইলে দর্পণ অবতল ও (খ) **উত্তল দর্পণ** (convex mirror)—গোলকের বাহিরের পৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলন হইলে দর্পণ অবতল।

সংজ্ঞা (Definitions): (ক) দর্পণের মধ্যবিন্দুকে **মেরু** (Pole) বলে (৫৮ ও ৫৯নং চিত্রের A বিন্দু)। দর্পণটি যে গোলকের অংশ তাহার কেন্দ্রকে **বক্রতা-কেন্দ্র** (Centre of Curvature) বলে (৫৮ ও ৫৯নং চিত্রের C বিন্দু) এবং সেই গোলকের ব্যাসার্দ্ধকে দর্পণের **বক্রতা-ব্যাসার্দ্ধ** (Radius of Curvature) বলে (৫৮ ও ৫৯নং চিত্রের CL, CA রেখা)। বক্রতা-কেন্দ্র ও মেরু সংযোগকারী রেখাকে **প্রধান** বা **মুখ্য অক্ষ** (Principal Axis) বলে (৫৮ ও ৫৯নং চিত্রের CA রেখা)। দর্পণের কেন্দ্রের মধ্যে দিয়া অঙ্কিত যে কোন

ব্যাসকে **গৌণ অক্ষ** (Secondary Axis) বলে (৫৮ ও ৫৯নং চিত্রের CL রেখা)। প্রধান বা গৌণ, সকল অক্ষ দর্পণের অভিলম্ব। প্রতিফলন তলের দুই সীমান্ত বিন্দু



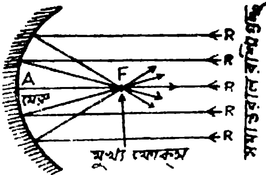
৫৮নং চিত্র—অবতল দর্পণে প্রতিফলন



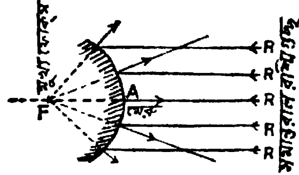
৫৯নং চিত্র—উত্তল দর্পণে প্রতিফলন

(৫৮ ও ৫৯নং চিত্র দেখ) M ও M′ হইতে কেন্দ্রে অঙ্কিত দুই ব্যাসার্দ্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোণকে (∠MCM′) দর্পণের **উন্মেষ** (aperture) বলে।

(খ) **প্রধান** বা **মুখ্য ফোকস** (Principal Focus) : যদি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল কতকগুলি রশ্মিগুচ্ছ গোলীয় তলে আপতিত হইয়া প্রতিফলনের পর প্রধান বা মুখ্য অক্ষের কোন বিন্দুতে প্রকৃতই কেন্দ্রীভূত হয় (অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) অথবা প্রধান বা মুখ্য অক্ষের কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া



৬০নং চিত্র—অবতল দর্পণের ফোকস



৬১নং চিত্র—উত্তল দর্পণের ফোকস

মনে হয় (উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) তবে ঐ বিন্দুকে দর্পণের **প্রধান** বা **মুখ্য ফোকস** (Principal Focus) বলে। মেরু হইতে ফোকসের দূরত্বকে **ফোকস দূরত্ব** (Focal Length) বলে। প্রধান অক্ষের সহিত সমকোণ করিয়া প্রধান বা মুখ্য ফোকসের ভিতর দিয়া যে তল অঙ্কন করা যায় তাহাকে **ফোকস তল** (Focal Plane) বলে।

ফোকস-দূরত্ব (f) ও **বক্রতা-ব্যাসার্দ্ধের** (r) **সম্পর্ক** (Relation between the focal length and radius of curvature) : ৫৮ ও ৫৯নং চিত্রে MM′ গোলীয় দর্পণের AC প্রধান বা মুখ্য অক্ষ, C বক্রতা-কেন্দ্র, F প্রধান বা মুখ্য

ফোকস। প্রধান অক্ষ ACর সমান্তরাল PL রশ্মি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া LR রশ্মিতে পরিগণিত হইল। প্রতিফলিত রশ্মিটি প্রধান অক্ষকে F বিন্দুতে ছেদ করে। (উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে LRকে পিছন দিকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে—৫৯নং চিত্র দেখ)। আমরা জানি F বিন্দু দর্পণের প্রধান ফোকস। যেহেতু C বক্রতা কেন্দ্র, CL রেখা L বিন্দুতে দর্পণের উপর লম্ব। AF ফোকস-দূরত্ব = f এবং AC বক্রতা-ব্যাসার্দ্ধ = r ; f ও r এর মধ্যে সম্পর্ক আমরা বাহির করিব। প্রথমে **অবতল দর্পণ** (concave mirror) লইয়া আলোচনা করা যাক। প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে

আপতন কোণ $\angle PLC$ = প্রতিফলন কোণ $\angle RLC$

LP ও AC সমান্তরাল ও উহাদের LC ছেদ করিতেছে। সুতরাং $\angle PLC = \angle LCF$ (একান্তর কোণ বা alternate angles)

$$\therefore \angle RLC = \angle LCF$$

FLC ত্রিভূজের $\angle FLC = \angle LCF$ সুতরাং $FL = FC$

L বিন্দু A র খুব কাছে অবস্থিত হইলে

$$FL = FA$$

$$\therefore FA = FC$$

$$\therefore FA = \tfrac{1}{2}AC \quad \text{or} \quad f = \frac{r}{2}$$

$\therefore$ **ফোকস-দূরত্ব = বক্রতা-ব্যাসার্দ্ধের অর্দ্ধেক।**

এইবার **উত্তল দর্পণ** (convex mirror) লইয়া আলোচনা করা যাক। প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে আপতন কোণ $\angle PLN$ = প্রতিফলিত কোণ $\angle RLN$ (৫৯নং চিত্রে CL রেখাকে N পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং CLN দর্পণের উপর অভিলম্ব)।

$\angle RLN = \angle FLC$ (বিপরীত কোণ বলিয়া)

LP ও CA সমান্তরাল এবং CLN উহাদের ছেদ করিতেছে

$\therefore \angle PLN = \angle FCL$ (বহিঃস্থ বা exterior কোণ অন্তঃস্থ বা interior কোণের সমান)

$$\therefore \angle FLC = \angle FCL$$

FCL ত্রিভূজের ঐ দুটি কোণ সমান হইলে

FC বাহু = FL বাহু।

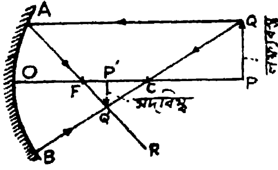
L বিন্দু A বিন্দুর নিকট অবস্থিত হইলে

$$FL = FA$$
$$\therefore \quad FA = FC$$
$$\therefore \quad FA = \tfrac{1}{2}CA$$
$$\text{or} \quad f = \frac{r}{2}$$

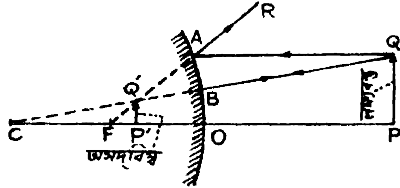
∴ **ফোকাস-দূরত্ব = বক্রতা-ব্যাসার্দ্ধের অর্দ্ধেক।**

অবতল ও উত্তল দর্পণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন (Image of an object of finite size formed by Concave and Convex mirrors) :

৬২নং ও ৬৩নং চিত্রে দেখ QP লক্ষ্যবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। লক্ষ্যবস্তুর Q বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে গমন করে। QA আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল ভাবে গিয়া A বিন্দুতে দর্পণের উপর আপতিত হইল। প্রতিফলিত রশ্মি AR প্রধান অক্ষকে F বিন্দুতে ছেদ করিবে (উত্তল দর্পণের



৬২নং চিত্র—অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন



৬৩নং চিত্র—উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

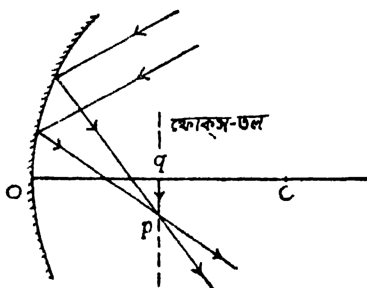
ক্ষেত্রে AR কে পিছন দিকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে)। QB রশ্মি লম্বভাবে দর্পণের উপর আপতিত হইয়া ঐ পথেই প্রতিফলিত হয়। এই দুইটি প্রতিফলিত রশ্মি Q′ বিন্দুতে ছেদ করে। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে Q′ বিন্দু Q বিন্দুর সদ্‌বিম্ব। উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে Q′ বিন্দু Q বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব। Q′ হইতে প্রধান অক্ষের উপর Q′P′ লম্ব টান। Q′P′ লক্ষ্যবস্তু QP এর প্রতিবিম্ব। অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে একটি সদ্‌বিম্ব ও উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে একটি অসদ্‌বিম্ব উৎপন্ন হয়।

জ্যামিতিক অঙ্কন সাহায্যে গোলীয় দর্পণে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, আকৃতি ও অবস্থান নির্ণয় (Graphical determination of Images at spherical mirrors) : প্রতিবিম্বের আকৃতি, অবস্থান ও বিবর্দ্ধন লক্ষ্যবস্তু দর্পণ হইতে কতদূরে অবস্থিত তাহার উপর নির্ভর করে। প্রথমে আমরা অবতল দর্পণ

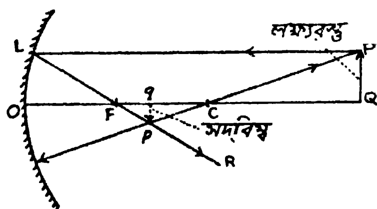
(concave mirror) লইয়া আলোচনা করিব। তারপর উত্তল দর্পণ (convex mirror) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুকে প্রধান বা মুখ্য অক্ষের উপর অবস্থিত ধরা হইয়াছে।

(ক) **অবতল দর্পণ** (Concave mirror) :

(১) **লক্ষ্যবস্তু অসীমে অবস্থিত :** অসীম দূরত্বে অবস্থিত কোন লক্ষ্যবস্তু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল ধরা হয়। প্রধান বা মুখ্য অক্ষের সহিত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর মুখ্য ফোকসে কেন্দ্রীভূত হয় (converges to principal focus)। যে সকল সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রধান বা মুখ্য অক্ষের সহিত কোণ করিয়া আপতিত হয় তাহারা প্রতিফলনের পর ফোকস-তলের একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় (৬৪নং চিত্র দেখ)। প্রতিবিম্বটি **সদ্, উল্টা** এবং **খুব** ছোট হয়। প্রতিবিম্বকে পর্দায় ধরা যায়।



৬৪নং চিত্র—অসীমে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

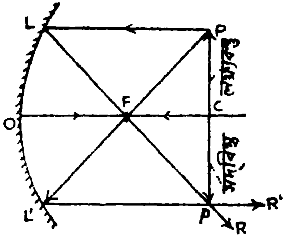


৬৫নং চিত্র—বক্রতা-কেন্দ্র ও অসীমের মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

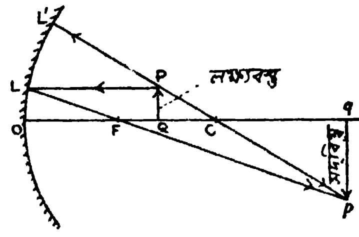
(২) **লক্ষ্যবস্তু বক্রতা-কেন্দ্র** C **ও অসীমের মধ্যে অবস্থিত :** ৬৫নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু বক্রতা-কেন্দ্র Cএর বাহিরে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। pq প্রতিবিম্ব কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আগেই বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব বক্রতাকেন্দ্র C ও মুখ্য ফোকস F এর মধ্যে গঠিত হয়। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **ছোট** হয়।

(৩) **লক্ষ্যবস্তু বক্রতা-কেন্দ্র** Cএ **অবস্থিত :** ৬৬নং চিত্রে PC লক্ষ্যবস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C-এ প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। লক্ষ্যবস্তুর P বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে গমন করে। PL আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত

সমান্তরাল ভাবে গিয়া L বিন্দুতে দর্পণের উপর আপতিত হইল। প্রতিফলিত রশ্মি LR প্রধান অক্ষকে F বিন্দুতে ছেদ করিবে। PFL´ রশ্মি F এর মধ্য দিয়া আসে বলিয়া প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল L´R´ পথে প্রতিফলিত হয়। এই দুইটি রশ্মির ছেদ বিন্দু p, Pএর প্রতিবিম্ব হয়। C এর প্রতিবিম্ব C হইবে কারণ C



৬৬নং চিত্র—বক্রতা-কেন্দ্রে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন



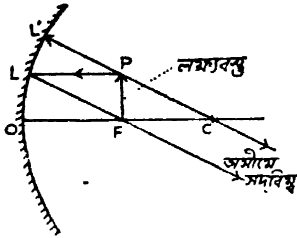
৬৭নং চিত্র—বক্রতা-কেন্দ্র ও মুখ্য ফোকস এর মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

হইতে নির্গত CO রশ্মি ঐ একই OC পথে প্রতিফলিত হয় (CO দর্পণের অভিলম্ব : অভিলম্বরূপে আপতিত রশ্মি ঐ পথেই প্রতিফলিত হয়)। সুতরাং pc লক্ষ্যবস্তু PC-এর প্রতিবিম্ব। জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় PC=pc। সুতরাং প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **লক্ষ্যবস্তুর সমান** এবং ইহা বক্রতা-কেন্দ্র Cএ গঠিত হয়।

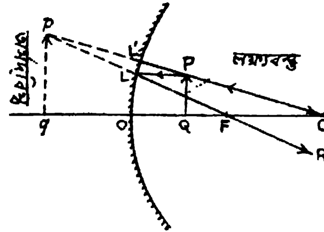
(৪) **লক্ষ্যবস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C ও মুখ্য ফোকস F এর মধ্যে অবস্থিত :** ৬৭নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু C ও F এর মধ্যবর্তী কোন স্থানে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল PL রশ্মি প্রতিফলনের পর F এর মধ্য দিয়া LFp পথে গমন করিবে। C বক্রতা-কেন্দ্র হইতে দর্পণ অভিমুখে CL´ রশ্মি ঐ পথেই প্রতিফলিত হয (CL´ দর্পণে অভিলম্ব)। এই দুইটি রশ্মির ছেদ বিন্দু p, Pএর প্রতিবিম্ব হয়। Q এর প্রতিবিম্ব q হয়। pq লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **বিবর্দ্ধিত** হয এবং C ও অসীমের মধ্যে গঠিত হয়।

(৫) **লক্ষ্যবস্তু মুখ্য ফোকসে অবস্থিত :** ৬৮নং চিত্রে PF লক্ষ্যবস্তু মুখ্য ফোকসে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P হইতে দুইটি রশ্মি একটি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল PL রশ্মি ও C বক্রতা-কেন্দ্র হইতে দর্পণের অভিমুখে

PL´ রশ্মি প্রতিফলনের পর সমান্তরাল হয় এবং অসীমে মিশে। প্রতিবিম্ব সদ্,



৬৮নং চিত্র—মুখ্য ফোকসে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

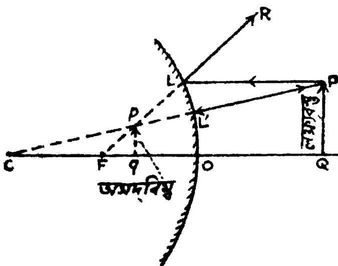


৬৯নং চিত্র—মেরু ও ফোকসের মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

উল্টা ও খুব বিবর্দ্ধিত হয়।

(ঙ) **লক্ষ্যবস্তু মেরু ও ফোকসের মধ্যে অবস্থিত** ঃ ৬৯নং চিত্র PQ লক্ষ্যবস্তু A ও F-এর মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P হইতে দুইটি রশ্মি—একটি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল PL রশ্মি ও অপরটি C বক্রতা-কেন্দ্র হইতে দর্পণ অভিমুখে PL´ রশ্মি প্রতিফলনেব পর যথাক্রমে মুখ্য ফোকস F-এর মধ্য দিয়া এবং বক্রতা-কেন্দ্র C-এর মধ্য দিয়া গমন করে। প্রতিফলিত LF ও L´P রশ্মিকে পিছন দিকে বর্দ্ধিত করিলে উহারা p বিন্দুতে মিশে। অতএব p P-এর প্রতিবিম্ব এবং Q-এর প্রতিবিম্ব q অক্ষের উপর অবস্থিত। pq লক্ষ্যবস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **বিবর্দ্ধিত** এবং দর্পণের পশ্চাতে গঠিত হয়।

(খ) **উত্তল দর্পণ** (Convex mirror) ঃ লক্ষ্যবস্তু উত্তল দর্পণের সম্মুখে যে কোন স্থানেই অবস্থিত হউক না কেন ৭০নং চিত্রের সাহায্যে ইহার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, আকৃতি ও অবস্থান পাওয়া যায়। ৭০নং চিত্রে PL রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল বলিয়া প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মি LRকে বর্দ্ধিত করিলে উহা F-এর মধ্যে দিয়া যাইবে। আবার PL´ রশ্মিকে বর্দ্ধিত করিলে বক্রতা-কেন্দ্র C-এর মধ্য দিয়া যায় বলিয়া প্রতিফলিত রশ্মি L´P হইবে; LR ও L´P রশ্মি পিছনে বর্দ্ধিত করিলে p বিন্দুতে ছেদ করে। অতএব p P-এর প্রতিবিম্ব। Q-এর প্রতিবিম্ব q প্রধান অক্ষ CA-এর



৭০নং চিত্র—উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন

উপর থাকে। pq লক্ষ্যবস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব দর্পণের পশ্চাতে গঠিত হয়। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **ক্ষুদ্রতর** এবং ফোক্স ও মেরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঠিত হয়।

সারাংশ (Summary) **অবতল দর্পণ** (Concave Mirror)

লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান (Position of the Object)	চিত্র নং	প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of the Image)	প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি (Nature of the Image)
(i) অসীমে	৬৪	ফোকৃস-তলে	অতি ক্ষুদ্র, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(ii) অসীম ও বক্রতা-কেন্দ্র (C)-এর মধ্যে	৬৫	বক্রতা-কেন্দ্র (C) ও ফোকৃসের (F) মধ্যে	ক্ষুদ্রতর, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(iii) বক্রতা-কেন্দ্রে(C)এ	৬৬	বক্রতা-কেন্দ্র (C) এ	সমানাকৃতি, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(iv) বক্রতা-কেন্দ্র (C)ও ফোকৃস (F)এর মধ্যে	৬৭	বক্রতা-কেন্দ্র (C) ও অসীমের মধ্যে	বিবর্দ্ধিত, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(v) ফোকৃসে (F)-এ	৬৮	অসীমে	অতি বর্দ্ধিত, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(vi) ফোকৃস (F) ও মেরুর (A) মধ্যে	৬৯	দর্পণের পশ্চাতে	বিবর্দ্ধিত, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব

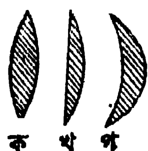
সারাংশ (Summary) **উত্তল দর্পণ** (Convex Mirror)

লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান (Position of the Object)	চিত্র নং	প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of the Image)	প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি (Nature of the Image)
(i) অসীমে		ফোকৃস-তলে	ক্ষুদ্রতর, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব
(ii) অসীম ও মেরুর (A) মধ্যে	৭০	ফোকৃস (F) ও মেরু (A)র মধ্যে	ক্ষুদ্রতর, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব

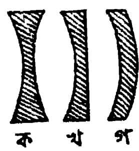
গোলীয় তলে প্রতিসরণ : লেন্স
(Refraction at spherical surfaces : Lens)

যখন স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যম গোলীয় তল দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে **গোলীয় প্রতিসারক তল** (spherical refracting surface) বলে। লেন্স এইরূপ একটি তলের উদাহরণ। সমতলে আলোকের প্রতিসরণ সূত্র গোলীয় তলেও প্রযোজ্য। ইহার কারণ প্রত্যেক গোলীয় তলকে অসংখ্য সমতলের সমষ্টি ধরা যাইতে পারে।

লেন্স (Lens) **:** দুইটি গোলীয় বা একটি গোলীয় ও একটি সমতল তল দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমের অংশবিশেষকে **লেন্স** (lens) বলে। লেন্স প্রধানত: দুই প্রকারের : (ক) **উত্তল** (convex) বা **অভিসারী** (converging) ও (খ) **অবতল** (concave) বা **অপসারী** (diverging)। প্রথম প্রকার লেন্সগুলির মাঝখানে মোটা, কিনারার দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার লেন্সগুলির মাঝখানে সরু এবং কিনারার দিকে ক্রমশঃ মোটা হইয়া যায়। উত্তল ও অবতল লেন্সকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে ইহাদের নাম : (ক) **উভোত্তল** (Double Convex or Bi-convex ৭১নং চিত্রের ক—দুই দিক উত্তল), (খ) **সমত্তোল** (Plano-convex ; ৭১নং চিত্রের খ—এক দিক উত্তল ও একদিক সমতল), (গ) **অবতলোত্তল** (Concavo-Convex ; ৭১নং চিত্রের গ—একদিক অবতল ও একদিক উত্তল)



৭১নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার উত্তল লেন্স



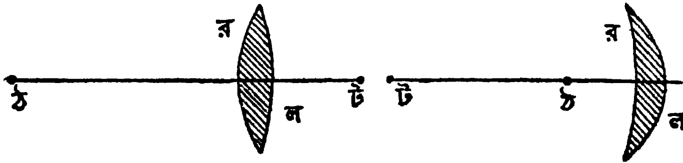
৭২নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকাব অবতল লেন্স

অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ইহাদের নাম : (ক) **উভাবতল** (Double Concave or Bi-Concave ; ৭২নং চিত্রের ক—দুই দিকে অবতল), (খ) **সমাবতল** Plano-Concave ; ৭২নং চিত্রের খ অংশ—এক দিক অবতল ও এক দিক সমতল), (গ) **উত্তলাবতল** (Convexo-Concave ; ৭২নং চিত্রের গ—একদিক উত্তল ও একদিক অবতল)।

সংজ্ঞা : (ক) **প্রধান** বা **মুখ্য অক্ষ** (Principal Axis) **:**—দুইটি গোলীয় তলের (যাহা দ্বারা লেন্স সীমাবদ্ধ থাকে) দুইটি বক্রতা-কেন্দ্র (centres of cur-

vature) থাকে। উক্ত বক্রতা-কেন্দ্র দুইটি যোগ করিলে যে সরল রেখা পাওয়া যায় তাহাই লেন্সের **প্রধান** বা **মুখ্য অক্ষ** (Principal Axis)। ৭৩নং চিত্রে র ও ল এই দুইটি গোলীয় তল দ্বারা উৎপন্ন একটি উভোত্তল লেন্স দেখান হইয়াছে এবং তাহাদের বক্রতা-কেন্দ্র হইতেছে ট ও ঠ। টঠ সরল রেখা উভোত্তল লেন্সটির প্রধান বা মুখ্য অক্ষ। সেইরূপ ৭৪নং চিত্রে অবতলোত্তল লেন্সের প্রধান বা মুখ্য অক্ষ দেখান হইয়াছে। লেন্সটি যদি সমোত্তল হয় তাহা হইলে যে সরলরেখা বক্রতা-কেন্দ্র হইতে সমতলের উপর লম্ব হইবে তাহাই প্রধান বা মুখ্য অক্ষ হইবে।

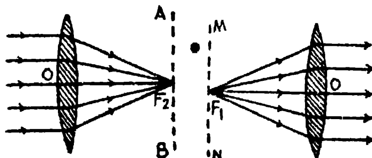
(খ) **মুখ্য ফোসি** (Principal Foci): প্রত্যেক লেন্সের দুইটি প্রধান



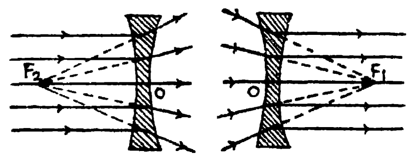
৭৩নং চিত্র—উভোত্তল লেন্সের টঠ মুখ্য অক্ষ

৭৪নং চিত্র—অবতলোত্তল লেন্সের টঠ মুখ্য অক্ষ

ফোকৃস থাকে। যদি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল কতকগুলি রশ্মিগুচ্ছ গোলীয় তলে আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর প্রধান বা মুখ্য অক্ষের কোন বিন্দুতে প্রকৃতই কেন্দ্রীভূত হয় (উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) অথবা প্রধান বা মুখ্য অক্ষের কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয় (অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) তবে ঐ বিন্দুকে লেন্সের **দ্বিতীয় প্রধান ফোকস্** (Second principal



৭৫নং চিত্র—উত্তল লেন্সের মুখ্য ফোসি

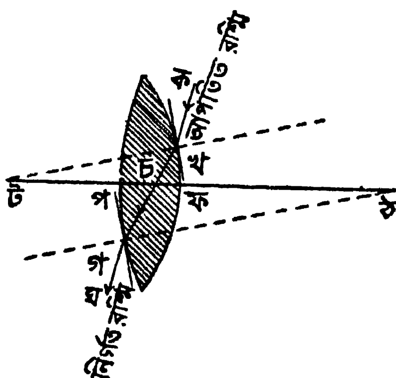


৭৬নং চিত্র—অবতল লেন্সের মুখ্য ফোসি

focus) বলে (৭৫নং ও ৭৬নং চিত্রের F_2)। সাধারণতঃ এই দ্বিতীয় প্রধান ফোকৃসকেই লেন্সের **প্রধান ফোকস্** বলে। যদি প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত কোন বিন্দু হইতে অপসৃত রশ্মিগুচ্ছ কোন গোলীয় তলে আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর প্রধান

বা মুখ্য অক্ষের সহিত সমান্তরাল হয় (উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) অথবা প্রধান অক্ষের কোন বিন্দু অভিমুখে ধাবিত রশ্মিগুচ্ছ গোলীয় তলে আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর প্রধান বা মুখ্য অক্ষের সহিত সমান্তরাল হয় (অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এইরূপ হয়) তবে ঐ বিন্দুকে লেন্সের **প্রথম প্রধান ফোক্‌স** (first principal focus) বলে (৭৫নং ও ৭৬নং চিত্রের F_1)।

(গ) **আলোক-কেন্দ্র** (Optical Centre): যে সকল আলোকরশ্মি লেন্সে প্রতিসৃত হইয়া আপতন পথের সমান্তরাল হইয়া নির্গত হয় তাহারা প্রধান অক্ষের উপরে অবস্থিত একটি নির্দ্দিষ্ট-বিন্দুর মধ্য দিয়া যায়। এই বিন্দুটিকে লেন্সের **আলোক-কেন্দ্র** বলে (৭৭নং চিত্রের চ বিন্দু আলোক-কেন্দ্র)। আলোক-কেন্দ্র লেন্সের মধ্যে অবস্থিত নাও হইতে পারে। অবতলোত্তল লেন্সে আলোক-কেন্দ্র লেন্সের বাহিরে থাকে। ৭৭নং চিত্রে দেখ আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মি সমান্তরাল হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রতিসরণের ফলে পাশে সরিয়া যায়। লেন্সের বেধ (thickness) কম হইলে এই স্থানচ্যুতি সামান্যই হইবে। লেন্স সম্বন্ধে আলোচনাকালে উহার বেধ নগণ্য বলিয়া ধরা হইবে। আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যে সকল রশ্মি যাইবে, প্রতিসরণের ফলে তাহাদের স্থানচ্যুতি ধর্ত্তব্যের মধ্যে না ধরিয়া একই সরলরেখায় চলিতে থাকিবে।



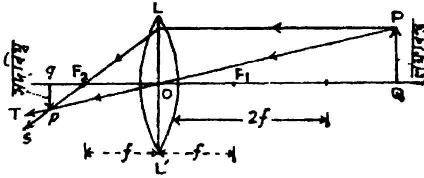
৭৭নং চিত্র—লেন্সের আলোক-কেন্দ্র

(ঘ) **ফোক্‌স দূরত্ব** (Focal Length): প্রধান ফোকৃস হইতে আলোক-কেন্দ্র পর্য্যন্ত দূরত্বকে **ফোক্‌স দূরত্ব** বলে। যদি লেন্সের চারিপার্শ্বে একই মাধ্যম থাকে তবে দুই ফোকৃস হইতে আলোক-কেন্দ্রের দূরত্ব সমান হয়।

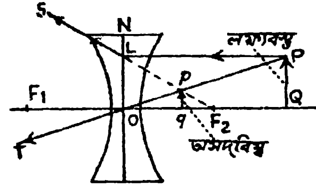
(ঙ) **ফোকৃস তল** (Focal Plane): প্রধান ফোকৃসের মধ্য দিয়া প্রধান অক্ষের সহিত সমকোণে অঙ্কিত তলকে ফোকৃস তল (Focal Plane) বলে।

উত্তল ও অবতল লেন্স কর্ত্তৃক বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন (Image of an object of finite size by Convex and Concave lens): ৭৮নং ও ৭৯নং

চিত্রে দেখ PQ লক্ষ্যবস্তু প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। লক্ষ্যবস্তুর P বিন্দু হইতে আলোকরশ্মি চতুর্দ্দিকে গমন করে। PL আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালভাবে গিয়া L বিন্দুতে লেন্সের উপর আপতিত হইল। প্রতিসরিত রশ্মি LS প্রধান অক্ষকে F_2 বিন্দুতে ছেদ করিবে (অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে LSকে পিছনদিকে বর্দ্ধিত করিতে হইবে)। PO আলোকরশ্মি আলোক-কেন্দ্র O-এর মধ্য দিয়া যায়



৭৮নং চিত্র—উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন



৭৯নং চিত্র—অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন

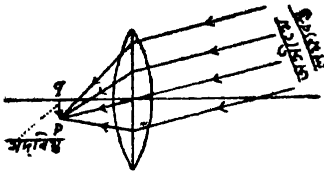
বলিয়া একই অভিমুখে OT পথে বাহির হয়। এই দুইটি প্রতিসরিত রশ্মি p বিন্দুতে ছেদ করে। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে pবিন্দু P বিন্দুর সদ্‌বিন্দু। অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে p বিন্দু P বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে এইটি সদ্‌বিম্ব ও অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এইটি অসদ্‌বিম্ব।

জ্যামিতিক অঙ্কন সাহায্যে লেন্সে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, আকৃতি ও অবস্থান নির্ণয় (Graphical determination of Images at Lens) : প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, অবস্থান ও বিবর্দ্ধন লক্ষ্যবস্তু লেন্স হইতে কতদূরে অবস্থিত তাহার উপর নির্ভর করে। প্রথমে আমরা উত্তল লেন্স (convex lens) লইয়া আলোচনা করিব। তারপর অবতল লেন্স সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুকে প্রধান বা মুখ্য অক্ষের উপর অবস্থিত ধরা হইয়াছে।

(ক) **উত্তল লেন্স** (Convex Lens) :

(১) **লক্ষ্যবস্তু অসীম দূরত্বে অবস্থিত :** অসীম দূরত্বে অবস্থিত কোন লক্ষ্যবস্তু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল ধরা হয়। প্রধান বা মুখ্য অক্ষের সহিত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্সে প্রতিসরণের পর মুখ্য ফোকাসে কেন্দ্রীভূত হয়। যে সকল সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রধান বা মুখ্য অক্ষের সহিত কোণ করিয়া আপতিত হয়

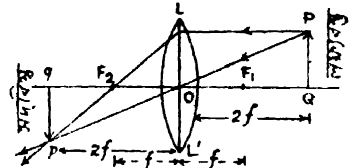
তাহারা প্রতিসরণের পর ফোকস-তলের একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয় (৮০নং চিত্র দেখ)। প্রতিবিম্বটি **সদ্, উল্টা** ও **খুব ছোট** হয়।



৮০নং চিত্র—অসীমে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

(২) **লক্ষ্যবস্তু অসীম ও 2*f*-এর মধ্যে অবস্থিত :** ৭৮নং চিত্রে PQ লক্ষ্য-বস্তু 2*f*-এর বাহিরে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। PL আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে গিয়া লেন্সে প্রতিসরণের পর F_2এর মধ্যদিয়া LS পথে গমন করে। PO আলোকরশ্মি আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজা গিয়া OT পথে প্রতিসৃত হয় (তোমরা আগেই পড়িয়াছ আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া যে রশ্মি গমন করে প্রতিসরণের পর তাহার পথের পরিবর্ত্তন হয় না)। LS ও OT প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় p বিন্দুতে মিলিত হয়। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বটি **সদ্, উল্টা** ও **ক্ষুদ্রতর** হয় এবং *f* ও 2*f*এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে গঠিত হয়। ছবি তোলার ক্যামেরায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যে (objective of an astronomical telescope) দূরবর্ত্তী বৃহৎ বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব গঠন করিতে উত্তল লেন্স এই অবস্থানে ব্যবহৃত হয়।

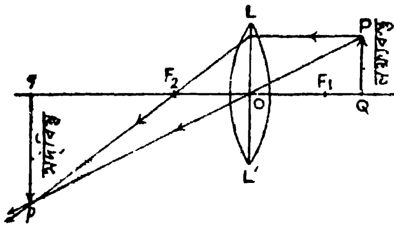
(৩) **লক্ষ্যবস্তু 2*f* এ অবস্থিত :** ৮১নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু **2*f***তে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। PL আলোকরশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল-ভাবে গিয়া প্রতিসরণের পর F_2এর মধ্য দিয়া গমন করে। PO আলোকরশ্মি আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজা গিয়া ঐ পথে প্রতিসৃত হয়। এই দুইটি প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয় p বিন্দুতে মিলিত হয়। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **লক্ষ্যবস্তুর সমান** এবং 2*f*তে গঠিত হয়।



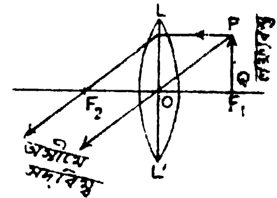
৮১নং চিত্র—2f দূরত্বে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

(৪) **লক্ষ্যবস্তু 2f ও f এর মধ্যে অবস্থিত :** ৮২নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু 2f ও f এর মধ্যে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। PL আলোকরশ্মি প্রধান

অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে গিয়া প্রতিসরণের পর F_2 এর মধ্য দিয়া গমন করে। PO আলোকরশ্মি আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজা গিয়া ঐ পথে প্রতিস্থত হয়। এই দুইটি প্রতিস্থত রশ্মিদ্বয় p বিন্দুতে মিলিত হয়। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **বিবর্দ্ধিত** হয় এবং 2f দূরত্বের বাহিরে গঠিত হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনে ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যে নিকটস্থ ক্ষুদ্র বস্তুর বিবর্দ্ধিত প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করিতে এইরূপ অবস্থানে উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয়।



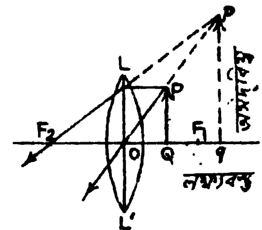
৮২নং চিত্র—2f ও f এর মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন



৮৩নং চিত্র—মুখ্য ফোকাসে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

(৫) **লক্ষ্যবস্তু প্রধান বা মুখ্য ফোকাসে অবস্থিত :** ৮৩নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু মুখ্য ফোকাসে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P হইতে PL ও PO আলোকরশ্মি প্রতিসরণের পর সমান্তরাল চলিয়া গিয়া অসীমে প্রতিবিম্ব গঠন করে। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা**, ও **খুব বিবর্দ্ধিত** হয়।

(৬) **লক্ষ্যবস্তু f ও লেন্সের মধ্যে অবস্থিত** ৮৪নং চিত্রে PQ লক্ষ্যবস্তু f ও লেন্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। P হইতে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল PL রশ্মি ও PO রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় না—পিছনদিকে বর্দ্ধিত করিলে উহারা p বিন্দুতে মিশে। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **বিবর্দ্ধিত** হয়। চশমা, বিবর্দ্ধক কাচ (magnifying glass) এবং দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্রে (eye piece) অসদ্‌বিম্ব সৃষ্টি করিবার জন্য উত্তল লেন্স এই অবস্থানে ব্যবহৃত হয়।



৮৪নং চিত্র—লেন্স ও মুখ্য ফোকাসের মধ্যে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন

(খ) **অবতল লেন্স** (Concave Lens) : লক্ষ্যবস্তু অবতল লেন্সের সম্মুখে যে কোন স্থানেই অবস্থিত হউক না কেন ৭৯নং চিত্রের সাহায্যে উহার প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, ও অবস্থান পাওয়া যায়। P হইতে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল PL রশ্মি ও PO রশ্মি LS ও OT পথে প্রতিসৃত হয়। LS ও OT রশ্মিদ্বয় প্রতিসরণের পর প্রকৃতপক্ষে মিলিত হয় নাই—পিছনদিকে বর্দ্ধিত করিলে উহারা p বিন্দুতে মিশে। p হইতে প্রধান অক্ষের উপর pq লম্ব টান। pq লক্ষ্যবস্তু PQ এর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **ক্ষুদ্রতর** হয় এবং ফোকৃস দূরত্বের মধ্যেই গঠিত হয়।

সারাংশ (Summary) **উত্তল লেন্স** (Convex Lens)

লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান (Position of the Object)	চিত্র নং	প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of the Image)	প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি (Nature of the Image)
(i) অসীমে	৮০	ফোকৃস-তলে	অতি ক্ষুদ্র, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(ii) অসীম ও $2f$এর মধ্যে	৭৮	f ও $2f$ এর মধ্যে	ক্ষুদ্রতর, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(iii) $2f$ এ	৮১	$2f$ এ	সমানাকৃতি, উল্টা, সদ্‌বিম্ব
(iv) $2f$ ও f এর মধ্যে	৮২	$2f$ দূরত্বের বাহিরে	বিবর্দ্ধিত, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(v) f এ	৮৩	অসীমে	অতি বিবর্দ্ধিত, উল্টা ও সদ্‌বিম্ব
(vi) f ও লেন্সের মধ্যে	৮৪	লক্ষ্যবস্তুর একই দিকে	বিবর্দ্ধিত, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব

সারাংশ (Summary) **অবতল লেন্স** (Concave Lens)

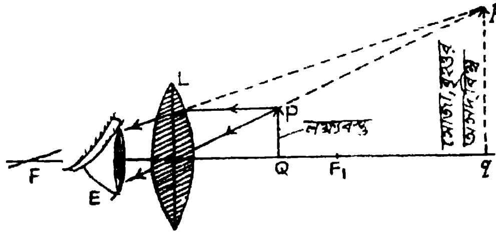
লক্ষ্যবস্তুর অবস্থান (Position of the Object)	চিত্র নং	প্রতিবিম্বের অবস্থান (Position of the Image)	প্রতিবিম্বের আকৃতি ও প্রকৃতি (Nature of the Image)
(i) অসীমে		ফোকৃস-তলে	অতি ক্ষুদ্র, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব
(ii) অসীম ও লেন্সের মধ্যে	৭৯	f ও লেন্সের মধ্যে	ক্ষুদ্রতর, সোজা ও অসদ্‌বিম্ব

আলোকীয় যন্ত্র

(Optical Instruments)

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে লেন্স হইতে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব ও লেন্সের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিবিম্ব উল্টা বা সোজা হয়, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়, নিকটে আসে বা দূরে যায় আলোকীয় যন্ত্রে বিভিন্ন লেন্সের সাহায্যে আমরা ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তুকে বৃহৎ করিয়া, বৃহৎ লক্ষ্যবস্তুকে ক্ষুদ্র করিয়া, দূরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে নিকটবর্ত্তী করিয়া ও নিকটস্থ লক্ষ্য-বস্তুকে দূরে লইয়া গিয়া প্রতিবিম্ব গঠন করি। এই যন্ত্রগুলি আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্য করে। নিম্নে কয়েকটি আলোকীয় যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল।

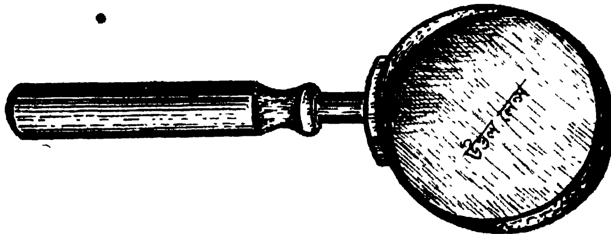
বিবর্দ্ধক কাচ (Magnifying glass): ইহা একটি উত্তল লেন্স। এই লেন্সের ফোকস দূরত্বের মধ্যে কোন বস্তু রাখিলে নিকটে অবস্থিত আমাদের চক্ষু



৮৫নং চিত্র—বিবর্দ্ধক কাচ

লেন্সের পশ্চাতে একটি সোজা অসদ্ ও বৃহত্তর প্রতিবিম্ব দেখিবে (৮৫নং চিত্র দেখ)। বিবর্দ্ধক কাচের ন্যায় **সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র** (Simple Microscope) একটি উত্তল লেন্স দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং সোজা, অসদ্ ও বৃহত্তর প্রতিবিম্ব এইভাবে গঠন করা হয়।

আতসী কাচ (Burning glass): ইহা একটি উত্তল লেন্স। এই

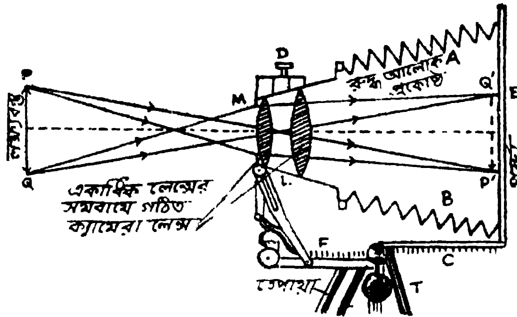


৮৬নং চিত্র—আতসী কাচ

লেন্সের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মিগুচ্ছকে কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রচুর তাপ উৎপন্ন করা হয়।

ফটোগ্রাফি ক্যামেরা (Photographic camera) : এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি ফটোগ্রাফি প্লেটে কোন লক্ষ্যবস্তুর চিরস্থায়ী প্রতিবিম্ব তোলা যায়। যন্ত্রের প্রধান অংশগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :

(১) **রুদ্ধ-আলোক প্রকোষ্ঠ** (Light-proof chamber, AB) : ইহার নির্ম্মাণ কৌশল এইরূপ যে একটি বিশেষ পথ ব্যতীত ক্যামেরার মধ্যে অন্যপথে আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা ভাজকরা চামড়া বা শক্ত কাল কাগজ দিয়া নির্ম্মিত হয় যাহাতে ইহার দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমত বাড়ান বা কমান যায়। আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বন্ধ করার জন্য ক্যামেরার ভিতরটা কাল রং করা থাকে। ক্যামেরাটি একটি তেপয়ার (tripod stand) উপর বসান থাকে যাহাতে ইহাকে যে কোন অবস্থানে বা উচ্চতায় রাখা যায়। বাক্সের পাটাতনে (base) দন্তবিশিষ্ট দণ্ড C ও কাঁটা দণ্ড F (rack and pinion) ব্যবস্থা থাকায় বাক্সের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়।



৮৭নং চিত্র—ফটোগ্রাফি ক্যামেরা

(২) **অভিলক্ষ্য** বা **ক্যামেরা লেন্স** (Camera Lens) : ক্যামেরার সম্মুখ দিকে একটি কাঠামোর উপর একাধিক লেন্স বসান থাকে। লেন্স কয়খানি মিলিয়া একটি অভিসারী লেন্সের ক্রিয়া করে এবং লক্ষ্যবস্তুর একটি সদ্ প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করে। Dতে একটি দন্তর দণ্ড ও কাটা দণ্ড থাকে যাহাতে focus করার জন্য অভিলক্ষ্যকে সম্মুখে বা পশ্চাতে সরান যায়।

(৩) **ডায়াফ্রাম** (Diaphragm) : ইহা একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পর্দ্দা। ছিদ্রটিকে ছোট বড় করা যায় বলিয়া লেন্সের উন্মেষ বা মুখ (aperture) ইহার সাহায্যে ছোট বড় করিয়া আপতিত আলোকরশ্মির মাত্রা হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়।

(৪) **সাটার** বা **ঢাকনা** (Shutter) : লেন্সের সম্মুখে একটি ঢাকনার সাহায্যে ফটোগ্রাফি প্লেটে আলোকরশ্মির পতনের (exposure) সময় নিয়ন্ত্রণ

করা হয়। আধুনিক ক্যামেরায় স্বয়ং-ক্রিয় ব্যবস্থার দ্বারা (automatic arrangement) ১/১০ হইতে ১/১০০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৫) **পর্দ্দা** E (Screen): পর্দ্দাটি ঘষা কাচের তৈরী এবং ক্যামেরার পিছন দিকে থাকে। লেন্স আগাইয়া পিছাইয়া ইহার উপর লক্ষ্যবস্তুর একটি স্পষ্ট প্রতিবিম্ব ফেলা হয়। পরে উহা সরাইয়া ঐ স্থানেই ফটোগ্রাফি-প্লেট রাখা হয়।

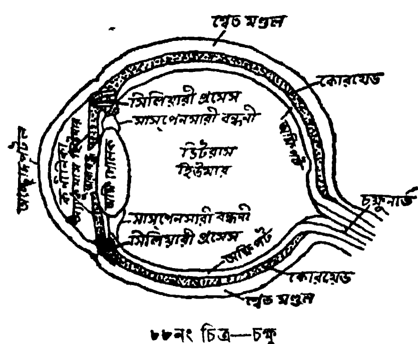
(৬) **স্লাইড ও প্লেট** (Slide and Plate): স্লাইড একটি আলোক-নিরুদ্ধ সরু বাক্স। ইহার মধ্যে আলোক স্পর্শকাতর প্লেট (sensitive plate) থাকে। প্লেটে বাহিরের আলোক লাগিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। রৌপ্যঘটিত ও আলোক স্পর্শকাতর (light sensitive) রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ বা আস্তরণ দেওয়া কাচের ফলককে প্লেট বলা হয়।

ক্যামেরার ক্রিয়া (Action of a Camera): ছবি তুলিবার সময় ক্যামেরা লেন্স প্রয়োজনমত সম্মুখে বা পিছনে সরাইয়া ঘসা কাচের পর্দ্দার উপর একটি সদ্, উল্টা প্রতিবিম্ব ফেলা হয় এবং ডায়াফ্রামের সাহায্যে সেই প্রতিবিম্বকে যথাসম্ভব উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করা হয়। ক্যামেরা লেন্সকে সাটার দিয়া বন্ধ করিয়া ঘসা কাচের পর্দ্দা সরাইয়া প্লেটসমেত স্লাইডের বাক্স ঐখানে রাখা হয়। সাটার খুলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লক্ষ্যবস্তু হইতে আলোক আসিয়া ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর পড়ে। এইভাবে প্লেটের উপর ছবির নেগেটিভ উৎপন্ন হয়। পরে এই নেগেটিভ হইতে পজিটিভ ফটো বা লক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ আলোক চিত্র প্রস্তুত করা হয়।

চক্ষু (Eye): মানবের চক্ষু প্রকৃতিদত্ত একটি আলোকীয় যন্ত্র বলিয়া মনে করা যায়। ফটোগ্রাফি ক্যামেরার সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও ইহার ক্রিয়া ক্যামেরা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। ইহা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর সদ্, উল্টা প্রতিবিম্ব অক্ষিপট (retina) নামক আলোক-সুগ্রাহী পর্দ্দার উপর গঠিত করে। চক্ষু নার্ভের সাহায্যে ইহা মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তখন লক্ষ্যবস্তুর আকৃতি, আয়তন ও বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি জন্মে। অক্ষিপটের উপর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হইলেও বিশেষ মানসিক অবস্থার জন্য (mental interpretation) আমরা উহাকে সোজা দেখি।

নিম্নে চক্ষুর বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেওয়া হইল। আমাদের মুখমণ্ডলে নাসিকার দুই পার্শ্বে অস্থি-কোটরের (socket) মধ্যে **অক্ষিগোলক** (eye ball) আছে।

অক্ষিগোলকের গঠন-প্রণালী একটু জটিল। ইহার তিনটি স্তর আছে; প্রথমে একটি সাদা রঙের ঘন অস্বচ্ছ শক্ত স্তর—ইহাকে **শ্বেতমণ্ডল** (sclera) বলে; তারপর একটি অস্বচ্ছ রঞ্জিত পেশীস্তর—ইহাকে **কোরয়েড** (choroid) বলে এবং সর্ব্বনিম্নে চক্ষুনার্ভের শেষ অংশের বিস্তৃতিতে একটি লাল অর্দ্ধ স্বচ্ছ স্তর—ইহাকে **অক্ষিপট** (retina) বলে। অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে অস্বচ্ছ শ্বেতমণ্ডলের যে অংশ থাকে তাহা স্বচ্ছ এবং তাহাকে **অচ্ছোদপটল** (cornea) বলে। অচ্ছোদপটলের আবরণের পিছনে কালো পেশী-নির্ম্মিত পর্দা আছে—ইহাকে **কণীনিকা** (iris) বলে। কোরয়েড স্তর হইতেই ইহা উদ্ভূত। কণীনিকার মাঝখানের ছিদ্রকে **তারারন্ধ্র** বা **পিউপিল** (pupil)বলে। দুই প্রস্থ অনৈচ্ছিক পেশী কর্ত্তৃক এই কণীনিকা পর্দাটি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে এবং ইহারই সঙ্কোচন ও প্রসারণে তারারন্ধ্রটি ছোট ও বড় হয়। সুতরাং আলোকের পরিমাণ নিয়মিত রাখাই কণীনিকার কার্য্য। তারারন্ধ্রের পশ্চাতে আছে একখানি স্বচ্ছ **লেন্স** বা **অক্ষিমুকুর** (lens)। লেন্স লম্বমান তন্তু দ্বারা (ইহাকে suspensory ligaments বলে) ভিতরের আবরণের সহিত যুক্ত থাকে। লেন্সের সম্মুখে ও পশ্চাতে একপ্রকার স্বচ্ছ তরল পদার্থ থাকে—সম্মুখের তরল পদার্থটিকে aqueous humour ও পশ্চাতের স্বচ্ছ তরল পদার্থটিকে vitreous humour বলে। অচ্ছোদপটল, aqueous humour, লেন্স ও vitreous humour সবগুলি মিলিয়া একটি অভিসারী (convergent) সমবায় গঠন করে।



৮৮নং চিত্র—চক্ষু

লক্ষ্যবস্তু হইতে আলোকরশ্মি পিউপিলের ভিতর দিয়া লেন্সের উপর পড়ে এবং প্রতিসরণের পর অক্ষিপটের উপর একটি সদ্, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর প্রতিবিম্ব গঠন করে। [বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব গঠনের ব্যাপারে সিলিয়ারী পেশীগুলির (ciliary processes) সঙ্কোচন ধর্ম্ম সাহায্য করে। সিলিয়ারী পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং ফলে কোরয়েড স্তরকে সম্মুখের দিকে টানিয়া আনে।

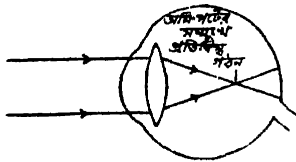
ইহাতে কোরয়েড সংলগ্ন লম্বমান তন্তু (suspensory ligament) আল্‌গা হইয়া যায় এবং লেন্সের উপর টান কমিয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্মের জন্য লেন্সের উত্তলতা বাড়িয়া যায এবং ফলে ফোক্‌স দূরত্বের পরিবর্ত্তন হয়। এইভাবে ফোক্‌স দূরত্বের পরিবর্ত্তনের ফলে লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের উপর পড়ে। লেন্সের উত্তলতা ও কার্য্যকরী ফোক্‌স দূরত্ব পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাকে **উপযোজন** (accommodation) বলে]। চক্ষুনার্ভের সাহায্যে উহা মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তখন লক্ষ্যবস্তুর আকৃতি, আয়তন বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি জন্মে। অক্ষি-পটের উপর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হইলেও বিশেষ মাসিক অবস্থার জন্য (mental interpetation) আমরা উহাকে সোজা দেখি।

দূর বিন্দু ও **নিকট বিন্দু** (Far point and Near point) : যে দূরতম বিন্দুতে কোন ক্ষুদ্রবস্তু থাকিলে চক্ষু স্পষ্টভাবে তাহা দেখিতে পায় তাহাকে **দূর বিন্দু** (Far Point) বলে। সুস্থ চোখের ক্ষেত্রে এই প্রান্তিক বিন্দুকে অসীমে ধরা হয়। যে নিকটতম বিন্দুতে কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্যবস্তু থাকিলে চোখের উপযোজন ক্ষমতা (accommodation) সর্ব্বোচ্চ সীমায় প্রযোগ করিয়া তাহাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাহাকে **নিকট বিন্দু** (Near Point) বলে। চোখ হইতে নিকট বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির নূন্যতম দূরত্ব (least distance of distinct vision) বলে। সুস্থ চোখের পক্ষে এই দূরত্ব প্রায় 25 সেণ্টিমিটার। দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী দূরত্বকে **দৃষ্টির পাল্লা** (range of vision) বলে।

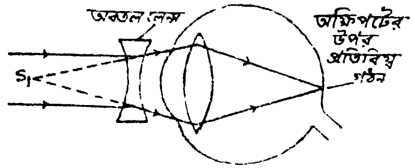
চক্ষুর দোষ (Defects of the eye) : সুস্থ চোখ উপযোজন ক্ষমতা দ্বারা প্রায় 25 সেণ্টিমিটার হইতে বহুদূরে অবস্থিত বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায়। যদি লেন্সের বা অক্ষিগোলকের গঠনের ত্রুটির জন্য চক্ষুর দৃষ্টির পাল্লা ইহা অপেক্ষা কম হয় তবে তাহাকে **দোষযুক্ত চক্ষু** (defective eye) বলে। চক্ষুর দোষ চারি প্রকারের হয় : (১) **স্বল্পদৃষ্টি** (Short Sight or Myopia), (২) **দীর্ঘ দৃষ্টি** (Long Sight or Hypermetropia), (৩) **ক্ষীণদৃষ্টি** বা **চালশে** (Presbyopia) ও (৪) **বিষমদৃষ্টি** (Astigmatism)।

স্বল্পদৃষ্টি (Short Sight) : স্বল্পদৃষ্টি চোখের দূর বিন্দু অসীমে অবস্থিত না হইয়া চোখের কাছে থাকে এবং ইহার নিকট বিন্দু সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু অপেক্ষা আরও কাছে থাকে অর্থাৎ ইহার নিকট বিন্দু 25 সেণ্টিমিটার অপেক্ষা কম হয়।

স্বল্পদৃষ্টি দোষ দুইটি কারণে উদ্ভূত হয়—যদি অক্ষিগোলক খুব লম্বা হয় এবং চক্ষু লেন্সের ফোকস দূরত্ব কম হয়। চোখের এই ত্রুটি থাকিলে দূরবর্ত্তী বস্তু হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ লেন্সে প্রতিসৃত হইয়া অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব গঠন না করিয়া অক্ষিপটের সম্মুখে প্রতিবিম্ব গঠন করে। ফলে দূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। চোখে এই ত্রুটি থাকিলে নিকটে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তু স্পষ্টভাবে দেখিতে কোন অসুবিধা হয় না। চক্ষুর সম্মুখে উপযুক্ত ফোকস দূরত্বের অবতল লেন্সের (concave lens) চশমা ব্যবহার করিয়া এই ত্রুটি সংশোধন করা যায় (৯০নং চিত্র দেখ)।



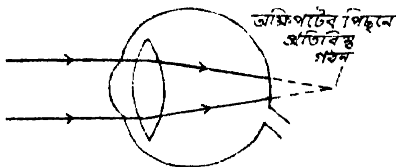
৮৯নং চিত্র—স্বল্পদৃষ্টি দোষযুক্ত চক্ষু



৯০নং চিত্র—অবতল লেন্সের সাহায্যে স্বল্পদৃষ্টি দোষ দূরীকরণ

স্বল্পদৃষ্টি চোখের দূর বিন্দু অসীমে অবস্থিত নয়। ধরা যাক্, উহা S_1 বিন্দুতে অবস্থিত। এই চোখের নিকট বিন্দু (সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু অপেক্ষা ইহা আরও কাছে) হইতে S_1 দূরত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত লক্ষ্যবস্তুই স্পষ্ট দেখা যায়। S_1 বিন্দু অপেক্ষা দূরে অবস্থিত কোন লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। সুতরাং সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখিতে হইলে S_1 বিন্দুতে সেই লক্ষ্যবস্তুর একটি অসদ্‌বিম্ব গঠন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্য অবতল লেন্সের চশমার সাহায্যে সাধিত হয়।

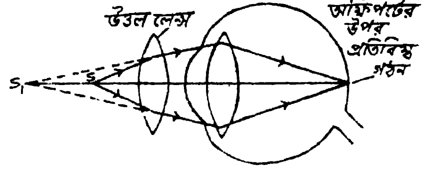
দীর্ঘদৃষ্টি (Long Sight) **:** দীর্ঘদৃষ্টি চোখের দূর বিন্দু অসীমে অবস্থিত থাকে কিন্তু ইহার নিকট বিন্দু সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু অপেক্ষা দূরে থাকে অর্থাৎ ইহার নিকট বিন্দু 25 সেণ্টিমিটারের বেশী হয়। দীর্ঘদৃষ্টি দোষ দুইটি কারণে উদ্ভূত হয়—যদি অক্ষিগোলক খুব ছোট হয় এবং চক্ষু লেন্সের ফোকস দূরত্ব বেশী হয়। চোখের এই ত্রুটি থাকিলে দূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তু হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ অক্ষিপটের পিছনে প্রতিবিম্ব গঠন করে কিন্তু উপযোজন ক্ষমতার জন্য



৯১নং চিত্র—দীর্ঘদৃষ্টি দোষযুক্ত চক্ষু

অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব হয় এবং ফলে দূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু নিকটবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে উপযোজন ক্ষমতা সর্ব্বোচ্চ সীমায় প্রয়োগ করিয়াও অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব গঠন করা সম্ভব হয় না। চক্ষুর সম্মুখে উপযুক্ত ফোকাস দূরত্বের উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করিযা এই ত্রুটি সংশোধন করা যায়।

মনে কর, সুস্থ চোখের নিকট বিন্দু Sএ এবং দীর্ঘদৃষ্টি চোখের নিকট বিন্দু S_1 এ অবস্থিত। কোন নিকটবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুকে স্পষ্ট দেখিতে হইলে S_1 বিন্দুতে একটি অসদ্বিম্ব গঠন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্য উত্তল লেন্সের চশমার সাহায্যে সাধিত হয় (৯২নং চিত্র দেখ)।



৯২নং চিত্র—উত্তল লেন্সের সাহায্যে দীর্ঘ দৃষ্টি দোষ দূরীকরণ

ক্ষীণদৃষ্টি বা **চালশে** (Presbyopia): ইহা একপ্রকার দীর্ঘদৃষ্টি দোষ। বৃদ্ধ বয়সে এই দোষ উদ্ভূত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেন্স সংলগ্ন পেশীর (ciliary muscles) স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় উপযোজন ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে এবং সেইজন্য বৃদ্ধলোক বই পড়িবার সময় বই চোখ হইতে দূরে সরাইযা লইযা যান। এই দোষ প্রতিকারের জন্য অল্প ক্ষমতা বিশিষ্ট উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করিতে হয়।

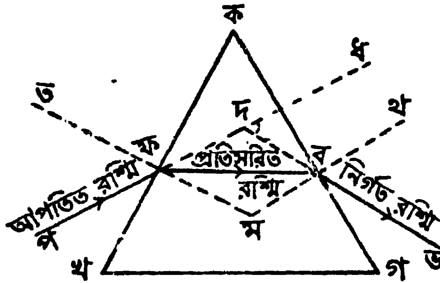
বিষমদৃষ্টি (Astigmatism): এই দোষ থাকিলে চক্ষু একই দূরত্বে অবস্থিত অনুভূমিক ও লম্ব রেখাকে (horizontal and vertical lines) সমান স্পষ্টতার সহিত দেখিতে পায না। অচ্ছোদপটল ও লেন্সের তলের বক্রতার অসমতার জন্যই (inequality in the curvatures) এই দোষের উদ্ভব হয়। এই দোষের প্রতিকারের জন্য cylindrical লেন্সের চশমা ব্যবহৃত হয়।

প্রিজ্‌ম্ ও আলোক বিচ্ছুরণ

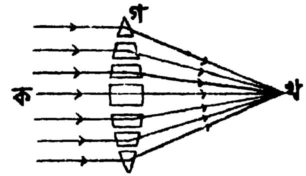
(Prism and Dispersion of light)

প্রিজ্‌ম্ (Prism): প্রিজ্‌ম্ বলিতে কোন প্রতিসরণকারী মাধ্যমের দুইটি আনত সমতল পৃষ্ঠদ্বারা সীমাবদ্ধ অংশবিশেষকে বুঝায়। সমতল পৃষ্ঠ দুইটিকে প্রিজ্‌মের প্রতিসারক পৃষ্ঠ (refracting surfaces) বলে। প্রিজ্‌ম্ যে পদার্থে প্রস্তুত

তাহার প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) প্রিজ্‌মের বাহিরের মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক অপেক্ষা বড় হইলে কোন রশ্মি প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া বাহির হইলে দেখা যাইবে যে উহা প্রিজ্‌মের ভূমির দিকে বাঁকিয়া আছে (৯৩নং চিত্র দেখ)। রশ্মির চ্যুতি



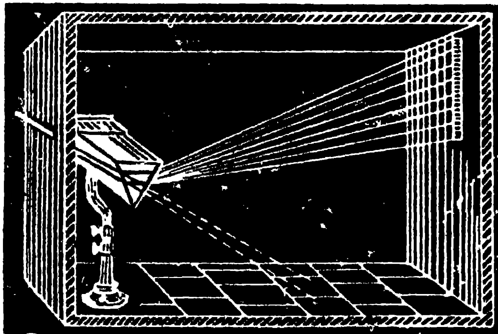
৯৩নং চিত্র—প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া প্রতিসরণ



৯৪নং চিত্র—উত্তল লেন্স প্রিজ্‌ম্ সমষ্টি

(∠ধদব) আপতন কোণ (angle of incidence) ও প্রিজমের কোণের মানের উপর নির্ভর করে। উত্তল লেন্সকে অক্ষের দুইধারে কতকগুলি প্রিজ্‌মের সমষ্টি ধরা যাইতে পারে। ৯৪নং চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে।

বর্ণালী (Spectrum) : শ্বেত সূর্য্যালোক সূক্ষ্মরশ্মির আকারে ত্রিফলক কাচ প্রিজ্‌মের (prism) ভিতর দিয়া যাইবার সময় বায়ু হইতে কাচ এবং কাচ হইতে



৯৫নং চিত্র—আলোক বিচ্ছুরণ

বায়ু এই দুই প্রকার মাধ্যমের দ্বারা দুইবার প্রতিসৃত হয়। তারপর যখন উহা পিছনের পর্দ্দায় পতিত হয়, তখন্ সেই শ্বেত সূর্য্যালোক কতকগুলি বিচিত্র বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া

পড়ে। সুবিধার জন্য উহাদিগকে বেগুনি (violet), ঘননীল (indigo), নীল (blue), হরিৎ (green), পীত (yellow), নারঙ্গ (orange) এবং লোহিত (red) এই সাতটি বর্ণে বিভক্ত করা যায়। এই বর্ণমালাকে বর্ণালী (spectrum) বলে (৯৫নং চিত্র দেখ)। এই সাত রঙের আলোককে যদি লেন্সের (lens) সাহায্যে একত্র করিয়া পর্দ্দার উপর ফেলা হয়, তাহা হইলে আবার শ্বেত আলোক পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার **আইজাক নিউটন** (Sir Issac Newton) উক্ত ব্যাপারটি পরীক্ষা করেন। ইহা দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, শ্বেত আলোক একটি মৌলিক আলোক নয়। সাতটি মৌলিক আলোকের সমন্বয়ে শ্বেত আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রিজমের সাহায্যে আলোকের বিশ্লেষণের নাম **বিচ্ছুরণ** (dispersion)। ঐ সাতটি আলোক যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখন উহারা ভিন্ন ভিন্ন কোণে বাঁকিয়া যায়। সেই কারণে উহাদিগকে বর্ণালীতে পৃথকভাবে পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ণ-বৈচিত্র্য (Colour of Bodies) **:** কাগজখানা সাদা, কালির রঙ কালো, বেগুনটার রঙ বেগুনি, নীল বড়ি ঘননীল, আকাশ নীল, গাছের পাতা হরিৎ, হলুদখানা পীত, কমলালেবুর রঙ নারঙ্গ, সিঁদুর লাল—ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এই যে বর্ণ-বৈচিত্র্য উহা কিরূপে হইয়া থাকে? **নিউটন** স্থির করিলেন, **বর্ণ কোন পদার্থের বিশিষ্ট ধর্ম্ম নয়** অর্থাৎ পদার্থের কোন নিজস্ব বর্ণ নাই। পদার্থের বর্ণভেদ নির্ভর করে তাহার সেই শক্তির উপর, যাহা দ্বারা উহা সূর্য্যরশ্মির কয়েকটি রঙ শোষণ করে এবং কয়েকটি প্রতিফলিত করে। কোন পদার্থ হইতে যে রঙের রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, আমরা পদার্থটিকে সেই বর্ণবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি। উদাহরণস্বরূপ, সূর্য্যরশ্মি খানিকটা সিঁদুরের উপর পড়িল। সূর্য্যরশ্মিতে সাতটি রঙ আছে। তাহার ছয়টি রঙকে সিঁদুর শোষণ করিল এবং কেবল লাল রঙকে প্রতিফলিত করিল। সেই লাল রশ্মি যখন আমাদের চোখে পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, সিঁদুরটা লাল; সেইরূপ গাছের পাতাটা কেবল সবুজ রশ্মি প্রতিফলিত করে এবং অন্যান্য রঙ শোষণ করিয়া থাকে। সাদা কাগজ কোন রঙই শোষণ করে না; সাতটা রঙই উহা হইতে প্রতিফলিত হয়। সেই সাতটা রঙ একসঙ্গে মিলিয়া শ্বেত বর্ণের অনুভূতি জন্মাইয়া থাকে। কালো কালি বা কয়লা সাতটা রঙকেই শোষণ করে, কোন রঙ প্রতিফলিত করে না,

সেইজন্য উহা কালো। পদার্থবিদ্যার মতে, **সকল বর্ণের অভাবেই হইল কালো বর্ণ।**

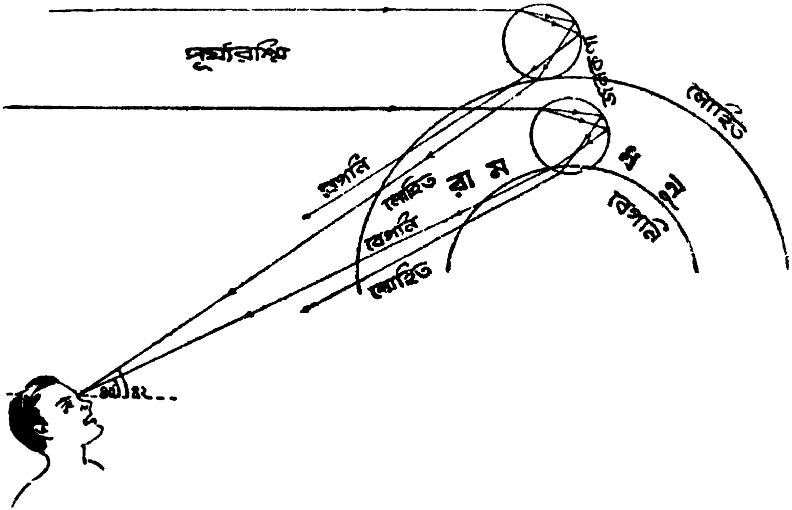
একটা ঘরে লাল আলোক আছে। সেখানে তুমি একটা লাল গোলাপ ফুল লইয়া গেলে। লাল ফুলটা লাল আলোক শোষণ করে না, আর সকল রঙের আলোক শোষণ করিয়া থাকে। সুতরাং উহা অধিকতর লাল দেখাইবে। এখন যদি ঘরের মধ্যে সবুজ আলোক দাও, তাহা হইলে ফুলটা সবুজ রশ্মি শোষণ করিয়া ফেলিবে। উহা হইতে আর কোন আলোক প্রতিফলিত হইবে না বলিয়া উহা তখন কালো দেখাইবে। ফুলটা যদি সাদা হয়, তাহা হইলে কি হইবে দেখা যাক ; যে পদার্থ সাদা দেখায় তাহা সাতটা রঙই প্রতিফলিত করিতে পারে, কোনটাকেই শোষণ করে না। কাজেই লাল আলোকের মধ্যে উহা দেখাইবে লাল এবং সবুজ আলোকে সবুজ দেখাইবে।

আকাশের রঙ (Colour of the Sky) : তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে যখন কোন জাহাজ সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া থাকে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউগুলি জাহাজের উপর আছাড় খাইয়া ফিরিয়া আসে (*i. e.* reflected) এবং বড় বড় ঢেউগুলি সোজা চলিয়া যায়। প্রায় তেমনি সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন আলোকমালায় (শ্বেত আলোক একটি মৌলিক আলোক নহে) ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আসিবার সময় তাহাদের গতি বায়ুতে ভাসমান অগণিত ধূলিকণা দ্বারা প্রতিহত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি (*i. e.* blue and violet waves) বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হইয়া পড়ে ; কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গগুলি (*i. e.* red waves) বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত না হইয়া ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি অর্থাৎ নীল ও বেগুনী তরঙ্গগুলির গতি ধূলিকণা দ্বারা প্রতিহত হইয়া বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হওয়ার দরুণ আকাশ নীল বলিয়া আমাদের নিকট পরিদৃশ্যমান হয়।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের রঙ (Colour of Sunrise and Sunset) : দুপুরের সূর্য্য সবচেয়ে আমাদের নিকটে থাকে, কিন্তু ইহা যখন দিগন্তের (horizon) দিকে হেলিয়া পড়ে বা থাকে (যেমন সূর্য্যাস্তের বা সূর্য্যোদয়ের সময়) তখন সূর্য্যরশ্মিকে বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের দূরত্ব বেশী অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকটে আসিতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি (*i. e.* violet, blue waves

etc.) বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত কেবল বৃহৎ তরঙ্গগুলি অর্থাৎ লাল আলোকমালার তরঙ্গগুলি অন্যান্য তরঙ্গমালা অপেক্ষা বেশী সংখ্যায় আমাদের নয়নগোচর হয়। সেইজন্য সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের রঙে অত লাল আভার ছড়াছড়ি।

রামধনু (Rainbow) **:** বায়ুমণ্ডলের ভাসমান জলকণাগুলি সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিসরিত, প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত করিয়া যে বর্ণালীর সৃষ্টি করে, তাহাকে আমরা **রামধনু** বলি। ভাসমান জলকণাগুলি এখানে প্রিজমের কাজ করে এবং এই কার্য্য করিবার জন্য জলকণাগুলি আকারে বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন ; বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে বা পরে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান জলকণাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় থাকে এবং তাই বৃষ্টির পূর্ব্বে বা পরে রামধনু দৃষ্ট হয়।



৯৬নং চিত্র—রামধনু

সূর্য্যরশ্মি প্রথমতঃ বারিবিন্দুতে প্রবেশ করিয়া প্রতিসরিত ও বিশ্লিষ্ট হয়। সূর্য্যরশ্মির বিশ্লেষণের কারণ এই যে সূর্য্যরশ্মি তির্য্যকভাবে জলবিন্দুর উপর পতিত হইলে লাল আলোর পথ সর্ব্বাপেক্ষা কম ও বেগুনি আলোর পথ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্ত্তিত হয়। প্রতিসরণ ও বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন রঙের রশ্মিগুলি জলবিন্দুর ভিতর পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় বায়ুতে বাহির হইয়া আসে এবং বাহির হইবার সময় আবার প্রতিসরিত ও বিচ্ছুরিত হয়।

সূর্য্যরশ্মির জলবিন্দুর ভিতর প্রতিফলনের কারণ এই যে কতক সূর্য্যরশ্মি জলকণাতে এমন দিকে প্রবেশ করে যে জলকণার অভ্যন্তরে উহাদের আপতন কোণ **সঙ্কট কোণ** অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী হয়। এই প্রতিফলনের ফলে সূর্য্যরশ্মির বিশ্লিষ্ট বর্ণগুলির ক্রমবিন্যাস উল্টাইয়া যায় এবং রামধনুতে উপর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে লোহিত, নারঙ্গ, পীত প্রভৃতি এবং সর্ব্বনিম্নে বেগুনি রঙ দেখা যায়।

জলবিন্দুগুলি হইতে প্রতিফলিত রশ্মি সূর্য্য হইতে আগত রশ্মির সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট কোণ উৎপন্ন করিলে বর্ণালী দেখা যায়। যে বিন্দুগুলি এইরূপ কোণ উৎপন্ন করে, তাহারা একটি বৃত্তের উপর সাজান থাকে বলিয়া রামধনু বৃত্তাকার দেখায়।

সূর্য্যরশ্মি জলকণায় একবার মাত্র প্রতিফলিত হইলে আমরা যে রামধনু দেখিতে পাই তাহা স্পষ্ট এবং ইহাকে **মুখ্য রামধনু** (Primary Rainbow) বলে; কিন্তু সূর্য্যরশ্মি যদি জলকণার মধ্যে দুইবার প্রতিফলিত হয় তবে আমরা মুখ্য রামধনুর ঠিক উপরে আর একটি **অস্পষ্ট রামধনু** (Secondary Rainbow) দেখিতে পাই, তাহাকে **গৌণ রামধনু** বলে এবং ইহার উপর দিকে বেগুনি ও নীচের দিকে লোহিত বর্ণ থাকে। সূর্য্যরশ্মি দুই বারের বেশী জলবিন্দুর ভিতর প্রতিফলিত হইলে আর আমরা স্পষ্ট রামধনু দেখিতে পাই না। রামধনু সাধারণতঃ, পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিম আকাশের গায়ে এবং অপরাহ্নে পূর্ব্বাকাশের গায়ে দেখা যায়। **সূর্য্য দিগন্ত হইতে খুব উঁচুতে থাকিলে রামধনু দেখা যায় না; সেই কারণে ঠিক দুপুরে রামধনু হয় না।** মনে রাখিও, রামধনু দেখিতে হইলে সূর্য্যকে পিছনে রাখিয়া সম্মুখে আমাদের রামধনু দেখিতে হইবে। কৃত্রিমভাবেও রামধনু তৈয়ারী করা যায়। প্রাতে বা বিকালে সূর্য্যকে পিছন দিকে রাখিয়া মুখে জল লইয়া উপরের দিকে ছিটকাইয়া দিলে দেখা যায়, ঐ বিক্ষিপ্ত জলকণায় সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া বিচিত্র বর্ণসমন্বয়ের অর্থাৎ রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে।

আলোকের স্বরূপ (Nature of Light): অতি প্রাচীনকাল হইতে পণ্ডিতেরা আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন। একদল বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল, আলোক অসংখ্য ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। দৃশ্যমান কোন দীপ্তময় পদার্থ অথবা সূর্য্য হইতে ঐ ক্ষুদ্র কণিকাগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া গ্যাসীয়, স্বচ্ছ তরল ও কঠিনের সমসত্ত্ব মাধ্যম এবং রিক্ত স্থানের ভিতর দিয়া তীব্র গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) সরল রেখায় আসিয়া **অক্ষিপটের** (retina) উপর ধাক্কা

দেয় এবং ফলে আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। এই মতবাদ **আলোক কণিকা-বাদ** (Corpuscular Theory of Light) নামে পরিচিত। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **নিউটন** (Newton) এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-জগতে আদর পাইয়াছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, ইহা আলোক সম্বন্ধে অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ নহে।

আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে ডাচ্ বৈজ্ঞানিক **হায়গেনসের** (Huyghens) মতবাদ এখন অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত। এই মত অনুসারে প্রত্যেক দীপ্ত পদার্থের একটা আণবিক কম্প আছে। সেই কম্পের বেগ চতুর্দ্দিকের ইথার* সমুদ্রে বড়-ছোট নানা প্রকার তরঙ্গের সৃজন করে। দীপ্ত পদার্থের চতুর্দ্দিকে সেই গোলীয় (spherical) তরঙ্গরাজি অতি দ্রুতবেগে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গগুলি কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে উহারা উত্তপ্ত হয়, আমাদের দেহ স্পর্শ করিলে আমরা গরম অনুভব করি। কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি দ্রব্যসামগ্রীর উপর পড়িয়া আলোকরূপে প্রতিভাত হয়; আমাদের চোখে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়। এই মতবাদ **আলোক তরঙ্গবাদ** (Wave Theory of Light) নামে পরিচিত। আলোক কণিকাবাদ আলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় নাই তাহা আলোক তরঙ্গবাদ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক **ম্যাক্সওয়েল** (Maxwell) গাণিতিক কারণ বশতঃ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আলোক তরঙ্গ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক **হার্জ্জ** (Hertz) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আলোক তরঙ্গকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ মনে করেন।

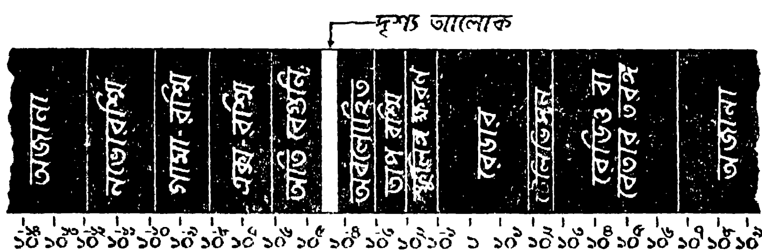
বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক **প্ল্যাঙ্ক** (Plank) বিবিধ পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিলেন যে, তাপশক্তির বিকিরণ ও শোষণ একটানা ধারাবাহিকভাবে ঘটে না—বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ডে খণ্ডে ঘটে। ইহাই **কোয়ান্টমবাদ** (Quantum

* এই ইথার জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে এমন কি, মহাশূন্যের মধ্যেও বিশ্বব্যাপিয়া বিদ্যমান। ইহা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, ভারহীন ও ইন্দ্রিয়াতীত। ইথারের অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞানীদের এক প্রকার মানস-সৃষ্টি। ইথারকে মানিয়া লইলে বিকীর্ণ শক্তির অনেক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া যায়।

Theory) নামে পরিচিত। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** (Einstein) এই মতবাদ গ্রহণ করিলেন এবং আলোক শক্তি ও অন্যান্য বিকীর্ণ শক্তির বেলায় যে ইহা প্রযোজ্য তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোক সম্বন্ধে কতকগুলি ঘটনার মীমাংসা করিতে প্রয়োজন তরঙ্গবাদের এবং কতকগুলির জন্য প্রয়োজন কণিকাবাদের অর্থাৎ বিকীর্ণ শক্তির দ্বৈতভাব—তরঙ্গ ও কণিকা—স্বীকার করিতে হয় এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহাই মানিয়া লইয়াছেন।

বিকীর্ণ শক্তি (Radiant Energy): ইথার তরঙ্গের মাধ্যমে যে শক্তি পরিচালিত হয় তাহাকে **বিকীর্ণ শক্তি** বলে। সমুদ্রে বা নদীবক্ষে যেমন ছোট বড় তরঙ্গ উত্থিত হয় তেমনি ইথার সমুদ্রে ছোট-বড় তরঙ্গ উত্থিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের (wave length) উপর বিকীর্ণ শক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ·০০০০৪ সেঃ মিঃ হইতে ·০০০০৭ সেঃ মিঃ মধ্যে থাকে তখন বিকীর্ণ শক্তি আলোক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্বেত আলোক বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমষ্টি। বিভিন্ন বর্ণের আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। লাল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·০০০০৭ সেঃ মিঃ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হইতে কম হইতে থাকে



৯৭নং চিত্র—বিকীর্ণ শক্তির প্রকৃতি

তখন আমরা ক্রমশঃ অতি বেগুনি রশ্মি (ultra violet ray), এক্স-রশ্মি (X-ray), গামা-রশ্মি (Gamma-ray), নভোরশ্মি (Cosmic-ray) ইত্যাদি অঞ্চলে আসিয়া পড়ি। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ·০০০০৮ সেঃ মিঃ হইতে ·০৩২ সেঃ মিঃ মধ্যে থাকে অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কিছু বেশী হয় তখন বিকীর্ণ শক্তি তাপশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন তাপশক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বাড়িতে থাকে

তখন ক্রমশঃ আমরা রেডার (Radar), টেলিভিসন (Television), রেডিও (Radio) ইত্যাদিতে যে সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ব্যবহার হয় সেই সমস্ত অঞ্চলে আসিয়া পড়ি। বিকীর্ণ তাপশক্তি ও আলোকশক্তি বিকীর্ণ শক্তির একটি অংশ মাত্র।

Questions

1. Show by suitable experiments that light travels in a straight line.
2. Explain with the aid of diagrams the different types of shadows that may be formed.
3. Explain by means of suitable diagrams the occurrence of lunar and solar eclipses.
4. What do you mean by reflection of light ? State the laws of reflection and verify them experimentally.
5. What is meant by the image of an object ? Distinguish between real and virtual image.
6. Draw a diagram showing how an image is formed in a plane mirror and prove that the object and its image are at equal distance from the mirror.
7. What do you mean by refraction of light ? State the laws of refraction and verify them experimentally.
8. What do you mean by the term critical angle and total reflection ? Explain clearly why smoked ball, on being introduced in a beaker of water, appears silver white.
9. Explain the formation of mirage.
10. Distinguish carefully between the following terms as applied to spherical mirror : (a) focus, (b) focal length, (c) radius of curvature, (d) centre of curvature, (e) pole.
11. Draw diagrams to illustrate the formation of (i) real image, (ii) virtual image by a concave mirror.
12. What is a lens ? Explain the following terms : (a) Principal focus, (b) Focal length, (c) Optical centre, (d) Principal axis.
13. Draw diagrams to illustrate the formation of (i) real image. (ii) virtual image by a convex lens.

14. What do you mean by dispersion of light? Why is the light dispersed?
15. Explain the phenomena of rainbow. 'A rainbow is not visible at noon'—why?
16. Describe a photographic camera and explain its working principle.
17. Explain the principles of a magnifying glass and a burning glass.
18. Describe a human eye.
19. What do you mean by defects of the eye? How can they be remedied by the use of lens?
20. Discuss the nature of light. What do you mean by Radiant Energy?

চতুর্থ অধ্যায়

তাপ (*Heat*)

তাপ (Heat)**:** উত্তপ্ত লৌহ হাতে গরম লাগে, বরফ হাতে ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা-গরম বোধ সকলেরই আছে। একটি পাত্রে ঠাণ্ডা জল লইয়া উহুনে চাপাইলে কিছুক্ষণ পরে উহা গরম হইয়া যায়। **যে বাহ্যিক কারণের প্রভাবে ঠাণ্ডা জিনিস গরম হয় তাহাকে তাপ বলে।** তাপে জল বাষ্প হয়। বাষ্পের চাপে রেল ইঞ্জিনের চাকা ঘোরে। চাকার এই গতিশক্তি আসে তাপ হইতে। সুতরাং **তাপ এক প্রকার শক্তি**।

সকল বস্তুতেই তাপ আছে। ঠাণ্ডা বস্তুতে তাপ নাই মনে করা ভুল। গ্যাসীয় বায়ুকে শৈত্যের দ্বারা তরল করা যায়। তরল বায়ু বরফ অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। এক কেট্‌লি তরল বায়ুকে একচাপ বরফের উপর বসাইয়া রাখিলে, উহুনের উপর জল ফোটার ন্যায় উহা ফুটিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায় তাপ বরফ হইতে তরল বায়ুতে যাইতেছে।

তাপের উৎস (Sources of Heat)**:** তাপের (১) প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। সূর্য্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত তাপ সংগ্রহ করি; (২) দ্বিতীয় উৎস ভূগর্ভ; (৩) তৃতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া**:** অম্লজান ও

উদজানের মিলনের সময় প্রভূত তাপ উৎপন্ন হয়; (৪) চতুর্থ তড়িৎ: তাড়িত শক্তি সরু তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে তার উত্তপ্ত হইয়া উঠে; (৫) পঞ্চম ঘর্ষণাদি বাহ্যিক ক্রিয়া: দুইটি কঠিন পদার্থ ঘর্ষণ করিলে তাপ উৎপন্ন হয়।

সূর্য্যোত্তাপের ক্রিয়া (Effect of Sun's heat): পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাপের প্রধান ও মূল উৎস সূর্য্য। পৃথিবীর উপর এই উত্তাপের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

সূর্য্য একটি অগ্নিময় প্রচণ্ড গোলক। অসীম তেজোরাশি ইহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া সৌরজগতের চতুর্দ্দিকে অবিরত বিকীর্ণ হইতেছে। সেই বিকীর্ণ শক্তির পথে থাকিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি তাহার কিয়দাংশ গ্রহণ করিতেছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া সূর্য্যোত্তাপের অতি সামান্য অংশ পাইতেছে। উহারই ফলেই পৃথিবীপৃষ্ঠে ঋতু পরিবর্ত্তন, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপ না পাইলে পৃথিবীতে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থমাত্রই জমিয়া কঠিন হইত। সেরূপ অবস্থায় কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারিত না। তোমরা জান, **সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ ভিন্ন উদ্ভিদ্ তাহার খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রাণীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ্ ভোজন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কাজেই প্রাণী ও উদ্ভিদের পক্ষে সূর্য্যের উত্তাপ একান্ত প্রয়োজনীয়।** আমরা কয়লা, কাঠ, কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালাইয়া যে উত্তাপ উৎপন্ন করি, তাহাও ঐ সূর্য্যের শক্তি। আমাদের অগোচরে সৌরশক্তি ঐ সকল দ্রব্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের উত্তাপের সাহায্যে জল বাষ্প হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। সেই জলীয় বাষ্প জমিয়া শিশির, কুয়াশা, তুষার, শিলা ও বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া ভূমির উর্ব্বরতা সাধন করে। উহার কতকটা মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ঝরণার আকারে বাহির হয়। ঝরণা এবং উচ্চ পর্ব্বতের তুষার গলা জলে নদ-নদীর সৃষ্টি হয়। জলস্রোত উচ্চভূমি হইতে মাটি বাহিয়া আনিয়া স্থলভাগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর উপর সূর্য্যের উত্তাপের ক্রিয়া সামান্য নহে।

তাপের স্বরূপ (Nature of Heat): পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, তাপ 'ক্যালোরিক' (caloric) নামক একপ্রকার অদৃশ্য ওজনশূন্য জিনিস। ইহা পদার্থের আণবিক ফাঁকের মধ্যে অবস্থান করে এবং উষ্ণ পদার্থ হইতে ক্যালোরিক

শীতল পদার্থে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **ক্যালোরিক মতবাদ** (Caloric Theory) বলে। প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। জার্ম্মাণীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের যুদ্ধমন্ত্রী কাউণ্ট রামফোর্ড (Count Rumford) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই মতবাদ খণ্ডন করেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন, পিতলের কামানে ভোঁতা তুরপুণ (drill) দ্বারা ছিদ্র করার সময় এত তাপ উৎপন্ন হয় যে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়া যায়। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঘর্ষণ প্রক্রিয়ায় এই তাপ উৎপন্ন হয়। ইহার পর বৈজ্ঞানিক ডেভি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, বায়ুশূন্য পাত্রে দুই খণ্ড বরফ ঘষিলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে বরফ গলিয়া যায়। এই সকল পরীক্ষা ও অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তাপ এক প্রকার শক্তি। আধুনিক মতে অণুর গতীয় শক্তি হইতে তাপ উদ্ভূত হয়। অণুর গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে পদার্থে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থকে উষ্ণ করার অর্থ অণুর গতীয় শক্তি বৃদ্ধি করা। ইহাই তাপের **গতীয় মতবাদ** (Dynamic Theory) নামে পরিচিত।

উষ্ণতা (Temperature) **:** তাপ ও উষ্ণতা একার্থজ্ঞাপক নহে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, প্রত্যেক বস্তুর তাপ আছে। একপাত্র উত্তপ্ত জলে যদি খানিকটা ঠাণ্ডা জল মিশান হয় তবে পাত্রের মধ্যেকার মোট তাপের পরিমাণ বাড়িবে কারণ ঠাণ্ডা জলেও খানিকটা তাপ আছে। এখন পাত্রের জলে হাত ডুবাইলে দেখিবে যে পাত্রের জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে আমাদের গরম-ঠাণ্ডার অনুভূতি বস্তুর সঞ্চিত মোট তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। যাহার উপর নির্ভর করে তাহাকে উষ্ণতা বলা হয়। একটি বস্তু অন্য একটি বস্তুর সংস্পর্শে থাকিলে একটি হইতে অন্যটিতে তাপ প্রবাহিত হইতে পারে (যদি না উষ্ণতা তাহাদের সমান থাকে)। যে বস্তু হইতে তাপ বাহির হয় তাহার উষ্ণতা বেশী, যে বস্তুটি তাপ গ্রহণ করে তাহার উষ্ণতা কম। **উষ্ণতা বস্তুর তাপ সম্বন্ধীয় বা তাপীয় একটি অবস্থা** (thermal condition) **যাহা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়, বস্তুটি সংস্পৃষ্ট বস্তুকে তাপ প্রদান করিবে না নিজে তাহা হইতে তাপ গ্রহণ করিবে।**

একখানি লোহার থালাকে জলন্ত উনুনের উপর এক মিনিটকাল রাখিয়া সরাইয়া লও ; ঐ উনুনের উপর এক বাল্‌তি জল ঠিক এক মিনিটকাল রাখিয়া

নামাইয়া লও। লোহার থালা ও জল স্পর্শ করিয়া দেখ, থালাখানি জল অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হইয়াছে। অথচ ঐ থালা ও জল একই সময় ব্যাপিয়া উনুনের একই উত্তাপ পাইয়াছে। থালাখানি ঐ জলের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া দেখ, থালার উষ্ণতা একটু কমিয়াছে এবং জলের উষ্ণতা একটু বাড়িয়াছে। অর্থাৎ থালা হইতে খানিকটা তাপ জলে আসিয়াছে। কতক্ষণ আসিবে? যতক্ষণ না উভয়ের উষ্ণতা সমান হইবে। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা যায় যে (১) **সমপরিমাণ তাপ দুইটি জিনিসে প্রয়োগ করিলেও তাহাদের উষ্ণতা সমানভাবে বাড়ে না** ও (২) **গরম জিনিস হইতে তাপ সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা জিনিসে চলিয়া আসে।**

তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য ঃ (Distinction between Heat and Temperature): তাপ ও উষ্ণতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইলেও উহারা একার্থজ্ঞাপক নহে। উহাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ঃ (১) তাপ হইল কোন বস্তুতে এই শক্তির মোট পরিমাণ। উষ্ণতা হইল সেই বস্তুর একটি বিশেষ তাপীয় অবস্থা (thermal condition) যাহা তাপ-প্রবাহ (flow of heat) নিয়ন্ত্রণ করে। এক বালতি গরম জলে মোট তাপশক্তি যত আছে তাহা অপেক্ষা একটি উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে মোট তাপশক্তি কম থাকিতে পারে কিন্তু লৌহখণ্ডের উষ্ণতা বালতির জলের উষ্ণতা অপেক্ষা বেশী হইলে লৌহখণ্ডটিকে বালতির জলে রাখিলে তাপ লৌহখণ্ড হইতে বালতির জলে প্রবাহিত হইবে। লৌহখণ্ডের উষ্ণতা কমিয়া বালতির জলের উষ্ণতা বাড়িয়া উভয়ের উষ্ণতা সমান হইবে। কিন্তু এই অবস্থাতেও উভয়ের তাপশক্তি অসমান থাকিতে পারে। (২) যখন কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করে তখন তাহার তাপমাত্রা বর্দ্ধিত হয় এবং যখন তাপ ছাড়িয়া দেয় তখন তাহার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ তাপকে কারণ (cause) বলিয়া অভিহিত করা যায় এবং তাপমাত্রা হইল ইহার ফল (effect)। (৩) তাপ ও উষ্ণতা তরল পদার্থের পরিমাণ ও উহার তলের (level) সহিত তুলনীয়। আমরা জানি উচ্চ তলে অবস্থিত কম পরিমাণ তরলের সহিত নিম্নতলে অবস্থিত বেশী পরিমাণ তরলের সংযোগ স্থাপন করিলে তরল উচ্চতল হইতে নিম্নতলে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ তরলের প্রবাহ উচ্চতার উপর নির্ভর করে পরিমাণের উপর নয়। সেইরূপ দুইটি বস্তুতে তাপের পরিমাণ যাহাই হউক, তাপ অধিক উষ্ণতার বস্তু হইতে কম উষ্ণতার বস্তুতে প্রবাহিত হয়। একই উষ্ণতায়

থাকিলে তাপ-প্রবাহ সম্ভব নহে। কোন বস্তুতে মোট তাপ উহার ভর ও উষ্ণতার উপর নির্ভর করে।

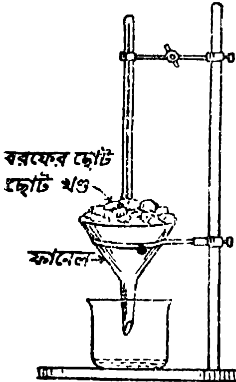
তাপমান যন্ত্র বা থার্ম্মোমিটার (Thermometer): তিনটি পাত্রে জল আছে। প্রথমটির জল ঠাণ্ডা, দ্বিতীয়টির জল অল্প গরম এবং তৃতীয়টিতে বেশ গরম জল আছে। তৃতীয় পাত্রের জলে প্রথমে তোমার হাত ডুবাও, তারপর ঐ হাত দ্বিতীয় পাত্রে ডুবাইলে তুমি বলিবে, এই জল ঠাণ্ডা। আবার প্রথম পাত্রের ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবানোর পর দ্বিতীয় পাত্রে হাত ডুবাও। এবার কি বলিবে? নিশ্চয় বলিবে যে দ্বিতীয় পাত্রের জল গরম। কাজেই দেখ, তুমি একই জলকে একবার বলিতেছ গরম একবার বলিতেছ ঠাণ্ডা। **সুতরাং আমাদের স্পর্শশক্তি দ্বারা পদার্থের উষ্ণতা** (temperature) **ঠিক করিয়া বলা যায় না**। সেই কারণে পদার্থের উষ্ণতা মাপিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহার নাম **তাপমান যন্ত্র** বা **থার্ম্মোমিটার**। উত্তাপের পরিমাণ ভেদে তরল বস্তুর আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই নিয়ম অবলম্বনে এই যন্ত্রটি গঠিত।



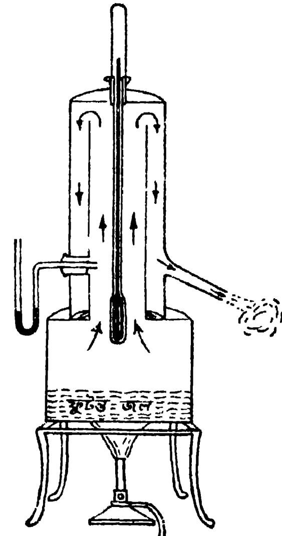
১৮নং চিত্র—থার্ম্মোমিটার

থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণ প্রণালী (Construction of thermometer): আগাগোড়া সমান সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কাচের নলকে বুন্‌সেন বাতির সাহায্যে উত্তাপ দিয়া টানিয়া একটি কৈশিক নলে (capillary tube) পরিণত কর; ইঞ্চি পাঁচেক পরিমাণ এই কৈশিক নলের এক প্রান্ত গলাইয়া একটা বাল্‌ব (bulb) প্রস্তুত করিয়া লও; পরে ঐ নলটিকে তাপের সাহায্যে পরিষ্কার ও শুষ্ক করিয়া উহার মুখ খানিকটা পারদের মধ্যে ডুবাইয়া দাও। সাধারণতঃ ঐ কৈশিক নল দিয়া পারদ ভিতরের বাল্‌বে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু নীচের বাল্‌বের বাহিরে খানিকটা উত্তাপ দিলে নলের বায়ু প্রসারিত হইয়া নল-মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। পরে বাল্‌বটি ঠাণ্ডা হইলে ভিতরের বায়ু সঙ্কুচিত হইবে এবং অপর মুখটি যদি এতক্ষণ পারদের পাত্রের মধ্যে ডুবান থাকে তবে দেখিবে, খানিকটা পারদ এবার কৈশিক নল দিয়া বাল্‌বটিতে পৌঁছিয়াছে। এইরূপে বাল্‌বটিকে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা করিলে (নলের অপর মুখটি সর্ব্বক্ষণই পারদ পাত্রে নিমজ্জিত রাখিতে হইবে) বাল্‌বটি

পারদ-পূর্ণ হইয়া যাইবে। উহাকে এমনভাবে পারদ-পূর্ণ কর যাহাতে বাল্‌বটি ভর্ত্তি হইয়া খানিকটা পারদ কৈশিক নলের মধ্যে অবস্থান করে। এক্ষণে বাল্‌বটিকে গরম কর যতক্ষন না পারদ ফোটে ; নলের ভিতর এবং পারদের মধ্যে যত বায়ু ছিল তাহা বাহির হইয়া যাইবে এবং ঐ সমগ্র কৈশিক নলটি এখন শুধু পারদের বাষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ঠিক এই অবস্থায় নলের খোলা মুখটি তাপ দিয়া ভালভাবে বন্ধ করিয়া দাও। এই যন্ত্রটি এখন **থার্ম্মোমিটারের** রূপ গ্রহণ করিল। এক্ষণে এই যন্ত্রটির **তাপমাত্রা** (gradation) নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার জন্য যন্ত্রটির বাল্‌ব ও কৈশিক নলের কিছু অংশ প্রথমে ফানেলস্থিত গলমান ছোট ছোট খণ্ড বরফের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাপ হারাইয়া তাপমান যন্ত্রে পারদ সঙ্কুচিত হয় এবং পারদ সূত্রটি ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে। নামিতে নামিতে যে স্থানে পারদ সূত্র স্থির হইয়া দাঁড়ায়, সেইখানে একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগই তাপমান যন্ত্রের **আধোবিন্দু** (Lower Fixed Point) এবং ইহা বরফের গলনাঙ্ক বা দ্রবণাঙ্ক (Melting Point) বা জলের হিমাঙ্ক (Freezing Point) নির্দ্দেশ করে (৯৯নং চিত্র দেখ)।



৯৯নং চিত্র—থার্ম্মোমিটারের অধোবিন্দু নির্ণয়করণ



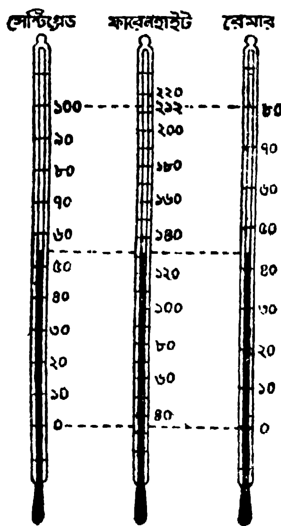
১০০নং চিত্র—হিপসোমিটারের সাহায্যে থার্ম্মোমিটারের উর্দ্ধবিন্দু নির্ণয়করণ

তারপর তাপমান যন্ত্রটিকে **হিপোসোমিটার** (Hypsometer) নামক একটা স্ফুটন্ত জলের আধারে প্রবেশ করান হয়। জলের বাষ্প যন্ত্রটির অঙ্গে লাগিয়া

উহাকে উত্তপ্ত করে। তাপ পাইয়া পারদ সূত্র ক্রমশঃই উপর দিকে উঠিতে থাকে। এই পারদ সূত্র যে পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায় সেইখানে আর একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগই তাপমান যন্ত্রের **ঊর্দ্ধবিন্দু** (Upper Fixed Point) এবং ইহা জলের স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point) নির্দ্দেশ করে (১০০নং চিত্র দেখ)।

এই দুই দাগ পাওয়ার পরে উহার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি অনুযায়ী কতকগুলি সমান ভাগে (equal divisions) ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগের নাম **ডিগ্রী**। অঙ্কের মাথায় একটি ছোট শূন্য বসাইয়া একটি ডিগ্রী জানান হয়। এইরূপে যে যন্ত্রটি প্রস্তুত হইল তাহাকে তাপমান যন্ত্র বা থার্ম্মোমিটার বলে।

উষ্ণতা পরিমাপের পদ্ধতি (Scales of temperature) : উষ্ণতা পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি চলিত আছে : (১) সেণ্টিগ্রেড্ (Centigrade), (২) **ফারেনহাইট্** (Fahrenheit) ও (৩) **রেমার** (Reaumur)। সেণ্টিগ্রেড্ স্কেলে অধোবিন্দু ও ঊর্দ্ধবিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের নাম ডিগ্রী। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতিতে সেণ্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটারই ব্যবহৃত হয়। ফারেনহাইট্ স্কেলে মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়; কিন্তু ইহার অধোবিন্দুর নিকট ৩২° ডিগ্রী ও ঊর্দ্ধবিন্দুর নিকট ২১২° ডিগ্রী লেখা হয়। ইহা ইংলণ্ড ও ইংরেজ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচলিত। পরীক্ষকগণ আবহাওয়ার উষ্ণতা সাধারণতঃ এই স্কেলেই প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দুই প্রকার স্কেলের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে ১° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড



১০১নং চিত্র—উষ্ণতা পরিমাপের বিবিধ পদ্ধতি

$=\frac{১৮০^\circ}{১০০^\circ}=\left(\frac{৯}{৫}\right)^\circ$ ফারেনহাইট্। সুতরাং সেণ্টিগ্রেড্ হইতে ফারেনহাইট্ অথবা

ফারেনহাইট্ হইতে সেন্টিগ্রেড্ স্কেলে যাওয়া কিছু কঠিন নহে। মনে কর, কোন একটি পদার্থের উষ্ণতা ৪০° C এবং ঐ উষ্ণতাকে ফারেনহাইট্ স্কেলে প্রকাশ করিতে হইবে।

$$৪০^{\circ} C = (৪০ \times \frac{৯}{৫}) + ৩২ = ১০৪^{\circ}F$$

$$\text{তেমনি, } ১০৪^{\circ}F = (১০৪ - ৩২) \times \frac{৫}{৯} = ৪০^{\circ}C।$$

রেমার স্কেলে সর্ব্বনিম্ন দাগকে 0° ডিগ্রী ও সর্ব্বোচ্চ দাগকে ৮০° ডিগ্রী ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। এই স্কেল রুশদেশের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয় এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে ইহার প্রচলন আছে।

নিম্নে বিবিধ পদ্ধতির একটা ছক দেওয়া হইল

পদ্ধতি	গলন্ত বরফের উষ্ণতা বা জলের হিমাঙ্ক	ফুটন্ত জলের উপরিস্থিত বাষ্পের উষ্ণতা বা জলের স্ফুটনাঙ্ক	মধ্যবর্ত্তী স্থান কত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে
সেন্টিগ্রেড	0°	১০০°	১০০
ফারেনহাইট্	৩২°	২১২°	১৮০
রেমার	0°	৮০°	৮০

ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার (Clinical thermometer): ডাক্তারগণ জ্বর দেখিবার জন্য যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করেন তাহাকে ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার বলে (১০২নং চিত্র দেখ)। ইহাতে ফারেনহাইট্ স্কেল আছে; তবে মনুষ্যদেহে তাপের মাত্রা বেশী উঠানামা করে না বলিয়া উহাতে ৯৫ অঙ্ক হইতে ১১০ অঙ্ক পর্য্যন্ত দাগ কাটা থাকে। এই যন্ত্রের পারদ গোলক ও ফাঁপা নলের সংযোগস্থলের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম। ফলে পারদ তাপযোগে বাড়িয়া গেলে উহা আর আপনা হইতে

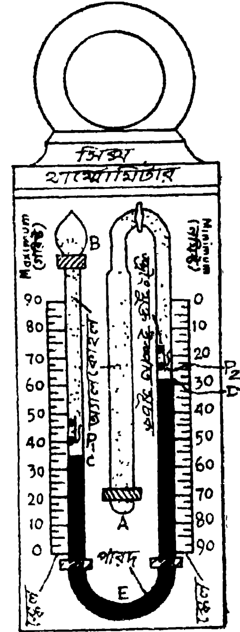
গোলকের মধ্যে পড়িয়া যাইতে পারে না; ঝাঁকি দিয়া নামাইতে হয়। এইজন্য শরীরের উত্তাপ হইতে যন্ত্রটিকে বাহির করিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার পারদ স্থত্র নামিয়া যায় না এবং সহজে পড়া যায়।



১০২নংচিত্র—ক্লিনিকাল থার্ম্মোমিটার

গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্ম্মোমিটার (Maximum and Minimum Thermometer): আবহাওয়া নির্ণয়ের কাজে বা অন্য কোন কারণে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সারা দিন-রাত্রিতে উষ্ণতা সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন কতদূর হয় তাহা জানা দরকার হয়। কোন ব্যক্তির পক্ষে দিনরাত্রি বসিয়া উষ্ণতার উঠানামা লিপিবদ্ধ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। সেইজন্য এই উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয়। থার্ম্মোমিটার দেখিয়াই উষ্ণতা কতদূর উঠিয়াছিল বা নামিযাছিল তাহা জানা যায়। সর্ব্বোচ্চ উষ্ণতা মাপিবার জন্য যে থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয় তাহাকে **গরিষ্ঠ থার্ম্মোমিটার** (Maximum Thermometer) ও সর্ব্বনিম্ন উষ্ণতা মাপিবার জন্য যে থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয় তাহাকে **লঘিষ্ঠ থার্ম্মোমিটার** (Minimum Thermometer) বলে। **সিক্সের থার্ম্মোমিটার** (Six's Thermometer) গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্ম্মোমিটার সমবায়ে গঠিত। নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইল। একটি আগাগোড়া সমান ছিদ্রবিশিষ্ট U-কাচনলের একটি প্রান্তে দীর্ঘ বাল্ব A ও অপর প্রান্তে ছোট বাল্ব B আছে। A বাল্ব ও উহার সহিত সংযুক্ত U-কাচনলের D পর্য্যন্ত অ্যালকোহলে পূর্ণ। D হইতে U-কাচনলের অপর বাহুর C পর্য্যন্ত পারদে পূর্ণ। C হইতে বাকী U-কাচনলের অংশ ও B বাল্বের কিছু অংশ অ্যালকোহলে পূর্ণ। B বাল্বের বাকী অংশে অ্যালকোহলের বাষ্প থাকে। থার্ম্মোমিটারের তরল প্রসারিত হইলে অ্যালকোহল এই বাল্বে আসিযা স্থান দখল করে। পারদ-স্তম্ভের দুই প্রান্তের উপরে দুইটি ইস্পাতের স্থচক P_1 ও P_2 ভাসে। দুইটি স্প্রিং স্থচক দুইটিকে কাচনলের গায়ে চাপিয়া ধরে। ঘর্ষণে ইহা কাচনলের গায়ে আটকাইয়া যায়। বাহির হইতে চুম্বক সাহায্যে স্প্রিং যুক্ত ইস্পাতের স্থচক দুইটিকে পারদের পৃষ্ঠের সংস্পর্শে রাখা হয়। কাচনলের দুই বাহুতে দুইটি স্কেল আছে। C বাহুর স্কেলে নীচ হইতে উপর দিকে অংশাঙ্কন বাড়ে ও D বাহুর স্কেলে উপর হইতে নীচের দিকে অংশাঙ্কন বাড়ে।

যখন উষ্ণতা বাড়ে তখন A বাল্‌বের অ্যালকোহলের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পারদস্তম্ভের D প্রান্তকে নিম্নের দিকে ঠেলে। সুতরাং পারদস্তম্ভের C প্রান্ত উহার উপরিস্থিত অ্যালকোহলকে ঠেলিয়া (B বাল্‌বের খালি অংশে ঐ অ্যালকোহল স্থান লয়) উপরে উঠে এবং ফলে উহার সংলগ্ন P_1 সূচকটি উপরে উঠে কিন্তু P_2 সূচকটি যথাস্থানেই থাকিয়া যায়। যখন উষ্ণতা কমে তখন A বাল্‌বের অ্যালকোহলের সঙ্কোচনের ফলে উহার আয়তন হ্রাস পায় এবং ফলে পারদস্তম্ভের D প্রান্ত উপরে উঠে। উহার সংলগ্ন P_2 সূচকটিও ইহার ফলে উপরে উঠে কিন্তু P_1 সূচকটি যথাস্থানেই থাকিয়া যায়। P_1 সূচকের অবস্থান সর্ব্বোচ্চ বা গরিষ্ঠ উষ্ণতার ও P_2 সূচকের অবস্থান সর্ব্বনিম্ন বা লঘিষ্ঠ উষ্ণতার নির্দ্দেশ দেয়। প্রতিটি পর্য্যবেক্ষণের পর থার্ম্মোমিটারকে স্বাভাবিক অবস্থাতে আনিয়া আবার ব্যবহার করা হয়।



১০৩নং চিত্র—
সিক্স থার্ম্মোমিটার

থার্ম্মোমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় কেন (Why mercury is chosen in the construction of a thermometer)?—তোমরা জান যে তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থের বৃদ্ধি খুবই কম হয়; এজন্য কঠিন পদার্থ দিয়া থার্ম্মোমিটার তৈয়ার করা চলে না। আবার তাপ প্রযোগে গ্যাসীয় পদার্থের আযতন খুবই বেশী বৃদ্ধি পায এবং উহার আয়তন-বৃদ্ধি চাপের উপর নির্ভর করে। কাজেই গ্যাসীয় পদার্থের সাহায্যে থার্ম্মোমিটার তৈয়ার করা সুবিধাজনক নহে; এজন্য থার্ম্মোমিটারে তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থের মধ্যে পারদ ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধাজনক কারণ: (১) পারদের স্ফুটনাঙ্ক ৩৬০° সেণ্টিগ্রেড্ এবং হিমাঙ্ক —৩৯° সেণ্টিগ্রেড্। সুতরাং পারদ ব্যবহার করিলে তাপমাত্রার অনেক ব্যবধান পর্য্যন্ত মাপা যায়; জলের ক্ষেত্রে এ সুবিধা নাই। (২) পারদের প্রসারণ সমানভাবে হয়। (৩) পারদের তাপ পরিচলন শক্তি অধিক বলিয়া উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে পারদ অল্প সময়েই ঐ বস্তুর সমান উত্তপ্ত হয। (৪) পারদ সহজেই বিশুদ্ধ অবস্থায়

পাওয়া যায় এবং ইহা চক্‌চকে অস্বচ্ছ তরল পদার্থ বলিয়া উহার অবস্থান সহজেই ও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। (৫) পারদ নলের গায়ে লাগিয়া থাকে না।

থার্মোমিটারের ব্যবহার (Uses of a thermometer) : থার্মোমিটারের প্রধান ব্যবহার উষ্ণতা পরিমাপে। কোন স্থানের আবহাওয়ার উষ্ণতা মাপিবার জন্য নানা প্রকারের থার্মোমিটার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন স্থানের উচ্চতা মাপিবার জন্যও এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব। সাধারণতঃ ৩০০ ফুট উপরে উঠিলে থার্মোমিটারের ১° ডিগ্রী উত্তাপের পতন হয়। কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং যাইলে দেখিবে যে, থার্মোমিটারের প্রায় ২০° ডিগ্রী পতন হইযাছে। সুতরাং মোটামুটিভাবে দার্জ্জিলিং ৩০০ × ২০ = ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

জড় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া
(Effect of Heat on Matter)

১। **তাপ প্রয়োগে জড় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায়; তাপ কমাইলে আয়তনের সঙ্কোচন হয়।** কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের উপর উত্তাপের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিব।

২। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে; তাপ কমাইলে উহার উষ্ণতা কমিয়া যায়।** খানিকটা জলে তাপ দাও। উহা গরম হইল। এখন একবার ঠাণ্ডা জলে হাত দাও এবং তারপর ঐ গরম জলটায় হাত দাও। দেখ, উহাদের উষ্ণতায় প্রভেদ আছে।

৩। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থাগত পরিবর্ত্তন ঘটে।** কঠিন বরফ গলিয়া জল হয এবং জল গ্যাসীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া থাকে। জলীয বাষ্প হইতে তাপ বাহির করিয়া লইলে উহা প্রথমে তরল জলে এবং তারপর কঠিন বরফে পরিণত হয়।

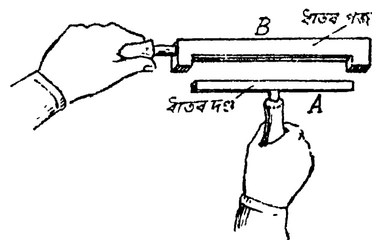
৪। **তাপ প্রয়োগে পদার্থের কতকগুলি বাহ্যিক গুণের পরিবর্ত্তন হয়**—যথা স্থিতিস্থাপকতা, দ্রবণ-ক্ষমতা, তাপ ও তাড়িত পরিবহন ক্ষমতা, চৌম্বকত্ব ইত্যাদি। অনেক পদার্থকে খুব বেশী উত্তপ্ত করিলে ভাস্বর হইয়া উঠে ও আলোক

বিকিরণ করিতে থাকে। ইহাকে **ভাস্বরতা** (Incandescence) বলে। চূণকে যখন অক্সি-হাইড্রোজেন অগ্নিশিখায় খুব বেশী উত্তপ্ত করা হয় তখন উহা ভাস্কর হইয়া উঠে ও আলোক বিকিরণ করে। চূণকে ঐরূপ উত্তপ্ত করার দরুণ উহার কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না। বহু ক্ষেত্রে উত্তাপ যোগে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়—যেমন ম্যাগনেসিয়াম, কয়লা প্রভৃতি বস্তুর দহন। এখানে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সহ ভাস্বরতা পরিলক্ষিত হয়।

৫। **তাপ প্রয়োগে অনেক পদার্থের রাসায়নিক অর্থাৎ গঠনমূলক পরিবর্ত্তন ঘটে।** ধানকে উত্তপ্ত করিলে খই হয়। একখণ্ড কাষ্ঠে তাপ প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ উহা কালো কয়লায় পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পরে উহা পুড়িতে থাকে অর্থাৎ বাতাসের অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। তাপ প্রয়োগে ধান ও কাষ্ঠের স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিল।

কঠিন পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on solid bodies) **: তাপ প্রয়োগে** কঠিন পদার্থের উপর এই তিনটি প্রভাব সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ**, তাপের প্রভাবে কঠিন পদার্থগুলি গরম হয় বা তাহাদের **উষ্ণতা** বাড়ে। সূর্য্যতাপে মাটি ও বালি কি রকম উত্তপ্ত হয় তাহা তোমরা সকলেই জান। **দ্বিতীয়তঃ,** তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের **অবস্থার পরিবর্ত্তন** হয় অর্থাৎ কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়—যেমন বরফের জলে পরিণত হওয়া —তাহা তোমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছ। **তৃতীয়তঃ,** তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয়—দৈর্ঘ্যে (length), ক্ষেত্রফলে (area) ও আয়তনে (volume)।

তাপ প্রয়োগ করিলে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

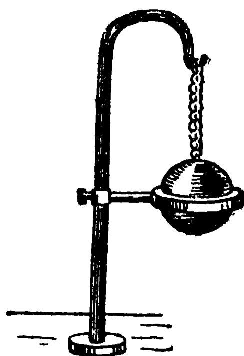


১০৪নং চিত্র—তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় তাহার পরীক্ষা

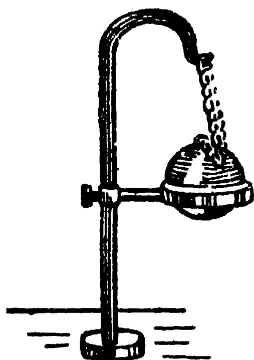
প্রথম পরীক্ষা : একটি কাঠের হাতল সহ ছোট ধাতব দণ্ড A লও। B একটি ধাতব গজ (metal gauge) এবং সাধারণ তাপমাত্রায় A দণ্ডটি Bএর ফাঁকের মধ্যে ঠিক আঁটিয়া যায়। A দণ্ডটিকে উত্তপ্ত করিলে দেখা যাইবে যে ইহা Bএর ফাঁকের

মধ্যে আর বসিতেছে না। A দণ্ডটিকে ঠাণ্ডা করিলে ঠিক ফাঁকের মধ্যে বসিবে। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় কঠিন পদার্থ তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় এবং উপরিউক্ত পরীক্ষাটি কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণের (expansion in length) একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দ্বিতীয় পরীক্ষা: দুইটি একই মাপের বলয় ও একটি পিতলের গোলক লও (১০৫নং ১০৬নং চিত্র দেখ)। তাহাদের মাপ এইরূপ হইবে যে, গোলকটি বলয়ের



১০৫নং চিত্র



১০৬নং চিত্র

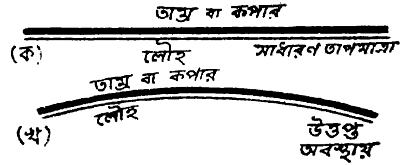
তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির পরীক্ষা

মধ্য দিয়া অতি সহজে গলিতে পারে। এইবার ফুটন্ত জলে ফেলিয়া গোলকটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, এখন আর উহা বলয়ের ভিতর দিয়া গলিতেছে না (১০৬নং চিত্র দেখ)। ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া গোলকটিকে ঠাণ্ডা কর এবং পরীক্ষা করিয়া দেখ, এবারে উহা সহজেই গলিতেছে। ইহার কারণ কি? কঠিন পদার্থমাত্রই উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে এবং শীতল হইলে তাহার আয়তন কমিয়া যায়।

বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন (Different solids have different expansions) **:** তাপ প্রয়োগের বিভিন্ন কঠিন পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে বাড়ে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা দেখান যায়।

পরীক্ষা: একটি লৌহ ও একটি তাম্রের পাত পরস্পরের সহিত রিভেট (rivet) করিয়া সংযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় উহারা সোজা থাকিবে। কিন্তু

উক্ত মিশ্র পাতটিকে উত্তপ্ত করিলে উহা ধনুকের মত বাঁকিয়া যাইবে ; তাম্র বাহিরের দিকে ও লৌহ ভিতরের দিকে। আবার সোজা মিশ্র পাতটিকে যদি বরফের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয় তবে ইহা ধনুকের মত উল্টাভাবে বাঁকিবে, লৌহ বাহিরের দিকে ও তাম্র ভিতরের দিকে। ইহাতে প্রমাণ হয় তাম্র লৌহ অপেক্ষা তাপ প্রয়োগে বেশী প্রসারিত হয় ও শৈত্য প্রযোগে বেশী সঙ্কুচিত হয়। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে বিভিন্ন কঠিন পদার্থ তাপ প্রযোগে বিভিন্ন প্রকার বাড়ে।



১০৭নং চিত্র—বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ বিভিন্ন তাহার পরীক্ষা

কঠিন পদার্থের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical examples of expansion and contraction of solids) **:** বস্তুমাত্রই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কুচিত হয় জানিযাছ। ইহার দরুণ নানা ব্যাপার অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। একটা চিম্‌নির উপর জল পড়িলে যে অংশে জল পড়ে সেই অংশ ঠাণ্ডায় সঙ্কুচিত হয়। কাজেই এক অংশে তাপের দরুণ প্রসারণ ও অন্য অংশে জল পড়ার জন্য সঙ্কোচন হওয়ায চিম্‌নি ফাটিযা যায়। বিভিন্ন অংশের অসমান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের জন্যই মাটিতে ফাটল হয, পাহাড়-পর্ব্বতের অংশ খসিয়া যায়।

বোতলের মুখে কাচের ছিপি আঁটিযা গেলে তাহা খুলিবার জন্য উহা একটু গরম করা হয় কেন এখন বুঝিতে পারিবে। তাপ প্রযোগে বোতলের মুখ গরম হয় ও আয়তনে বাড়ে। ছিপিটি ভিতরে থাকায় তেমন গরম হয় না, কাজেই আয়তনে বাড়ে না। ফলে বোতলের মুখ একটু বড় হয এবং ছিপিটি আল্‌গা হইয়া সহজে খুলিযা যায়।

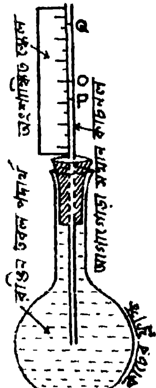
রেল লাইন পাতিবার সময় দুইখানা রেলের মধ্যে কিছু ফাঁক রাখা হয। প্রখর রৌদ্রতাপে ও রেলগাড়ীর চাকার ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইয়া রেল প্রসারিত হয় ; ঐ ফাঁকটুকু না থাকিলে রেলগুলি মুখোমুখি পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া বাঁকিয়া যাইত।

আর একটি পরিচিত দৃষ্টান্তের কথা বলি। গরুর গাড়ীর চাকার যে পরিধি উহার বেড়ের পরিধি তাহার চেযে সামান্য ছোট থাকে। চাকায় বেড় লাগানর সময় বেড়টি গরম করা হয়। উহাতে বেড়ের আয়তন বাড়িয়া যায়। তখন ঐ চাকার

উপর উহাকে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং জল দিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। বেড়টি ঠাণ্ডা হইয়া আবার আয়তনে কমে। তাই উহা চাকার উপর দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকে।

তরল পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on liquids) : **তাপ প্রয়োগে** তরল পদার্থের উপর এই তিনটি প্রভাব সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ,** তাপের প্রভাবে তরল পদার্থ গরম হয় অর্থাৎ উহার **উষ্ণতা** বাড়ে। **দ্বিতীয়তঃ,**- তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের প্রসারণ হয় অর্থাৎ উহার আয়তন বাড়ে এবং ফলে উহা লঘু হয়। কারণ ভর সমানই থাকে কিন্তু আয়তন বাড়ে। তরল পদার্থের অণুগুলি তেমন সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলিয়া তাপে ইহাদের প্রসারণ শক্তি কঠিন পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী।

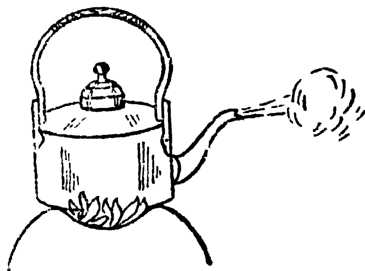
পরীক্ষা : একটি সরু গলাবিশিষ্ট কাচের ফ্লাস্ক লও। ফ্লাস্কের ছিপি দিয়া একটি আগাগোড়া সমান কাচনল ঢুকাইয়া দাও। সরু নলটির গায়ে একটি অংশাঙ্কিত স্কেল আটিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফ্লাস্কটি সম্পূর্ণভাবে ও কাচনলের O অংশ পর্য্যন্ত রঙীন জল বা পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ কর। এখন ফ্লাস্কটিকে খাড়াভাবে গরম জলে বসাইলে দেখা যাইবে নলের ভিতরে জল বা পারদ প্রথমতঃ O অংশের নীচে P দাগ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল। ইহার কারণ গরম জলের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমে কাচপাত্রটির আয়তন বাড়িয়াছে। উহার ভিতর রঙীন জল বা পারদের আয়তন তখনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। তাপের প্রভাবে তরল পদার্থের আয়তন কঠিন পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়ে, এইজন্য পরে যখন ভিতরের জল বা পারদ উত্তপ্ত হয়, তখন উহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ O দাগ ছাপাইয়া Q পর্য্যন্ত উঠে (১০৮নং চিত্র)। সুতরাং জল বা পারদের আয়তন প্রসারণ প্রকৃতপক্ষে P অংশ হইতে Q অংশ পর্য্যন্ত এবং কাচের আয়তন প্রসারণ O অংশ হইতে P অংশ পর্য্যন্ত। এইক্ষেত্রে তরলের **আপাত প্রসারণ** (apparent expansion) O হইতে Q পয্যন্ত এবং **প্রকৃত প্রসারণ** (real expansion) P হইতে Q পর্য্যন্ত। যেহেতু কাচনলটি আগাগোড়া সমান সুতরাং OP, PQ ও OQ আয়তনগুলি উহাদের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক (proportional



১০৮নং চিত্র—তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পরীক্ষা

to respective lengths)। এইজন্য PQ = OP + OQ। অর্থাৎ **তরলের প্রকৃত প্রসারণ** (real expansion of a liquid) = **তরলের আপাত প্রসারণ** (apparent expansion of a liquid) + **পাত্রের প্রসারণ** (expansion of the containing vessel)।

তৃতীয়তঃ, তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয় অর্থাৎ ইহা তরল অবস্থা হইতে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। তরল জলে তাপ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ উহার আয়তন বাড়ে। কিছুক্ষণ এইভাবে উত্তাপ দিতে থাকিলে দেখা যায় যে জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, উনুনের উপর কেট্‌লির জল যখন ফুটিতে থাকে, তখন কেট্‌লির নলের মুখের একটু দূরে সাদা ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায়। উহা কি? তোমরা জান জলীয় বাষ্প বায়ুর মতই অদৃশ্য; সুতরাং উহা জলীয় বাষ্প নহে। তাপ প্রয়োগের ফলে কেট্‌লির জল গরম হইয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং পার্শ্বের নল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঐ বাষ্প বাহিরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। ইহাকেই সাদা ধোঁয়ার মত দেখায় (১০৯নং চিত্র)। কিছু উপরে উঠিয়া উহা পুনরায় বাষ্পে পরিণত ও অদৃশ্য হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়।



১০৯নং চিত্র—কেট্‌লির নলের নিকটস্থ ধোঁয়া জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফল

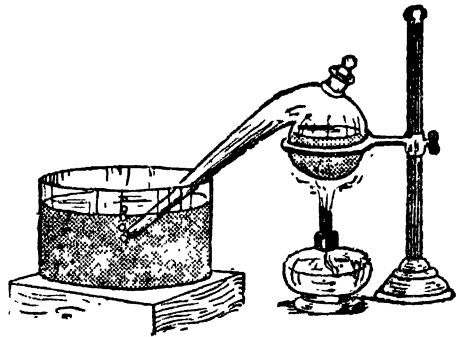
তাপ প্রয়োগে জলের প্রসারণের বৈশিষ্ট্য (Peculiar behaviour of water towards heat): তোমরা জান, উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে সাধারণতঃ পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি হয়, উষ্ণতা কমিলে আয়তনের হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু জলের আয়তন পরিবর্তনে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ষ্টীম হইতে আরম্ভ করা যাক। খানিকটা ষ্টীমকে শীতল করিলে উষ্ণতা যেমন কমিতে থাকে তখন উহা ক্রমশঃ জমিয়া জল হয় এবং সাধারণ নিয়ম অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে উহার আয়তনও কমিয়া আসে। কিন্তু এই আয়তন হ্রাস ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তাহার নিম্নে আবার আয়তনের বৃদ্ধি হয় এবং ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় উহা বরফে পরিণত

হয়। **পক্ষান্তরে কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তনবিশিষ্ট বরফে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া যখন উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি করা হয়, তখন উহা** গলিয়া জল হয়। **কিন্তু সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহার আয়তন** বাড়ে না, কমিতে থাকে। আয়তনের এই হ্রাস ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত চলে। উচ্চতর ডিগ্রীতে যথা নিয়মে আয়তন আবার বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভরের জলের উষ্ণতা ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তখন উহার আয়তন হয় **অবম** (minimum)। আয়তন কমিলে ঘনত্ব বাড়ে। কাজেই উক্ত অবস্থায় জলের ঘনত্ব হয় **চরম** (maximum)। একই ওজনের জল ও বরফের আয়তনের তুলনা করিলে দেখা যায়, বরফের আয়তন জলের আয়তন অপেক্ষা বেশী। কাজেই **বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা কম। সেইজন্য বরফ জলের উপর ভাসে।**

০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হইতে ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত জলের এই বিপরীত ব্যবহারের জন্য মেরুপ্রদেশের সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবন রক্ষা হয়। মেরুপ্রদেশের সমুদ্রের জল অত্যধিক ঠাণ্ডায় ক্রমশঃ শীতল ও ঘন হইতে থাকে। জলের উষ্ণতা ক্রমশঃ কমিয়া ৪° সেন্টিগ্রেড্ হইলে (ঐ উষ্ণতায় জল সর্ব্বাপেক্ষা ঘন) সঙ্কোচনের জন্য জল ভারী হয় ও একেবারে সমুদ্রের তলদেশে চলিয়া যায়। উষ্ণতার আরও হ্রাস হইলে (৪° সেন্টিগ্রেড্ হইতে ০° সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত) জলের প্রসারণ হয় ও উপরিভাগের জল হাল্‌কা হইয়া ভাসিতে থাকে ; কিন্তু তলদেশের জলের উষ্ণতা তখনও ৪° সেন্টিগ্রেড্ থাকিয়া যায়। এইজন্য মেরুপ্রদেশের জলচর প্রাণীদের জীবন রক্ষা পায়। যদি ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ না হইয়া ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জল চরম ঘন হইত, তাহা হইলে তলদেশের জলও উপরিভাগের ন্যায় বরফ হইয়া কঠিন হইয়া যাইত ; সেই অবস্থায় কোন সামুদ্রিক প্রাণী তাহাতে জীবিত থাকিতে পারিত না।

গ্যাসীয় পদার্থের উপর তাপের ক্রিয়া (Effect of heat on gases) **:**—তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের উপর এই দুইটি প্রভাব সাধারণতঃ দেখা যায়। **প্রথমতঃ**, তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থ গরম হয় অর্থাৎ উহার **উষ্ণতা** বাড়ে এবং **দ্বিতীয়তঃ**, উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ কঠিন ও তরল পদার্থ অপেক্ষা ঢের বেশী প্রসারিত হয়। কঠিন ও তরল পদার্থ তাপ প্রয়োগে প্রসারিত হয় কিন্তু চাপ হ্রাসে ইহাদের প্রসারণ অতি অল্প মাত্রায় ঘটে। গ্যাসীয়

পদার্থ **নির্দ্দিষ্ট চাপে** তাপ প্রয়োগে বেশী প্রসারিত হয় এবং তাহার পরিমাণ **চার্লস সূত্র** (Charle's Law) দ্বারা নিরূপিত হয়। গ্যাসীয় পদার্থ **নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায়** চাপ হ্রাসে বেশী প্রসারিত হয় এবং তাহার পরিমাণ **বয়েল সূত্র** (Boyle's Law) দ্বারা নিরূপিত হয়। গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারাঙ্ক (expansion of gases) নিরূপণ করিতে হইলে উষ্ণতা ও চাপ দুইই উল্লেখ করিতে হয়। সাধারণ চাপে গ্যাসীয় পদার্থ তাপ প্রয়োগে যে প্রসারিত হয় তাহা নিম্নোক্ত পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়।



১১০নং চিত্র—তাপ প্রয়োগে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধির পরীক্ষা

পরীক্ষা: একটি বাতাসপূর্ণ বকযন্ত্রের (retort) মুখ জলের মধ্যে ডুবাইয়া উহার তলায় তাপ দাও। দেখ, উহার ভিতরকার বাতাস **উত্তপ্ত ও প্রসারিত হইয়া** বুদ্‌বুদের আকারে জল ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে (১১০নং চিত্র দেখ)। এখন উহাকে ঠাণ্ডা হইতে দাও। দেখ, ঠাণ্ডা হওয়ায় বাতাস সঙ্কুচিত হইতেছে এবং সেই কারণে বকযন্ত্রের ভিতরে জল প্রবেশ করিতেছে। শুধু বাতাস নহে, যে কোন গ্যাসীয় পদার্থের এইরূপ নিয়ম। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট চাপে **গ্যাসীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়।**

গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রাকৃতিক উদাহরণ (Practical examples of the expansion of gases):—বায়ু কয়েকটি গ্যাসের সমষ্টি। নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতার তারতম্য হয় এবং ফলে বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়; যথা—স্থলবায়ু (land breeze), সমুদ্রবায়ু (sea breeze), মৌসুমীবায়ু (monsoon winds) ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি পরিচিত দৃষ্টান্তের কথা বলা হইল।

(১) কোনস্থানে আগুন লাগিলে দেখা যায় সেখানে ঝড় বহিতেছে। ইহার কারণ কি? কোন স্থানে আগুন লাগিলে সেখানকার বায়ু তাপের প্রভাবে আয়তনে

বৃদ্ধি পায় ও ক্রমাগত হাল্‌কা হইয়া উপরে চলিয়া যায় ; আর চতুর্দ্দিকের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু উহার স্থান অধিকার করে। আগুনের উত্তাপ ও বিস্তৃতি খুব বেশী হইলে এই প্রক্রিয়া এত দ্রুত হয়, যে মনে হয়, সেখানে ঝড় বহিতেছে।

(২) স্থলভাগ শীঘ্র উষ্ণ হইয়া উঠে এবং শীঘ্র শীতল হইয়া যায়। জলভাগ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে উষ্ণ ও শীতল হয়। সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই সূর্য্যোত্তাপে স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। স্থলভাগ সংলগ্ন বায়ু ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। ফলে উহা হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে এবং তথায় নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের উপর বায়ু তখনও অপেক্ষাকৃত শীতল ও সেখানে উচ্চ চাপ থাকে। সমুদ্র হইতে বায়ু স্থলভাগের উপর নিম্ন চাপের দিকে ধাবিত হয়। ইহাকে **সমুদ্রবায়ু** (sea breeze) বলে। রাত্রিকালে স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা দ্রুত শীতল হইয়া যায় ; সূর্য্যাস্তের অল্প পরেই জলভাগ সংলগ্ন বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত ও হাল্‌কা বলিয়া উপরে উঠিতে থাকে ও তথায় নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। তখন স্থলভাগ সংলগ্ন বায়ু উচ্চ চাপে থাকায় স্থলভাগ হইতে শীতল বায়ু সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **স্থলবায়ু** (land breeze) বলে।

অবস্থা পরিবর্ত্তন (Change of State)

আমরা জড় পদার্থকে তিন অবস্থায় দেখিতে পাই : (১) **কঠিন** (Solid), (২) **তরল** (Liquid) ও **গ্যাসীয়** (Gas)। উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা একই জড় পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। কঠিন বরফকে উত্তাপের সাহায্যে তরল জলে পরিণত করা যায় এবং অধিকতর উত্তাপের দ্বারা জলীয় বাষ্পে পরিণত করা যায় ; আবার জলীয় বাষ্পকে শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ তাপ-হ্রাস দ্বারা তরল জলে এবং অধিকতর শৈত্যের দ্বারা অর্থাৎ অধিকতর তাপ-হ্রাস দ্বারা কঠিন বরফে পরিণত করা যায়। যদিও বহু জড় পদার্থকে উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় আনা সম্ভবপর কিন্তু ইহা সকল জড় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। যেমন কঠিন কর্পূর, আয়োডিন ইত্যাদি তাপযোগে তরল অবস্থার ভিতর দিয়া না গিয়া সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। অবস্থান্তর সম্বন্ধে আলোচনাকালে কয়েকটি পদের (terms) সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে।

গলন ও **কঠিনীভবন** (Fusion বা Melting and Solidification বা Freezing) : তাপ বৃদ্ধিতে কঠিন পদার্থের তরলে পরিণত হওয়াকে **গলন** (Fusion বা Melting) বলে। তাপ-হ্রাসে তরল পদার্থের কঠিনে পরিণত হওয়াকে **কঠিনীভবন** (Solidification বা Freezing) বলে।

গলনাঙ্ক (Melting Point) : সাধারণ বায়ুর চাপে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয় তাহাকে উহার **গলনাঙ্ক** (Melting Point) বলে। বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক বিভিন্ন। টিনের গলনাঙ্ক ২৩২° সেন্টিগ্রেড্ বলিলে বুঝিবে যে, সাধারণ বায়ুর চাপে খানিকটা টিন লইয়া তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে যখন ২৩২° সেন্টিগ্রেডে পৌছিবে তখন টিন গলিতে আরম্ভ করিবে এবং যতক্ষণ না সমস্ত টিন গলিয়া তরল হয় ততক্ষণ ঐ উষ্ণতা স্থির থাকে। চাপ পরিবর্ত্তনে গলনাঙ্কের পরিবর্ত্তন হয়।

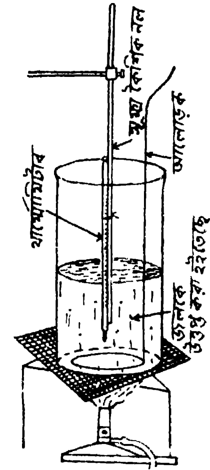
হিমাঙ্ক (Freezing Point) : সাধারণ বায়ুর চাপে যে নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থ কঠিনে পরিণত হয় তাহাকে **হিমাঙ্ক** (Freezing Point) বলে। টিনের হিমাঙ্ক ২৩২° সেন্টিগ্রেড্ বলিলে বুঝিবে যে, সাধারণ বায়ুর চাপে খানিকটা তরল টিন লইয়া তাপ হ্রাস করিলে উহার উষ্ণতা কমিয়া যখন ২৩২° সেন্টিগ্রেডে পৌছায় তখন টিন কঠিন হইতে আরম্ভ করিবে এবং যতক্ষন না সমস্ত তরল টিন কঠিনে পরিণত হয় ততক্ষণ ঐ উষ্ণতা স্থির থাকে। চাপ পরিবর্ত্তনে হিমাঙ্কের পরিবর্ত্তন হয়। বিভিন্ন পদার্থের হিমাঙ্ক বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ **একই পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক অভিন্ন হয়।** কতকগুলি চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক পৃথক হয়, যথা মাখন ৩৭° সেণ্টিগ্রেডে গলে কিন্তু ২০° সেণ্টিগ্রেডে জমে।

গলনাঙ্ক ও **হিমাঙ্ক নির্ণয়** (Determination of Melting Point and Freezing Point) : নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

প্রথম পরীক্ষা : যে কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ণয় করিতে হইবে তাহার খানিকটা ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া ১০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ সূক্ষ্ম কৈশিক নলে (capillary tube) ভরিয়া লইয়া নলের এক মুখ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। নলটিকে একটি থার্ম্মোমিটারের সহিত বাঁধিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখা হইল। কৈশিক নলের খোলা মুখ জলের উপরে রহিল। জলকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর

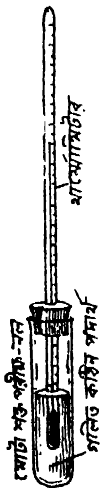
এবং আলোড়ক দিয়া জলকে ভালভাবে নাড়িতে থাক পদার্থটি গলিতে আরম্ভ করিলে থার্মোমিটারে উষ্ণতা দেখ। এইবার জলকে উত্তপ্ত করা বন্ধ করিয়া উহাকে শীতল হইতে দেওয়া হইল। কৈশিক নলে বস্তুটি যখন জমিতে আরম্ভ করিবে তখন আবাব থার্মোমিটারে উষ্ণতা দেখ। এই দুই উষ্ণতার গড় গলনাঙ্ক হইবে। (গলনাঙ্ক 100°C এর বেশী হইলে জল ব্যবহার করা চলিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেশী তাহা লইতে হইবে)। এই দুই উষ্ণতার—গলনাঙ্কর ও হিমাঙ্কর—পার্থক্য ১° বেশী হয় না। কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা গলনাঙ্ক দ্বারা নির্ণীত হয়। সমস্ত পদার্থটি একটি নির্দ্দিষ্ট গলনাঙ্কে গলিলে বুঝিতে হইবে পদার্থটি বিশুদ্ধ আছে।

কৈশিক নলে কঠিন

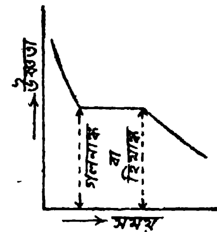


:নং চিত্র—গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক নির্ণয়

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ একটি মোটা শক্ত পরীক্ষা নলে (test tube) উপযুক্ত পরিমাণ কঠিন পদার্থ লইয়া উত্তাপ দ্বারা সমস্তটাকে গলাইয়া ফেলা হইল। নলকে আরও উত্তপ্ত করিয়া গলিত পদার্থের উষ্ণতা আরও খানিকটা বৃদ্ধি করা হইল। এইবার ঐ উত্তপ্ত তরল পদার্থের মধ্যে একটি থার্মোমিটার রাখিয়া উহাকে শীতল হইতে দাও এবং প্রতি আধ মিনিট অন্তর উষ্ণতা দেখিতে থাক। উষ্ণতা কমিতে কমিতে যখন হিমাঙ্কে পৌঁছিবে তখন থার্মো-মিটারে উষ্ণতার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না। কঠিনীভবনের সময় উষ্ণতা খানিকক্ষণ স্থির থাকিবে। সমস্ত তরল কঠিনে পরিণত হইবার পর উষ্ণতা পুনরায় কমিতে থাকিবে। একটি ছক কাগজে সময় ও উষ্ণতার লেখ



১১২নং চিত্র—গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক নির্ণয়



১১৩নং চিত্র—বস্তুর গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক লেখের সাহায্যে দেখান হইতেছে

আঁকিলে ১১৩নং চিত্রের ন্যায় লেখ পাওয়া যাইবে। যে সময়ে উষ্ণতা স্থির থাকে সেই সময়কার উষ্ণতাই পদার্থের গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক।

গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব (Effect of Pressure on Melting Point): (১) যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে (volume) কমে সেই সকল পদার্থের গলনাঙ্ক চাপ-বৃদ্ধিতে কমিয়া যায় ও চাপ-হ্রাসে গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায়। এই নিয়মকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বরফ গলিলে আয়তনে কমে এবং বাহ্যিক চাপ-বৃদ্ধি পদার্থের আয়তন কমাইতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য গলনে ইহা সাহায্য করে। অতএব চাপ-বৃদ্ধিতে বরফের গলনাঙ্ক হ্রাস পায়।

(২) যে সকল পদার্থ গলিলে আয়তনে বাড়ে সেই সকল পদার্থের গলনাঙ্ক চাপ-বৃদ্ধিতে বাড়িয়া যায় ও চাপ-হ্রাসে কমিয়া যায়। মোম গলিলে আয়তনে (volume) বাড়ে। বাহ্যিক চাপ-বৃদ্ধি পদার্থের আয়তন কমাইতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য বাহ্যিক চাপ এইরূপ পদার্থকে গলিতে বাধা দেয়। বর্দ্ধিত চাপে পদার্থ গলিতে বেশী তাপ গ্রহণ করে। সেইজন্য পদার্থের গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায়।

গলনের নিয়ম (Laws of Fusion): উপরোক্ত আলোচনা হইতে গলনের ও কঠিনীভবনের নিয়মগুলি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। নিম্নে সেইগুলি দেওয়া হইল: (ক) কঠিন পদার্থ নির্দ্দিষ্ট চাপে ও নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় গলে। সেই চাপে ঐ উষ্ণতাকে গলনাঙ্ক বলে। সাধারণতঃ গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক একই হয়। বিভিন্ন কঠিনের গলনাঙ্ক বিভিন্ন।

(খ) গলিবার সময় উষ্ণতা স্থির থাকে যদিও গলিবার হার তাপ সরবরাহের সহিত সমানুপাতিক হয় (rate of fusion is proportional to the supply of heat)।

(গ) যে পদার্থ গলিলে আয়তনে বাড়ে, চাপ-বৃদ্ধিতে তাহার গলনাঙ্ক বাড়ে ; যে পদার্থ গলিলে আয়তনে কমে, চাপ-বৃদ্ধিতে তাহার গলনাঙ্ক কমে।

(ঘ) প্রত্যেক পদার্থের একক ভর (unit mass) গলনের সময় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে, ইহাকে লীন তাপ (Latent Heat) বলে এবং একই অবস্থায় ঐ পদার্থের লীন তাপ স্থির থাকে অর্থাৎ ইহার কোন তারতম্য হয় না।

বাষ্পীকরণ ও ঘনীভবন (Vapourisation and Condensation): কোন তরলের গ্যাসীয় অবস্থাকে উক্ত তরলের বাষ্প বলে এবং তরল পদার্থের

বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **বাষ্পীকরণ** (Vapourisation) বলে। বাষ্প (Vapour) জমিয়া তরলে পরিণত হওয়াকে **ঘনীভবন** (Condensation বা Liquefaction) বলে।

দুইটি বিভিন্ন উপায়ে তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় : **বাষ্পীভবন** (Evaportion) ও **স্ফুটন** (Boiling বা Ebullition)। যে কোন তাপমাত্রায় **তরলের উপরিভাগ** হইতে ধীরে ধীরে তরলের বাষ্পে পরিণতিকে **বাষ্পীভবন** বলে। একটি পাত্রে তরল পদার্থ, যেমন জল রাখিয়া দাও এবং দুই এক দিন পরে পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাত্রের জল কিছুটা কমিয়াছে। ইহার কারণ বাষ্পীভবন ক্রিয়া। বাষ্পীভবন যদিও সাধারণ তাপমাত্রাতেই হয় কিন্তু তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা বাড়িয়া যায় এবং তরল পদার্থের উষ্ণতাও বাড়িতে থাকে। তাপ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছান যায় যখন **তরল পদার্থের সকল অংশ** হইতে বাষ্পীভবন দ্রুতগতিতে হইতে থাকে এবং তরল পদার্থের এই অবস্থাকে **স্ফুটন** বলে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত তরল বাষ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ উষ্ণতা স্থির থাকে যদি চাপের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করা না হয়। নির্দ্দিষ্ট চাপে এই নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতাকে ঐ তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling Point) বলে। বিভিন্ন তরলের বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্ক হয়। স্ফুটন ও স্ফুটনাঙ্কের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দিতে পারি। প্রদেয় অবস্থায় (under given conditions) একটি নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন তরল পদার্থের সকল অংশ হইতে দ্রুতগতিতে বাষ্পে পরিণত হওয়াকে **স্ফুটন** (Boiling বা Ebullition) বলে। নির্দ্দিষ্ট চাপে যে স্থির উষ্ণতায় কোন তরল বাষ্পে পরিণত হয় তাহাকে উহার **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling Point) বলে এবং যতক্ষণ এই ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ঐ উষ্ণতা স্থির থাকে।

বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের পার্থক্য (Distinction between Evaporation and Boiling or Ebullition) : বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের মধ্যে পার্থক্য এই যে—বাষ্পীভবন তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে ধীরে ধীরে যে কোন তাপমাত্রায় হইতে পারে ও উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার হার বাড়ে এবং স্ফুটন তরল পদার্থের সকল অংশ হইতে নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় দ্রুতগতিতে হইতে থাকে এবং যতক্ষণ এই ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ইহার তাপমাত্রার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

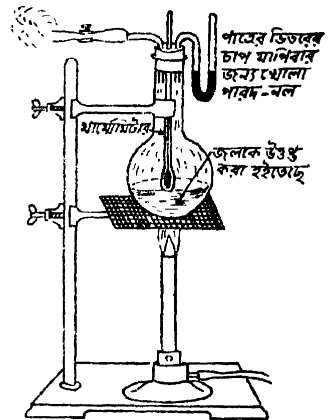
বাষ্পীভবনের পরীক্ষা : সাধারণ তাপমাত্রায় একটি পাত্রে খানিকটা তরল

পদার্থ, যেমন জল রাখিয়া দাও এবং দুই এক দিন পরে পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাত্রের জল কিছুটা কমিয়াছে। ইহার কারণ বাষ্পীভবন ক্রিয়া। বাষ্পীভবন ক্রিয়া **তরলের উপরিভাগ** হইতে **ধীরে ধীরে** হয়।

পাত্রে যদি বেশী পরিমাণ জল লওয়া হয় এবং একটি আবদ্ধ স্থানে রাখা হয় তবে দুই এক দিন পরে দেখা যাইবে যে সমস্ত পরিমাণ জল বাষ্পে পরিণত হয় নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় প্রদেয় অবস্থায় (under given conditions) একটি আবদ্ধ স্থান একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিতে পারে।

স্ফুটনের পরীক্ষা ঃ একটি কাচের ফ্লাস্কে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল ভরিয়া ছিপি বন্ধ করা হইল। ছিপির তিনটি ছিদ্রে—একটিতে থার্মোমিটার, দ্বিতীয়টিতে বাষ্প বাহির হইবার নল ও তৃতীয়টিতে চাপ পরিমাপের জন্য একটি খোলা U-নল লওয়া হইল। U-নলে কিছু পারদ নেওয়া হইল। নলের দুই বাহুতে পারদ-স্তম্ভের প্রভেদ হইতে ফ্লাস্কের ভিতরের চাপ পাওয়া যাইবে।

ফ্লাস্কে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিতে থাকিলে প্রথমে জলে দ্রবীভূত বায়ু ছোট ছোট বুদ্বুদের আকারে উপরে উঠিতে থাকিবে। তারপর পাত্রের নিম্নাংশের জল হইতে জলীয় বাষ্পের বুদ্বুদ উপরের দিকে উঠিতে থাকে (জলীয় বাষ্প জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া এইরূপ হয়) এবং উপরিস্তরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে আসিয়া আবার ঘনীভূত হইয়া যায়। এই সময়ে জলে 'চুরচুর' শব্দ (simmering noise) হইতে থাকে। জলীয় বাষ্পের বুদ্বুদ যখন নিম্নস্তর হইতে একেবারে উপরিস্তর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে তখন জল ফুটিতেছে বলা হয়। ইহাই স্ফুটন। U-নল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে স্ফুটনের সময় উহার দুই বাহুর পারদ একই উচ্চতায় আছে অর্থাৎ দুই বাহুতে চাপ সমান। বাহিরের বাহুর মুখ খোলা থাকায় সেখানকার চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপ। অন্য বাহুতে জলীয় বাষ্পের চাপ। সুতরাং এই



১১৪নং চিত্র—স্ফুটনের পরীক্ষা

পরীক্ষাকালে স্ফুটনের সময় বাষ্পের চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। থার্ম্মোমিটারে লক্ষ্য করিয়া দেখ ইহার পারা ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে স্থির আছে অর্থাৎ তরল পদার্থ জলের ক্ষেত্রে ঐ নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় স্ফুটন হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্ফুটন চলে ততক্ষণ ঐ উষ্ণতা স্থির থাকে। যে নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় এই স্ফুটন হয় তাহাকে ঐ তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** বলে। এইবার যদি বাষ্প বহির্গত হইবার নলের মুখ আংশিকভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাত্রের ভিতর বাষ্পের চাপ বাড়ে এবং U-নলের পারদ ঠেলিয়া বাহিরের দিকে উঠে। এই সময়ে থার্ম্মোমিটারে দেখা যায় উষ্ণতা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় জলের উপর চাপ বাড়াইলে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। জলীয় বাষ্প নির্গত নলের সম্মুখে সাদা ধোঁযার মত যে পদার্থ দেখা যায় তাহা জলীয় বাষ্প নহে। জলীয় বাষ্প বায়ুর মত অদৃশ্য। নল দিয়া জলীয় বাষ্প বাহিরে আসার সময় উহা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া ঘনীভূত হয় এবং ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সৃষ্টি করে। ইহাকেই সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়। কিছু উপরে উঠিয়া উহা পুনরায় বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়।

লীন তাপ (Latent Heat): কোন কঠিন পদার্থে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। প্রদেয় অবস্থায় (under given conditions) এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় (গলনাঙ্কে) উহা গলিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ না সমস্ত কঠিন পদার্থের গলা শেষ হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত কঠিন তরল অবস্থায় পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও থার্ম্মোমিটারে উষ্ণতা নির্দ্দিষ্ট থাকে। গলা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর তাপশক্তি কঠিন পদার্থের অণুগুলির আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া তরলে পরিণত করে (পদার্থের অণুগুলির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের উপর উহার অবস্থা নির্ভর করে) কিন্তু এই তাপশক্তি গলন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণতা-বৃদ্ধির কাজে লাগে না। সেইরূপ কোন তরল পদার্থে ক্রমাগত তাপ-হ্রাস করিলে উহার উষ্ণতা কমিতে থাকে এবং প্রদেয় অবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় (হিমাঙ্কে) তরল কঠিন হইতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ সমস্ত তরল পদার্থ কঠিনে পরিণত না হয় ততক্ষণ তাপ-হ্রাস করা সত্ত্বেও উষ্ণতা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

আবার কোন তরল পদার্থে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়িতে

থাকে এবং প্রদেয় অবস্থায় (under given conditions) এক নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় (স্ফুটনাঙ্কে) ও চাপে উহা বাষ্প হইতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় ততক্ষণ থার্ম্মোমিটারে উষ্ণতা নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাষ্প হওয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর তাপশক্তি তরল পদার্থের অণুগুলির আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত করে এবং এই তাপশক্তি বাষ্পীকরণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উষ্ণতা-বৃদ্ধির কাজে লাগে না। সেইরূপ কোন বাষ্পকে তাপ-হ্রাস দ্বারা শীতল করিলে উহার উষ্ণতা কমিতে থাকে এবং প্রদেয় অবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় (স্ফুটনাঙ্কে) বাষ্প তরল হইতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত বাষ্প তরলে পরিণত না হয় ততক্ষণ তাপ-হ্রাস করা সত্ত্বেও উষ্ণতা নির্দ্দিষ্ট থাকে। পদার্থের অবস্থান্তরের সময় পদার্থ যে পরিমাণ তাপশক্তি গ্রহণ বা ত্যাগ করে (তাহার সবটুকুই অণুগুলির আকর্ষণ বল হ্রাস করিতে বা বৃদ্ধি করিতে ব্যয়িত হয়) এবং যাহা বাহ্যতঃ উষ্ণতারূপে প্রকাশিত হয় না বলিয়া থার্ম্মোমিটার যন্ত্রে ধরা পড়ে না তাহাকে **প্রচ্ছন্ন** বা **লীন তাপ** (latent heat) বলে।

গলনের লীন তাপ ও **কঠিনীভবনের লীন তাপ** (Latent Heat of Fusion and Latent Heat of Solidification): এক একক ভরের কঠিন পদার্থকে গলনাঙ্কে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া তরল করিতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে **গলনের লীন তাপ** (Latent Heat of Fusion) বলে। সেইরূপ এক একক ভরের তরল পদার্থকে হিমাঙ্কে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া কঠিন করিতে যে পরিমাণ তাপশক্তি ত্যাগের প্রয়োজন হয় তাহাকে **কঠিনীভবনের লীন তাপ** (Latent Heat of Solidification) বলে। বিভিন্ন কঠিন পদার্থের গলনের লীন তাপ বিভিন্ন এবং বিভিন্ন তরলের কঠিনীভবনের লীন তাপ বিভিন্ন। বরফের লীন তাপ ৮০ ক্যালরি/গ্রাম, এই কথার অর্থ এই যে ০° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম জলে পরিণত করিতে ৮০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয় (ক্যালরি তাপ পরিমাপের একক; এক গ্রাম বিশুদ্ধ জলকে এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালরি বলে)। জল কঠিনীভবনের লীন তাপ ৮০ ক্যালরি/গ্রাম বলিলে বুঝিতে হইবে ০° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় এক গ্রাম জল ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফে পরিণত হইলে ৮০ ক্যালরি তাপ উদ্ভূত হয়।

বাষ্পীকরণের লীন তাপ ও ঘনীভবনের লীন তাপ (Latent Heat of Vapourisation and Latent Heat of Condensation) **:** এক একক ভরের তরল পদার্থকে স্ফুটনাঙ্কে উষ্ণতার পরিবর্ত্তন না করিয়া বাষ্পে পরিণত করিতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে তরলের **বাষ্পীকরণের লীন তাপ** (Latent Heat of Vapourisation) বলে। সেইরূপ এক একক ভরের বাষ্পকে স্ফুটনাঙ্কে উষ্ণতার পরিবর্ত্তন না করিয়া এক একক তরলে পরিণত করিতে যে পরিমাণ তাপশক্তি ত্যাগের প্রয়োজন হয় তাহাকে **ঘনীভবনের লীন তাপ** (Latent Heat of Condensotion) বলে। বিভিন্ন তরল পদার্থের বাষ্পীকরণের লীন তাপ বিভিন্ন এবং বিভিন্ন বাষ্পের ঘনীভবনের লীন তাপ বিভিন্ন। ষ্টীমের লীন তাপ ৫৩৬ ক্যালরি/গ্রাম, এই কথার অর্থ এই যে ১০০° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় এক গ্রাম জলকে ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম ষ্টীমে পরিণত করিতে ৫৩৬ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। ষ্টীম ঘনীভবনের লীন তাপ ৫৩৬ ক্যালরি/গ্রাম বলিলে বুঝিতে হইবে ১০০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় এক গ্রাম ষ্টীম ঐ উষ্ণতায় এক গ্রাম জলে পরিণত হইলে ৫৩৬ ক্যালরি তাপ উদ্ভুত হয়।

বাষ্পীভবনের হার পরিবর্ত্তনের কারণ (Factors influencing rate of evaporation) **:** পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে বাষ্পীভবনের হার নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে **:**

(১) **তরলের প্রকৃতি** (Nature of the liquid) **:** তরলের স্ফুটনাঙ্ক কম হইলে বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পায়। অ্যালকোহল (alcohol), ঈথার (ether) দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(২) **তরলের উষ্ণতা** (Temperature of the liquid) **:** তরলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করিলে বাষ্পীভবনের হার বাড়িয়া যায়।

(৩) **তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল** (Area of the exposed surface) **:** বায়ুর সহিত সংলগ্ন তরলের ক্ষেত্রফল যত বাড়িবে বাষ্পীভবনের হার তত বাড়িবে। একই পরিমাণ তরল কোন চওড়া পাত্রে রাখিলে শীঘ্র বাষ্পীভূত হয়।

(৪) **তরলের উপরিভাগের উপর চাপ** (Pressure on the surface) **:** তরলের উপরিভাগের উপর চাপ যত হ্রাস পাইবে বাষ্পীভবনের হার তত বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) **বায়ুর শুষ্কতা ও ইহার চলাচল** (Dryness of the air and renewal of air in contact with surface of liquid): বায়ুতে যত কম জলীয় বাষ্প থাকিবে বাষ্পীভবনের হার তত বাড়িবে এবং তরলের উপরিস্থিত বায়ু প্রাকৃতিক উপায়ে বা যান্ত্রিক উপায়ে দ্রুত সরাইয়া দেওয়া হইলে বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পাইবে।

বাষ্পীভবনে শৈত্যের সঞ্চার (Cold caused by evaporation): লীন তাপ না পাইলে তরল বাষ্প হইতে পারে না। সেইজন্য কোন তরল যখন বাষ্পীভূত হয় তখন কোন উৎস হইতে তাপ না পাইলে উহা নিজের দেহ ও পারিপার্শ্বিক হইতে প্রয়োজনীয় লীন তাপ সংগ্রহ করে। ফলে উহারা শীতল হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ঘটনা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। মাটির কলসীতে জল রাখিলে তাহা ধাতব পাত্র বা কাচের পাত্রে সংরক্ষিত জল অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ কি? মাটির কলসীর গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে; কলসীর জল ঐ সকল ছিদ্র দিয়া বাহিরে আসে এবং বাষ্পীভবন ক্রিয়া পাত্রের চতুর্দিক হইতে চলিতে থাকে। ইহার জন্য যে লীন তাপের প্রয়োজন তাহা পাত্র ও পাত্রের জল এবং পারিপার্শ্বিক হইতে সংগৃহীত হয়। ফলে ভিতরের জল ঠাণ্ডা হয়। ধাতব পাত্র বা কাচের পাত্রে যে জল আছে তাহার বাষ্পীভবন ক্রিয়া শুধু পাত্রের মুখের অংশ হইতে সম্পন্ন হয়। মাটির কলসীর ক্ষেত্রে বাষ্পীভবনের হার ধাতব বা কাচের পাত্র অপেক্ষা অধিক হয় এবং সেইজন্য এই পাত্রে সংরক্ষিত জল অধিক ঠাণ্ডা হয়। বর্ষাকালে যখন বায়ু বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত (saturated) থাকে তখন অতি সামান্য বাষ্পীভবন ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ফলে মাটির কলসীর জল বিশেষ ঠাণ্ডা হয় না। গ্রীষ্মকালে ঘর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য দরজায় বা জানালায় খস্‌খস্‌ (khas khas) ব্যবহার করিতে দেখা যায়। খস্‌খস্‌এ সময় সময় পিচকারী করিয়া জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। সেই জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয় এবং তাহার জন্য লীন তাপ প্রধানতঃ ঘরের বায়ুই প্রদান করে। ফলে ঘর ঠাণ্ডা হয়।

তাপ সঞ্চালন

(Transmission of Heat)

উত্তপ্ত বস্তুর ধর্ম্মই এই যে ইহাদের তাপের কিয়দাংশ চতুর্দ্দিকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তুকে প্রদান করে অর্থাৎ তাপ উত্তপ্ত বস্তু হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে তাপের এই সঞ্চালন হইয়া থাকে—**পরিবহন, পরিচলন** ও **বিকিরণ**।

১। **তাপের পরিবহন** (Conduction) : **যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ একই বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর অংশে অথবা উষ্ণ বস্তু হইতে তাহার সহিত সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে অণুগুলির স্থ্যানচ্যুতি না করিয়া সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিবহন বলে।** কঠিন পদার্থ এই প্রণালীতে উত্তপ্ত হয় এবং নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝান হইল। তরল ও গ্যাসীয় পদার্থকে এই প্রণালীর সাহায্যে উত্তপ্ত করা যায় না।

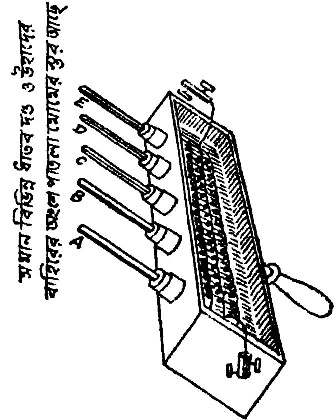
পরীক্ষা: একখানা লোহার হাতার এক প্রান্ত উনুনের আগুনের উপর রাখ। উহার অপর প্রান্ত এখন শীতল। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, উহার শীতল দিক এত গরম হইয়াছে যে আর উহাতে হাত দেওয়া যায় না। হাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাপ চলিয়া আসিয়াছে। কিরূপে আসিল? হাতার যে অংশটা আগুনের উপর রহিয়াছে, সেখানকার কম্পমান অণুগুলির স্পন্দন সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। সেই ক্রমবর্দ্ধমান স্পন্দন সংখ্যা পরস্পর-সংলগ্ন অণু হইতে অণুতে সঞ্চালিত হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত হাতাখানাই উত্তপ্ত হয়। অণুগুলি কিন্তু নিজ নিজ স্থানেই থাকিয়া যায়, স্থানচ্যুত হয় না। এইরূপে পরস্পর-সংলগ্ন অণুতে বা পদার্থে তাপের যে সঞ্চালন, তাহাকে তাপের **পরিবহন** বলে।

পরিবাহিতা (Conductivity): কোন পদার্থের তাপ পরিবহন গুণকে **পরিবাহিতা** (conductivity) বলে। সকল পদার্থে এই গুণ সমান পরিমাণে নাই। যে সকল পদার্থ দ্রুত ও সহজে তাপ পরিবহন করে তাহাদিগকে তাপের **সুপরিবাহী** (good conductor) বলে। সাধারণতঃ সোনা, লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রূপা প্রভৃতি ধাতু ও সঙ্কর ধাতু তাপের সুপরিবাহী। যে সকল পদার্থ দ্রুত ও সহজে তাপ পরিবহন করে না তাহাদিগকে তাপের **কুপরিবাহী**

(bad conductor) বলে। সাধারণতঃ অধিকাংশ তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থ তাপের কুপরিবাহী। অনেক কঠিন পদার্থ আছে যাহারা তাপের কুপরিবাহী; যেমন কাচ, মোম, কাঠ, হাড়, বেত প্রভৃতি।

পরিবাহিতার তুলনা (Comparison of Conductivities): পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিভিন্ন পদার্থের পরিবহন-শক্তি বিভিন্ন। নিম্নের পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের পরিবাহিতার তুলনা করা যায়।

Ingen-Hauszএর **পরীক্ষা**: একটি ধাতব পাত্রের সহিত কর্কের সাহায্যে কয়েকটি সমান বিভিন্ন ধাতুর দণ্ড (প্রতিটি ধাতব দণ্ডের ব্যাস ও দৈর্ঘ্য সমান) আবদ্ধ আছে। প্রতিটি দণ্ডের সমান অংশ ধাতব পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ। দণ্ডগুলির বাহিরের অংশ মোমের পাতলা স্তর দিয়া আবৃত আছে। ধাতব পাত্রে জল নেওয়া হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা উহাকে ফুটান হয়। ধাতব পাত্রের অন্তর্গত দণ্ডগুলির প্রান্ত ঐ উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং উহারা তাপ পরিবহন করে। যে দণ্ডের উষ্ণতা মোমের গলনাঙ্কে পৌঁছায় তখন উক্ত দণ্ডের মোম গলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রতিটি দণ্ডের মোম একই সময়ে গলিতে আরম্ভ করে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের পরিবাহিতা বিভিন্ন। যখন প্রত্যেক দণ্ডের উষ্ণতা স্থির অবস্থায় আসে (stationary state) তখন দেখা যায় বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের মোম বিভিন্ন দূরত্ব পর্য্যন্ত গলিয়াছে। যদি C_1, C_2, C_3 ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতব দণ্ডের পরিবাহিতা হয় এবং l_1, l_2, l_3 ইত্যাদি প্রতিটি দণ্ডের মোম গলা দূরত্বের নির্দ্দেশ দেয় তবে গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়



১১৫নং চিত্র—পরিবাহিতা তুলনা পরীক্ষা

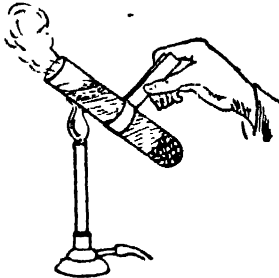
$$C_1 : C_2 : C_3 : \cdots\cdots = l_1{}^2 : l_2{}^2 : l_3{}^2 : \cdots\cdots$$

অর্থাৎ পরিবাহিতা ও গলিত মোমের দৈর্ঘ্যের বর্গ সমানুপাতিক হয়।

তরলের পরিবাহিতা (Conductivity of Liquids): পারদ ও গলিত

ধাতু ব্যতীত সকল তরল পদার্থই কুপরিবাহী (bad conductor)। তরলে পরিচলন স্রোতের জন্য ও পাত্রের গাত্রের পরিবাহিতার জন্য তরলের পরিবাহিতা মাপা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নের পরীক্ষা হইতে বোঝা যাইবে যে তরল পদার্থ কুপরিবাহী।

পরীক্ষা: একটি কাচের পরীক্ষ-নলে (test tube) এক টুকরো বরফ লও। লোহার খানিকটা জড়ান তার দিয়া বরফখানাকে নলের তলায় আবদ্ধ করিয়া রাখ। তারপর উহার উপরে জল ঢালিয়া দাও। এখন ঐ নলের উপর দিকের জলটায় তাপ দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে নলের মুখের কাছে জল যথেষ্ট উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতেছে। কিন্তু নীচের বরফ গলিতেছে না (১১৬নং চিত্র দেখ)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জলের পরিবহন-শক্তি বা পরিবাহিতা খুবই কম।



১১৬নং চিত্র—তরলের নিম্ন পরিবাহিতার পরীক্ষা

গ্যাসের পরিবাহিতা (Conductivity of Gases): উদজান ও হিলিয়াম গ্যাস ব্যতীত সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থ অত্যন্ত কুপরিবাহী (non-conductor)। পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্যাসীয় পদার্থে তাপ সঞ্চালন হয় বলিয়া ইহার পরিবাহিতা মাপা অত্যন্ত কঠিন। একটি উদাহরণে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

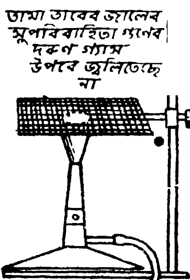
তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিযাছ যে, শীতকালে একখানা লেপ গায়ে দিলে যতটা শীত কম লাগে, পর পর কয়েকখানা কাঁথা গাযে চাপাইলেও ততটা শীত কম লাগে না। ইহার কারণ, লেপের ভিতরে তুলা থাকে এবং ঐ তুলার আঁশের ফাঁকে ফাঁকে বায়ু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে; এবং যেহেতু বায়ুর পরিবহন-শক্তি খুব কম সেহেতু শরীরের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি লেপের বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে না। অপরপক্ষে কাঁথার ভিতর হইতে শরীরের তাপ বাহির হইয়া আসিয়া শরীরকে অধিকতর শীতল করে। তাই শীতকালে লেপ ঢের বেশী গরম মনে হয়।

পরিবাহিতাঙ্ক (Thermal conductivity বা Coefficient of conductivity): কোন পদার্থের একক দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনক (cube) লইয়া যদি উহার দুই বিপরীত তলকে ১° ডিগ্রী উষ্ণতার ব্যবধানে রাখা হয় তবে প্রতি সেকেণ্ডে উহার মধ্য দিয়া যে পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হইবে তাহাকে ঐ পদার্থের

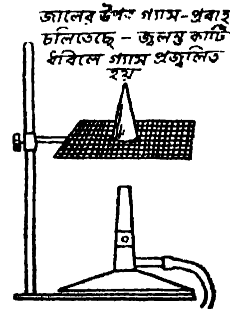
পরিবাহিতাঙ্ক (thermal conductivity বা coefficient of conductivity) বলে। লোহার 'পরিবাহিতাঙ্ক '২ ক্যালরি' ইহার অর্থ হইল এই যে এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বিশিষ্ট লোহার ঘনকের (cube) দুই বিপরীত তলের ১° ডিগ্রী উষ্ণতার পার্থক্য থাকিলে এক সেকেণ্ডে উষ্ণতর তল হইতে শীতলতর তলে '২ ক্যালরি তাপ গমন করিবে।

সুপরিবাহী ও কুপরিবাহীর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত (Practical examples of good and bad conductors): নিম্নে কয়েকটি সুপরিবাহী ও কুপরিবাহীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। (১) পশম ও তুলার (wool and cotton) পরিবাহিতা প্রায়ই সমান কিন্তু 'গরম কাপড়' প্রস্তুতকরণে পশমের ব্যবহার দেখা যায়। ইহার কারণ কি? পশমের আঁশ ছাড়া ছাড়া বলিযা উহা বেশী পরিমাণ বায়ু আটকাইয়া রাখিতে পারে। আমরা জানি বায়ুর পরিবাহিতা অত্যন্ত কম। সেইজন্য পশমী দ্রব্য ব্যবহার করিলে শরীরের তাপ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতে পারে না এবং ফলে আমাদের দেহ গরম থাকে। এইজন্য 'গরম কাপড়' প্রস্তুতকরণে পশমের ব্যবহার দেখা যায়।

(২) প্রজ্জ্বলিত বুনসেন বার্ণারের শিখার উপর যদি একটি তামার তারের জাল উপর হইতে চাপিয়া ধরা হয় তবে গ্যাস জালের নীচের অংশে জ্বলিতে থাকে উপরের অংশে জ্বলে না। তামা সুপরিবাহী বলিয়া সমস্ত তাপ দ্রুত জালে ছড়াইয়া পড়ে



১১৭নং চিত্র



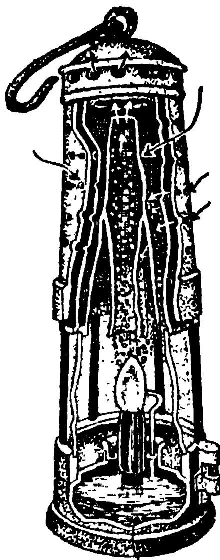
১১৮নং চিত্র

তাপের সুপরিবাহী গুণের পরীক্ষা

এবং জালের উপরাংশে গ্যাসের উষ্ণতা জলনাঙ্ক (ignition temperature) পর্য্যন্ত পৌঁছিবার জন্য উপযুক্ত তাপ পায় না (১১৭নং চিত্র দেখ)। কিন্তু জালের উপর

জলন্ত কাঠি ধরিলে গ্যাস জ্বলিয়া উঠিবে (১১৮নং চিত্র দেখ)। ইহাতে বুঝা যায় জালের উপরও গ্যাস-প্রবাহ আছে।

(৩) ডেভির নিরাপত্তা বাতি (Davy's Safety Lamp) : তারের জালের সুপরিবাহিতা গুণের সুযোগ লইয়া বৈজ্ঞানিক **ডেভি** (Davy) **নিরাপত্তা বাতি**

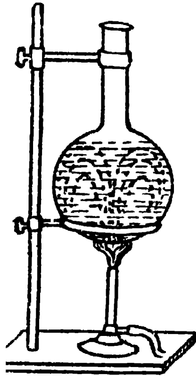


১১৯নং চিত্র—ডেভির নিয়মে প্রস্তুত আধুনিক নিরাপত্তা বাতি

(Safety Lamp) নির্ম্মাণ করেন। কয়লা খনিতে অনেক সময় মার্স গ্যাস (marsh gas) উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে। এই মিশ্রণে অগ্নি সংযোগ হইলে ভীষণ বিস্ফোরণ হয়। কয়লা খনিতে কার্য্যের জন্য আলোর প্রয়োজন এবং সাধারণ আলো লইয়া কার্য্য করিলে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য কয়লার খনিতে ডেভির নিরাপত্তা বাতি ব্যবহৃত হয়। এই বাতিতে কাচের চিম্‌নীর পরিবর্ত্তে এক বা দুই স্তর লোহার বা তামার জাল ব্যবহার করা হয়। মার্স গ্যাস মিশ্রিত বায়ু সামান্য পরিমাণে জালের মধ্য দিয়া বাতির ভিতরে যায় এবং নীল শিখায় জ্বলিতে থাকে। কিন্তু তারের মধ্য দিয়া শিখার তাপ দ্রুত পরিবাহিত হয় বলিয়া বাহিরের গ্যাস জলনাঙ্ক (ignition temperature) পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয় না; ফলে কোনরূপ বিস্ফোরণ হয় না। নীল শিখা মার্স গ্যাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয়।

তাপের পরিচলন (Convection) **: যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ উষ্ণতর স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর স্থানে উত্তপ্ত অণুগুলির নিজস্ব স্থানচ্যুতির দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিচলন বলে।** তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থ এই প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়। প্রথমে তরল পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করা যাক।

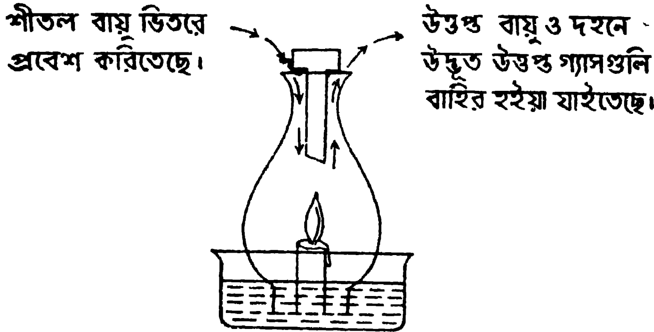
পরীক্ষা : একটি কাচপাত্রে জল লইয়া জলের তলায় খানিকটা রঙের গুঁড়া ফেলিয়া দাও। এখন পাত্রের নীচে তাপ দাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ, জলের মাঝখান হইতে অর্থাৎ যেখানে উত্তাপ দেওয়া হইতেছে সেখান হইতে একটি স্রোত উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া চারিপাশে বাঁকিয়া আবার তলায় পৌঁছিতেছে। রঙের সাহায্যে জলের স্রোত বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, সমস্ত জলটা রঙীন হইয়াছে এবং গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিরূপে ইহা ঘটিতেছে, বুঝিয়া দেখ। পরিবহন প্রণালীতে সর্ব্বপ্রথম কাচপাত্রের তলদেশ উত্তপ্ত হয়। কাচপাত্রের ভিতরে জলের সর্ব্বনিম্ন স্তরও উহার সংস্পর্শে থাকায় ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হইতে থাকে। উত্তপ্ত হওয়ার জন্য ঐ গরম জল আয়তনে বাড়ে ও হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। ঐ হাল্‌কা জলের সঙ্গে রঙের কণাসকলও উপরে উঠিতে থাকে। উপরকার ও আশেপাশের ঠাণ্ডা ভারী জল নীচে নামিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে নীচ হইতে উপরে এবং উপর হইতে নীচে জল উঠানামা করে বা একটা জলস্রোতের (convection current) সৃষ্টি হয় এবং উহার সঙ্গে রঙের কণাগুলিও উঠানামা করে। এইরূপে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাত্রের সমস্ত জল রঙীন হয় এবং গরম হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে (১২০নং চিত্র দেখ)। এই প্রকার তাপ সঞ্চালনকে **পরিচলন** বলে।


১২০নং চিত্র—পরিচলন প্রণালীতে তরল পদার্থ উত্তপ্ত হয় তাহার পরীক্ষা

গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন (Convection of gases) **:** কারখানার চুল্লীর চিম্‌নি বা লণ্ঠনের চিম্‌নির মধ্য দিয়া উত্তপ্ত বায়ু, ধোঁয়া ও উত্তপ্ত গ্যাসগুলি হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চুল্লীর বা লণ্ঠনের নীচের ছিদ্র দিয়া বাহির হইতে

শীতল ও ভারী বায়ু চুল্লীতে বা লণ্ঠনে প্রবেশ করে। এইরূপে একটি বায়ুর পরিচলন স্রোতের (convection current) সৃষ্টি হয় এবং প্রজ্বলনের জন্য প্রয়োজনীয় অম্লজান বায়ু হইতে আসে। যদি নীচের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে অম্লজানের অভাবে প্রজ্বলন সম্ভবপর হয় না। চিম্‌নি সরাইয়া লইলে বায়ু চলাচল সুষ্ঠুভাবে হয় না, দহনের ফলে উদ্ভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাস বিতারিত হয় না ও চতুর্দ্দিক হইতে আগত শীতল বায়ু শিখার উষ্ণতা কমাইয়া দেয়, ফলে অসম্পূর্ণ দহনক্রিয়া হয় ও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা ঃ একটি পাত্রে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া পাত্রে জল ঢাল। এইবার একটি সাধারণ চিম্‌নি পাত্রের ভিতর এমনভাবে রাখ যাহাতে মোমবাতিটি চিমনির



১২১নং চিত্র গ্যাসীয় পদার্থের পরিচলন পরীক্ষা

মাঝখানে থাকে। জলের জন্য নীচ হইতে চিম্‌নিতে বায়ু প্রবেশ করে না। প্রয়োজনীয় অম্লজানের অভাবে বাতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নিভিয়া যায়। মোমবাতিটি পুনরায় জ্বাল ও চিম্‌নির মুখে মাঝামাঝি একটি T আকারের মোটা কার্ডবোর্ড বা ধাতুপাত রাখ। লক্ষ্য করিয়া দেখ, মোমবাতিটি জ্বলিতেছে। ইহার কারণ কি? কার্ডবোর্ড বা ধাতুপাত চিম্‌নির উপর অংশকে দুইভাগে ভাগ করে; একভাগ দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু প্রবেশ করে ও অপর ভাগ দিয়া উত্তপ্ত বায়ু ও দহনক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাহির হইয়া যায়। একখণ্ড ধূমায়িত কাগজ (smouldering paper) চিম্‌নির উপরে কার্ডবোর্ডের বা ধাতুপাতের একপার্শ্বে ধরিলে উহার ধূম পরিচলন-প্রবাহের সহিত বাহিত হইয়া প্রবাহের পথ নির্দ্দেশ করিবে।

তাপের পরিচলন কঠিন পদার্থে সম্ভব নয়; কারণ কঠিন পদার্থের অণুগুলি পরিচলন প্রণালীর পদার্থের অণুগুলির ন্যায় চলাফেরা করিতে পারে না।

তাপ পরিচলনের কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত (Practical examples of convection) **:** নিম্নে পরিচলন-স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া আছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করা হইল।

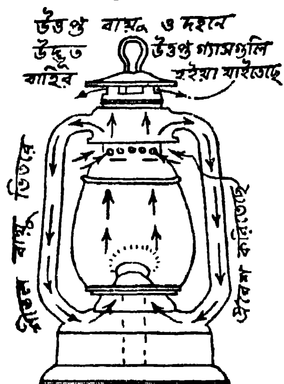
(১) বায়ুর পরিচলন-স্রোতের উপর নির্ভর করিয়া আছে এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি—বায়ুপ্রবাহ (Winds), স্থলবায়ু (Land Breeze), সমুদ্রবায়ু (Sea Breeze), মৌসুমী বায়ু (Monsoon) ইত্যাদি। স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু সম্বন্ধে পূর্ব্বে (১৪২ পৃষ্ঠা দেখ) আমরা আলোচনা করিযাছি।

(১) **বায়ুপ্রবাহ** (Winds) **:** ইহা পরিচলন-স্রোতের জন্য ঘটে। স্থানভেদে উষ্ণতার তারতম্য ঘটিলে বায়ুমণ্ডলে পরিচলন-স্রোতের সৃষ্টি হয। যে স্থানে উষ্ণতা অধিক সেই স্থানের বায়ু হাল্কা বা লঘু হইয়া পড়ে। হাল্কা ও লঘু হওয়ার কারণ প্রধানতঃ দুইটি (i) প্রথমতঃ উষ্ণতার জন্য বায়ু উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয় (ভর এক রহিল কিন্তু আয়তন বাড়িয়া গেল, তাহাতে ইহার ঘনত্ব হ্রাস পাইল) ও (ii) অধিক উষ্ণতার জন্য বাষ্পীভবনের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফলে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হাল্কা। বায়ু হাল্কা বা লঘু হইয়া পড়িলে উপরে উঠিতে থাকে এবং তথায নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তখন বায়ু চাপের সমতা রক্ষার জন্য আশেপাশের শীতল অঞ্চলের বায়ু ঐ স্থানের দিকে ছুটিয়া আসে। এইজন্য সারা বছর ধরিয়াই পৃথিবীর নানাস্থানে অবিরত বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়।

(২) **বায়ুচলন** (Ventilation) **:** ঘরে বায়ুচলন ঠিক রাখিবার জন্য পরিচলন-স্রোত কাজে লাগান হয়। ঘরে বেশী লোক থাকিলে, আগুন জ্বলিলে ঘরের বায়ু বিষাক্ত ও উষ্ণ হইয়া পড়ে। বায়ুচলনের সাহায্যে ঘর হইতে ঐ উষ্ণ ও বিষাক্ত বায়ু বাহির করিয়া দিযা শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে আনা হয়। ঘরে যদি রুজু রুজু দরজা-জানালা রাখা যায় এবং ছাদের নীচে দেওয়ালের মাথায় বায়ু নির্গমনের জন্য কতকগুলি ঘুলঘুলি রাখা হয়, তবে গৃহের উত্তপ্ত বায়ু ঘুলঘুলি দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং বাহিরের শীতল বায়ু দরজা-জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। শীতপ্রধান স্থানে অনেক সময় দরজা-জানালা খুলিয়া রাখার সুবিধা হয় না;

আবার গৃহ গরম করার জন্য চুল্লী রাখিতে হয়। এইরূপ স্থানে গৃহের মেঝের নিকট দেওয়ালে ঘুলঘুলি থাকে এবং চুল্লীর উপর চিম্‌নি থাকে। চুল্লীর চিম্‌নির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত বায়ু ও দহনে উদ্ভূত উত্তপ্ত গ্যাসগুলি বাহির হইয়া যায় এবং মেঝের নিকট দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু গৃহে প্রবেশ করে।

(৩) **হ্যারিকেন লণ্ঠন :** একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের গঠন ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে ইহাতে পরিচলন স্রোতের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। লণ্ঠনের চিম্‌নির মধ্য দিয়া উত্তপ্ত বায়ু ও গ্যাসগুলি হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং বাহিরের শীতল বায়ু পাশের দুইটি নলের মধ্য দিয়া তীর অঙ্কিত পথে ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপে একটি বায়ুর পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং প্রজ্বলনের জন্য প্রয়োজনীয় অম্লজান বায়ু হইতে আসে।



১২২নং চিত্র—হ্যারিকেন লণ্ঠন

বায়ুচলনের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Ventilation)**:** জনবহুল ও রুদ্ধগৃহে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। ইহার কারণ সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও লোকের সঠিক ধারণা ছিল না। পূর্ব্বে মনে করা হইত যে, শ্বাসক্রিয়ার ফলে জনবহুল ও রুদ্ধগৃহের বায়ুতে অম্লজানের হ্রাস ও অঙ্গারাম্লের আধিক্য হয় এবং এই দূষিত বায়ু (বায়ুর উপাদানের সাধারণ মানের তারতম্যের দরুণ বায়ুকে দূষিত বলা হইতেছে) হইতে শ্বাসক্রিয়া করার দরুণ আমরা অস্বস্তি বোধ করি। যাহাতে রুদ্ধগৃহের বায়ুতে বায়ুর উপাদানগুলির এইরূপ তারতম্য না হয়, তাহার জন্য প্রযোজন সুষ্ঠু বায়ুচলন ব্যবস্থা। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রুদ্ধগৃহের বায়ুর উপাদানগুলির পরিমাণ এমন অবস্থায় পৌঁছায় না, যাহাতে বায়ুকে দূষিত বলা যায়। আধুনিক মতে বায়ুর ভৌত অবস্থার উপর (physical condition)—যেমন ইহার উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি—আমাদের স্বস্তি-অস্বস্তি বোধ নির্ভর করে। জনবহুল রুদ্ধগৃহে বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফলে আমাদের দেহের তাপ অপসরণে অসুবিধা ঘটে এবং সেইজন্য আমরা অস্বস্তি বোধ করি।

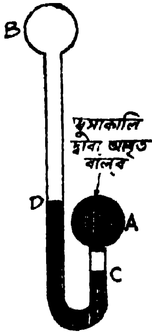
গৃহমধ্যে যাহাতে বায়ুর অবস্থা নির্দ্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকে, সেইজন্য প্রয়োজন বায়ু-চলন। বায়ুচলন দ্বারা উষ্ণ, আর্দ্র বায়ু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং তাহার স্থানে বাহিরের শীতল, শুষ্ক বায়ু প্রবেশ করে।

তাপের বিকিরণ (Radiation)ঃ **যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ কোন মাধ্যমের ভিতর দিয়া আসিবার সাহায্য না লইয়া এক স্থান হইতে অপর স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে বিকিরণ বলে।**

পরিবহন অথবা **পরিচলন** প্রণালীতে তাপের সঞ্চালন প্রধানতঃ কোন বস্তু মাধ্যমের সাহায্যে (through a material medium) সংঘটিত হয়। কিন্তু জ্বলন্ত উনুনের কাছে বসিলে উত্তাপ গায়ে আসিয়া লাগে। সূর্য্য হইতে যে প্রচণ্ড উত্তাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার খানিকটা মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে। উত্তপ্ত বস্তু হইতে এই যে তাপ সঞ্চালন, ইহা কিরূপে হইতেছে ? তোমরা হয়ত বলিবে, বাতাসের দ্বারা তাপ উনুন ও সূর্য্য হইতে চালিত হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে। সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর মাত্র পাঁচশত মাইলের অধিক দূরত্ব পর্য্যন্ত বাতাস আছে ; তাহার পর মহাশূন্য। এই মহাশূন্যের ভিতর দিয়া সূর্য্যের তাপ কিরূপে পৃথিবীতে আসিতেছে ? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে **ইথার*** (ether) নামক একটা জিনিস সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। এই ইথার দেখা, স্পর্শ করা বা তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা কিছুই সম্ভব নয়। উত্তপ্ত বস্তুমাত্রেই এই ইথার সমুদ্রে একপ্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই তরঙ্গ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। উত্তাপের এই প্রকার সঞ্চালনকে **বিকিরণ** বলে। **বিকিরণের বিশেষত্ব এই যে, বিকীর্ণ উত্তাপ রশ্মি যাহার মধ্য দিয়া আসে তাহাকে উত্তপ্ত করে না ; যে বস্তুতে বাধা পায় তাহাকেই উত্তপ্ত করে।** সূর্য্য তাপ বিকিরণ করে ; কিন্তু সূর্য্য-রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার পথে মধ্যবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে না। বিকীর্ণ তাপের অস্তিত্ব নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

* এই ইথার জল, স্থল, বায়ুর মধ্যে, এমন কি মহাশূন্যের মধ্যেও বিশ্বব্যাপিয়া বিদ্যমান। ইহা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, ভারহীন ও ইন্দ্রিয়াতীত। ইথারের অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা আজ পর্য্যন্তও প্রমাণিত হয় নাই। ইহা বিজ্ঞানীদের একপ্রকার মানস-সৃষ্টি। ইহাকে মানিয়া লইলে বিকীর্ণ শক্তির অনেক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া যায়।

পরীক্ষা ঃ A ও B দুইটি কাচের বাল্‌ব একটি বাঁকান কাচনল দ্বারা যুক্ত। বাল্‌ব দুইটি ও কাচনলের অভ্যন্তর সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করিয়া কাচনলে খানিকটা রঙীন ঈথার নেওয়া হয়। যন্ত্রের ভিতরে শুধু ঈথার ও ঈথারের বাষ্প থাকে। A বাল্‌বটি কাল রঙে ঢাকা থাকে। কাল রঙ অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ তাপ শোষণ করে। বিকীর্ণ তাপ কাল বাল্‌বটিতে পড়িলে ইহা তাপ শোষণ করে। ফলে বাল্‌বটি ও উহার অভ্যন্তরস্থ ঈথার বাষ্প উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বাষ্পের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার চাপ বাড়ে এবং ফলে A বাল্‌বের দিকে ঈথার-তল নীচে নামে ও B বাল্‌বের দিকে ঈথার-তল উপরে উঠে। এইভাবে এই যন্ত্রদ্বারা বিকীর্ণ তাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। এই যন্ত্রটিকে **থার্মোস্কোপ** (Thermoscope) বলে।



১২৩নং চিত্র—
ঈথার থার্মোস্কোপ

তাপ বিকিরণের দৃষ্টান্ত (Practical observations on radiation) ঃ সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করিলেও বিকিরণ প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা নিত্য সূর্য্যের তাপ পাইয়া থাকি। দিবাভাগে সূর্য্যের বিকীর্ণ তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। আবার রাত্রে যখন সূর্য্য তাপ দেয় না তখন সঞ্চিত তাপ ভূপৃষ্ঠ বিকিরণ করে এবং গভীর রাত্রে ভূপৃষ্ঠ শীতল হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় টিনের ঘরে বাস করা কঠিন ; কিন্তু রাত্রিতে সঞ্চিত তাপ টিন হইতে বিকীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ঘর আবার বেশ ঠাণ্ডা হয়। কোন উত্তপ্ত পদার্থ কতটুকু তাপ বিকিরণ করিবে, তাহা নির্ভর করে চারিদিকের বস্তু হইতে উহা কত বেশী গরম তাহার পরিমাণের উপর। **আবার সকল বস্তুর তাপ বিকিরণ করিবার কিংবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সমান নহে।** যে সকল জিনিসের রঙ কালো এবং যাহাদের পৃষ্ঠদেশ অমসৃণ, তাহাদের তাপ বিকিরণ অথবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বস্তুটি যদি সাদা হয়, তবে উহার বিকিরণ করিবার অথবা বিকিরিত তাপ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কালো বস্তু অপেক্ষা অনেক কম। এজন্য গরম চা সাদা চায়ের বাটিতে রাখা হয়—কারণ সাদা কাপ হইতে চায়ের তাপ খুব তাড়াতাড়ি বিকিরিত হইতে পারে না। আবার কালো

পাথর বাটিতে গরম দুধ খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। এই একই কারণে শীতকালে লোকে কালো জামা ব্যবহার করে, কেননা উহার তাপ গ্রহণের ক্ষমতা বেশী অথচ তাপ বিকিরণ কম করে বলিয়া শরীরের তাপ বজায় থাকে।

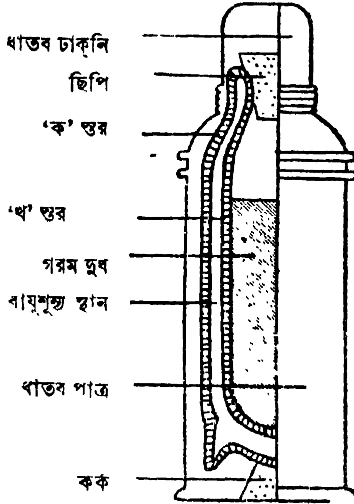
পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রণালীর প্রভেদ (Distinction between Conduction, Convection & Radiation): (১) পরিবহন ও পরিচলন প্রণালীতে তাপ কোন পদার্থের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বিকিরণ প্রণালীতে তাপ কোন বস্তু মাধ্যমের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয় না। আবার পরিবহন প্রণালীতে তাপ অণুগুলির স্থানচ্যুতি না করিয়া উষ্ণতর অংশ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর অংশে সঞ্চালিত হয এবং পরিচলন প্রণালীতে তাপ উত্তপ্ত অণুগুলির নিজস্ব স্থানচ্যুতির দ্বারা উষ্ণতর স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতলতর স্থানে সঞ্চালিত হয়। কঠিন পদার্থ পরিবহন প্রণালীতে এবং তরল ও গ্যাসীয পদার্থ সাধারণতঃ পরিচলন প্রণালীতে উত্তপ্ত হয়; কিন্তু বিকিরণ প্রণালীতে উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিকীর্ণ উত্তপ্তরশ্মি যে কোন বস্তুতে বাধা পায তাহাকেই উত্তপ্ত করে।

(২) পরিবহন ও পরিচলন প্রক্রিয়া অতি দ্রুততালে সাধিত হয। বিকীর্ণ উত্তাপরশ্মির গতিবেগ আলোকের সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল।

(৩) পরিবহন প্রণালীতে তাপ **যে কোন পথে** সঞ্চালিত হইতে পারে; পরিচলন প্রণালীতে তাপ শুধু **উর্দ্ধদিকেই** সঞ্চালিত হয় কিন্তু বিকিরণ প্রণালীতে তাপ **চতুর্দ্দিকেই** সঞ্চালিত হয। আগুনের নিকটে আমরা বিকীর্ণ তাপ অনুভব করি। আগুন ও আমাদের মধ্যে কোন কঠিন পদার্থের যোগাযোগ নাই বলিয়া ঐ তাপ পরিবাহিত তাপ নয়; আবার বায়ু আগুনের তাপে উত্তপ্ত হইয়া শুধু উর্দ্ধদিকেই পরিচালিত হয়, আশেপাশে আসিতে পারে না। কিন্তু আগুনকে একটি পর্দ্দা দিয়া আড়াল করিলে আর তাপ অনুভূত হয় না। কেননা বিকিরিত তাপ পর্দ্দায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

থার্মোফ্লাস্ক (Thermos flask): এই জিনিসটি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাতে কোন উত্তপ্ত বস্তু রাখিলে—যেমন গরম দুধ, চা ইত্যাদি—উহা অনেকক্ষণ গরম অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ ভিতরের উত্তাপ যাহাতে পরিবহন, পরিচলন অথবা

বিকিরণ প্রক্রিয়া দ্বারা বাহিরে আসিয়া ভিতরের উত্তাপ কমাইয়া না দেয় তাহার ব্যবস্থা এই জিনিসে করা হয়। তাপ পরিচলন বন্ধ করিবার জন্য কাচের পাত্রটি দুইটি বিভিন্ন স্তরে (ক,খ) নির্ম্মিত করা হয় এবং উহাদের মধ্যস্থল বাত বাস্পযোগে বায়ুশূন্য (vacuum) করা হয়। ঐ স্থানে বায়ু নাই বলিয়া পরিচলন প্রক্রিয়া দ্বারা ভিতরের তাপ বাহিরে আসিতে পারে না। পাত্রটির দুইটি কাচের স্তর পরিষ্কার, সংযুক্ত এবং সম্মিলিত। ঐ কাচ পাত্রটির মুখ একটি মোটা কর্ক দ্বারা আবদ্ধ এবং সমগ্র পাত্রটি একটি কর্কের গদির উপর অবস্থিত। ইহাতে তাপ পরিবাহিত খুবই কম হয়। কাচ পাত্রটির অভ্যন্তরস্থ তলদ্বয় খুব চকচকে (polished) বলিয়া ভিতরের তাপ পুনঃ পুনঃ প্রতিফলিত হইয়া ভিতরেই থাকিয়া যায়, বাহিরে বিকিরিত হইতে খুবই কম পারে। এক্ষণে এরূপ পাত্রে গরম দুধ বা চা রাখিলে উহার তাপমাত্রার অনেকক্ষণ কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এই সমগ্র কাচপাত্র ও নীচের ও মুখের কর্কের অংশ একটি ধাতুনির্ম্মিত আধারের ভিতর বসান থাকে।



১২৪নং চিত্র—থার্ম্মোফ্লাস্ক

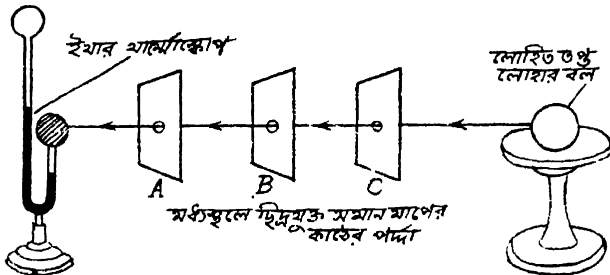
বিকীর্ণ তাপ ও আলোকের তুলনা (Comparison between Radiant Heat and Light): আলোক অধ্যায়ে বিকীর্ণ শক্তি আলোচনাকালে তোমরা দেখিয়াছ বিকীর্ণ তাপ ও আলোক একই বিকীর্ণ শক্তির বিভিন্ন রূপ। ইহাদের প্রকৃতি সমান, শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। বিকীর্ণ শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ·০০০০৪ সে. মি. হইতে ·০০০০৭ সে. মি. মধ্যে থাকে তখন বিকীর্ণ শক্তি আলোক-শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যখন ·০০০০৮ সে. মি. হইতে ·০৩২ সে. মি. মধ্যে থাকে অর্থাৎ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু বেশী হয় তখন বিকীর্ণ শক্তি তাপশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। এই দুই শক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত সাদৃশ্য দেখা যায়।

(১) **বায়ু, বায়ুশূন্য স্থান** বা **রিক্ত স্থানের** (vacuum) **মধ্য দিয়া অবাধ**

গতি ঃ তাপ ও আলোক যেভাবে ধরাপৃষ্ঠে আসে তাহা উপরিউক্ত উক্তি সমর্থন করে।

(২) **উভয়েই সরল পথে একই বেগে** (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল) **গমন করে।** আলোক যে সরল পথে গমন করে তাহা আলোক অধ্যায়ে বহু প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, যেমন কার্ডবোর্ড পরীক্ষা। বিকীর্ণ তাপ যে সরল পথে গমন করে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষা ঃ তিনটি সমান মাপের কাঠের পর্দা (screen) নেওয়া হইল এবং তাহাদের মাঝখানে ছিদ্র করা হইল। একটি লোহিত তপ্ত (red hot) লোহার বল নেওয়া হইল। পর্দা তিনটিকে কিছু দূরত্ব অন্তর সমান্তরালে রাখা হইল এবং একটি পর্দার বিপরীত দিকে লোহিত তপ্ত বলটিকে নেওয়া হইল। পর্দা হইতে

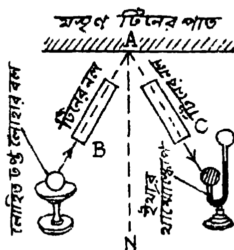


১২৫নং চিত্র—তাপরশ্মির ঋজুরেখ গতি পরীক্ষা

অনেকটা দূরে ঈথার থার্মোস্কোপ যন্ত্রটি রাখা হইল। এখন তিনটি পর্দার ছিদ্র এক সরল রেখায় আনিলে থার্মোস্কোপের কালো গোলকটিতে উষ্ণতা বৃদ্ধি দেখা দিবে। ছিদ্র তিনটিকে সরল রেখায় না রাখিলে থার্মোস্কোপের গোলকটিতে কোন উষ্ণতা বৃদ্ধির নিদর্শন দেখা যাইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তাপরশ্মি সরল পথে গমন করে।

(৩) **বিকীর্ণ তাপ ও আলোক একই নিয়মানুসারে কোন মসৃণ তল বা গোলীয় তল হইতে প্রতিফলিত হয়।** আলোক অধ্যায়ে আলোকের ক্ষেত্রে ইহা আমরা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি। বিকীর্ণ তাপের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা : একটি মসৃণ টিনের সমতল পাতের সহিত সমান কোণে হেলাইয়া দুইটি টিনের নল B ও C রাখা হয় এবং একটি নলের মুখে লোহিত তপ্ত (red hot) বল ও অপর নলের মুখে ঈথার থার্ম্মোস্কোপ গোলকটি রাখা হয়। গোলকটি ও বলের মধ্যে একটি পর্দ্দা AN রাখা হয় যাহাতে বিকীর্ণ তাপরশ্মি সোজাসুজি গোলকটিতে না পড়ে। মসৃণ টিনের পাতটি না থাকিলে C নলের সম্মুখে অবস্থিত থার্ম্মোস্কোপের সাহায্যে বিকীর্ণ তাপের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। কিন্তু মসৃণ টিনের পাতটি থাকিলে থার্ম্মোস্কোপের কালো গোলকটিতে উষ্ণতা বৃদ্ধি দেখা দিবে। C নল সমেত থার্ম্মোস্কোপ বাঁকাইয়া কোণ অসমান করিলে থার্ম্মোস্কোপের কালো গোলকটিতে উষ্ণতা বৃদ্ধি দেখা দিবে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় বিকীর্ণ তাপের ক্ষেত্রে আলোকের ন্যায় আপতন কোণ (angle of incidence) প্রতিফলন কোণের (angle of reflection) সমান।

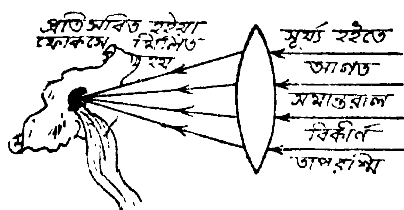


১২৬নং চিত্র—তাপরশ্মির প্রতিফলনের পরীক্ষা

এইবার গোলীয় তলে বিকীর্ণ তাপের প্রতিফলনের নিয়ম পরীক্ষা করা হইবে।

পরীক্ষা : দুইটি বড় গোলীয় ধাতব অবতল দর্পণ মুখোমুখি কিছু দূরে রাখা হইল। যদি একটি লোহিত তপ্ত (red hot) বলকে যে কোন একটি দর্পণের ফোকসে রাখা হয় তবে অপর দর্পণের ফোকসে একখণ্ড দেশলাই কাঠি রাখিলে তাহা শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠে। যেমন আলোকের ক্ষেত্রে একটি ফোকসে লক্ষ্যবস্তু রাখিলে অপর ফোকসে প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় এইক্ষেত্রে সেইরূপ ঘটিতেছে এবং ইহা প্রমাণ করে বিকার্ণ তাপ গোলীয় তলে প্রতিফলনের নিয়ম মানিয়া চলে। বিকীর্ণ তাপ যে প্রতিফলিত হইতেছে তাহা প্রমাণিত হয় এইভাবে। যদি ধাতব অবতল দর্পণ দুইটি না থাকিত তবে দেশলাই কাঠি জ্বলিয়া উঠিত না।

(৪) বিকীর্ণ তাপ ও আলোক একই নিয়মানুসারে প্রতিসরিত হয়। একটি লেন্স বা আতসী কাচ সূর্য্যরশ্মির সম্মুখে ধরিলে যেস্থানে



১২৭নং চিত্র—তাপরশ্মির প্রতিসরণের পরীক্ষা

আলোকরশ্মির ফোকস হয় সেই স্থানে এক টুকরা কাগজ রাখিলে তাহা পুড়িয়া

যায়। ইহাতে বুঝা যায় বিকীর্ণ তাপরশ্মি ও আলোকরশ্মি উভয়ের ফোকৃস একই স্থানে অর্থাৎ উহারা একই নিয়ম অনুসারে প্রতিস্থত হয়।

(৫) **চতুর্দ্দিকে সম বিকিরণ** (uniform radiation) **:** একটি প্রজ্বলিত পদার্থের চতুর্দ্দিকে সমসত্ত্ব মাধ্যমে সম দূরত্বে থার্ম্মোস্কোপ লইয়া পরীক্ষা করিলে একই উষ্ণতার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে। আবার পদার্থটিকে সর্ব্বদিক হইতে সমুজ্জ্বল দেখা যাইবে।

এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকার দরুণ এবং বিকীর্ণ তাপ আমাদের দৃষ্টি অনুভূতি জাগায় না (স্পর্শ অনুভূতি জাগায়) বলিয়া **বিকীর্ণ তাপ অদৃশ্য আলোক বলিয়া অভিহিত হয়।**

বাষ্পীয় এঞ্জিন (Steam Engine) **:** শক্তির রূপান্তরের কথা তোমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছ। আমরা এই অধ্যায়ে তাপশক্তি হইতে যান্ত্রিক শক্তির রূপান্তরের কথা আলোচনা করিব। বাষ্পীয এঞ্জিনে (Steam engine) তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। নিম্নে বাষ্পীয় এঞ্জিনের বর্ণনা ও কার্য্য দেওয়া হইল।

যন্ত্রের বিবরণ ঃ A চুল্লিতে (Furnance) কয়লা পোড়াইয়া L **বয়লারের** (Boiler) জল উত্তপ্ত করিয়া ষ্টীম প্রস্তুত করা হয। বয়লারের সহিত যুক্ত K নলপথে জল বয়লারে প্রবেশ করে। উত্তপ্ত ষ্টীমকে অতি উচ্চ চাপে নলপথে SC **ষ্টীম চেষ্টে** (Steam Chest) পাঠান হয়। M চাবি দিয়া ষ্টীমের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। বয়লারের মাথায় এমন ব্যবস্থা থাকে যাহাতে বয়লারে অত্যধিক ষ্টীম উৎপন্ন হইলে ষ্টীমের প্রচণ্ড চাপে বয়লার ফাটিয়া না যায়। বয়লারে ষ্টীমের চাপ নিরাপত্তা সীমার উর্দ্ধে উঠিলেই N ভাল্‌ব খুলিয়া যায় এবং ষ্টীম নির্গমন-পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। V লিভার, N ভাল্‌বকে নিয়ন্ত্রিত করে। **ষ্টীম চেষ্ট** একটি সুদৃঢ় কক্ষ। ইহার পাদদেশ সম্পূর্ণ সমতল এবং তাহাতে তিনটি ছিদ্র আছে। প্রান্তীয় ছিদ্রদ্বয় SP_1 ও SP_2 ইহাদের (Steam Ports বলে) C **সিলিণ্ডারের** (Cylinder) সহিত সংযুক্ত। মধ্যস্থিত SP_3 ছিদ্রটি সিলিণ্ডারের সহিত যুক্ত নহে। উহা সিলিণ্ডারের পিছন দিয়া বাষ্প-নির্গমন নল (Exhaust pipe) EP এর সহিত সংযুক্ত। একটি ᗝ আকৃতি SV লৌহখণ্ড (ইহাকে Slide Valve বলে) ষ্টীম চেষ্টের সমতল পৃষ্টের উপর বিসর্পিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে ছিদ্রদ্বয়কে উন্মুক্ত ও অবরুদ্ধ করিয়া সিলিণ্ডারে ষ্টীম প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। P, সিলিণ্ডার Cএর পিষ্টন (Piston)

১২৮নং চিত্র—বাষ্পীয় এঞ্জিন

পিষ্টনের সহিত PR পিষ্টন দণ্ড (Piston rod) দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। SV স্লাইড ভাল্বের সহিত VR দণ্ড (ইহাকে Valve rod বলে) সংযুক্ত। PR ও VR যে স্থান দিয়া সিলিণ্ডার ও ষ্টীম চেষ্ট হইতে নির্গত হইয়াছে সেখান দিয়া যাহাতে ষ্টীম বহির্গত হইতে না পারে তজ্জন্য প্রয়োজনমত ব্যবস্থা থাকে এবং তাহা Stuffing Box (SB) নামে পরিচিত। PR পিষ্টন দণ্ড CH সংযোগ দণ্ডের সহিত ক্রস-হেড মাধ্যমে যুক্ত। CH সংযোগ দণ্ড CP ক্রাঙ্ক পিন (Crank Pin) মারফৎ CK ক্রাঙ্ক (Crank) এর সহিত যুক্ত। CK ক্রাঙ্ক CS মূলদণ্ডের (Main Shaft) সহিত যুক্ত। R মূলদণ্ডের দুইটি (Bearing), W ঘূর্ণন চক্র (Fly Wheel) ও E উৎকেন্দ্রিক (Eccentric) মূলদণ্ডের সহিত যুক্ত। ER উৎকেন্দ্রিক দণ্ড VR ভাল্ব দণ্ডের সহিত ক্রস-হেড মাধ্যমে যুক্ত। পিষ্টনের তথা PR পিষ্টনদণ্ড ও CH সংযোগ দণ্ডের এদিক-ওদিক রৈখিক গতি (linear motion) CK ক্রাঙ্কের সাহায্যে CS মূলদণ্ডের ঘূর্ণন গতিতে (rotatory motion) পরিণত হয়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে PR পিষ্টন দণ্ড বা CH সংযোগ দণ্ড এবং VR ভাল্ব দণ্ড বা ER উৎকেন্দ্রিক দণ্ড CS মূলদণ্ডের সহিত উৎকেন্দ্রিক-ভাবে এমন করিয়া যুক্ত থাকে যে উহাদের গতি সর্ব্বদাই বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ যখন PR পিষ্টন দণ্ড ডাহিনে যায় VR ভাল্ব দণ্ড বামে যায়।

ক্রিয়া ঃ বয়লার হইতে অতিতাপিত ষ্টীম (Super-heated steam) অতি উচ্চ চাপে (at a very high pressure) নলপথে SC ষ্টীম চেষ্টে পাঠান হয়। প্রথম অবস্থায় ধরা যাক উক্ত ষ্টীম SP_1 ছিদ্রপথে C সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে (SP_2 ছিদ্রপথ তখন SV স্লাইড ভাল্ব দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে ; ১২৮নং চিত্র দেখ) ও P পিষ্টনকে ডাহিনের দিকে ঠেলিতে আরম্ভ করে। পিষ্টনের অবস্থান স্লাইড ভাল্বের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রিত করে। P পিষ্টন যখন ষ্টীমের চাপে ডাহিনের দিকে সরিয়া যায় তখন SV স্লাইড ভাল্ব বামে যায়। P পিষ্টন ডাইনে সরিবার সময় SV স্লাইড ভাল্বের মধ্য দিয়া প্রান্তীয় SP_2 ছিদ্রপথ ও মধ্যস্থিত SP_3 ছিদ্রপথের যোগ সাধিত হয়। P পিষ্টনের ডাহিনে ষ্টীম থাকিলে তাহা এই সময়ে SP_2 ও SP_3 ছিদ্রপথ দিয়া বাহিত হইয়া EP বাষ্প-নির্গমন নলের মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায় (বা কখনও এই ষ্টীম Condenserএ জমাইয়া জল করিয়া তাহা আবার বয়লারের জন্য ব্যবহৃত হয় ; চিত্রে Condenser দেখান হয় নাই)। P পিষ্টন প্রায় এক তৃতীয়াংশ

পথ সরিলে SV স্লাইড ভাল্ব SP_1 ছিদ্রপথের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে। তখন আর C সিলিণ্ডারে ষ্টীম প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে ষ্টীম প্রবেশ করিয়াছিল তাহাই P পিষ্টনকে ঠেলিয়া আয়তনে বাড়ে ও উহার চাপ হ্রাস পায়। P পিষ্টন যখন একেবারে ডাহিনে সরিয়া যায় তখন SV স্লাইড ভাল্ব সরিয়া গিয়া SP_1 ও SP_3 ছিদ্রপথের মধ্যে যোগ সাধন করে। এই সময় SP_2 ছিদ্রপথের মুখ খুলিয়া গিয়া ষ্টীম চেষ্ট হইতে ষ্টীম ঐ পথে C সিলিণ্ডারে প্রবেশ করে ও P পিষ্টনকে ঠেলিয়া বামে সরায়। P পিষ্টনের বামে অবস্থিত ষ্টীম SP_1 ও SP_3 ছিদ্রপথ দিয়া বাহিত হইয়া EP বাষ্প-নির্গমন নলের মধ্য দিয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায় বা Condenserএ নীত হইয়া আবার জলে পরিণত হইয়া বয়লারে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে P পিষ্টন ডাহিনে ও বামে বা অগ্রে ও পশ্চাতে যাতাযাত করে। P পিষ্টনের এই রৈখিক গতি CK ক্রাঙ্ক মারফৎ CS মুলদণ্ডের ঘূর্ণন গতিতে পরিণত হয়। P পিষ্টনের একবার অগ্র ও একবার পশ্চাৎ গতিতে CS মুলদণ্ডের তথা W ঘূর্ণন চক্রের এক সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হয়। প্রত্যেক আবর্ত্তনে দুইবার—P পিষ্টনের প্রত্যেক গতির শেষ ও প্রথম মুহূর্ত্তে P পিষ্টন মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া যায় এবং CK ক্রাঙ্ক ও CH সংযোগ দণ্ড এক সরল রেখায় আসে। এই দুই মুহূর্ত্তে CS মুলদণ্ডের উপর P পিষ্টনের কোন ঘূর্ণন ফল (turning effect) থাকে না। পিষ্টনের এই দুই অবস্থিতি **স্থির বিন্দু** (dead points) নামে পরিচিত। CS মূলদণ্ডের প্রত্যেক আবর্ত্তনে CK ক্রাঙ্ক CH সংযোগ দণ্ডের সহিত দুইবার সমকোণ উৎপন্ন করে। তখন P পিষ্টনের ঘূর্ণন ফল সর্ব্বোচ সীমায় উপনীত হয়। CS মূলদণ্ডের সহিত যুক্ত প্রকাণ্ড, ভারী W ঘূর্ণন চক্র মুলদণ্ডকে সমগতি সম্পন্ন করে। CS মুলদণ্ডের ঘূর্ণন গতি মূলদণ্ডের সহিত যুক্ত কপিকল ও বেল্ট দ্বারা যে কোন যন্ত্রে সঞ্চালিত করা যায়।

রেল গাড়ীর এঞ্জিনে (Locomotive) এই একই নীতি কার্য্যকরী থাকে। ঐ এঞ্জিনে বয়লারের নীচে দুইটি পার্শ্বে দুইটি পিষ্টন থাকে। ইহা ক্রাঙ্ক দ্বারা বিরাট গতি-উৎপাদন চাকার (driving wheel) সহিত যুক্ত থাকে। বয়লারের সম্মুখে ধূম-প্রকোষ্ঠ (smoke box) ও পশ্চাতে প্রকাণ্ড অগ্নি-প্রকোষ্ঠ (fire box) থাকে।

Questions

1. What are the sources of heat? Discuss in general the effects of heat on matter.
2. Distinguish between heat and temperature. What are the effects of heat on solid bodies?
3. Explain the construction of a mercurial thermometer. Why are thermometer tubes usually of fine bore and why are they provided with bulbs?
4. Describe a clinical thermometer. Why is mercury chosen as a thermometric substance?
5 Describe Six's thermometer to determine maximum and minimum temperatures.
6. Describe, with experiment, the effect of heat on water. Is there any peculiarity in its behaviour between 0°C and 4°C? Is so, explain how it helps marine animals in the Arctic Seas.
7. What do you mean by the following terms—Fusion, Solidification, Evaporation, Boiling, Melting point, Freezing point and Boiling point?
8. State and explain the laws of Fusion.
9. Devise an experiment to determine the melting or freezing point of a substance.
10. Devise an experiment to determine the boiling point of a liquid.
11. State and explain the various factors that influence the rate of evaporation of a liquid.
12. Describe, with suitable examples, the various modes of transmission of heat.
13. What do you mean by the term 'thermal conductivity of a substance? Explain the statement that the thermal conductivity of glass is ·002 C. G. S. unit.
14. Describe an experiment to compare the conductivities of two metals in the form of rods.
15. Explain the working of a thermos flask.
16. Explain the working of Davy's safety lamp.
17. Explain the principle of ventilation.
18. Compare radiant heat with light,
19. Describe the principle and action of a steam engine giving a neat diagram.

পঞ্চম অধ্যায়

রসায়ন-বিদ্যা (*Chemistry*)

অক্সাইড, অ্যাসিড বা অম্ল, ক্ষারক ও লবণ

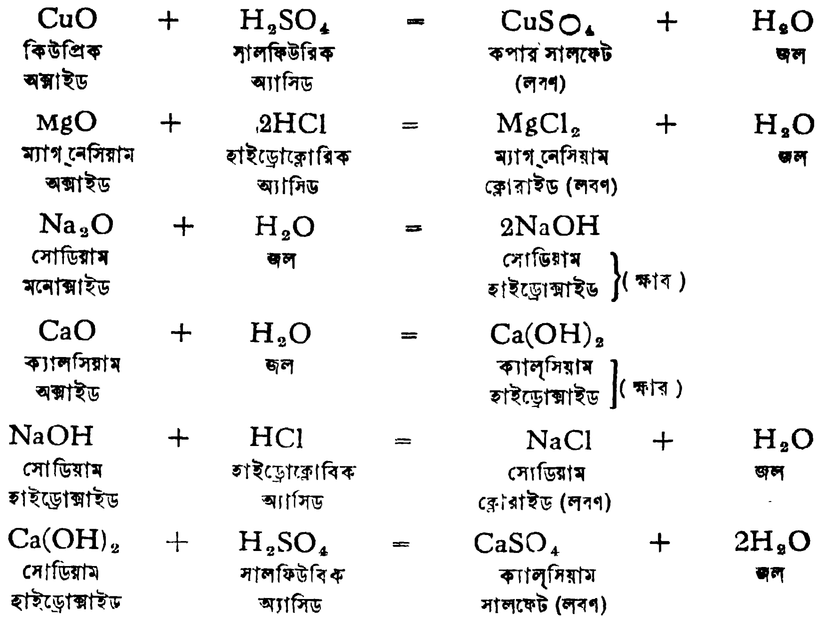
(Oxides, Acids, Bases and Salts)

আমরা চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত জড় পদার্থ দেখিতে পাই তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, উহাদের উপাদান এক বা একাধিক **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল** (Element)। আমরা প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিষয় অবগত আছি। এই ৯২টি মৌল ব্যতীত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাগারে নূতন মৌলের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অক্সাইড, অ্যাসিড বা অম্ল, ক্ষারক, লবণ ইত্যাদি জড় পদার্থ দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়। নিম্নে ইহাদের বিশদ আলোচনা করা হইল।

অক্সাইড (Oxides) **:** দুইটি মৌলিক পদার্থ বা মৌলের মধ্যে একটি যদি অম্লজান হয় তবে তাহাদের সমন্বয়ে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটিকে **অক্সাইড** (Oxides) বলে। অক্সাইডসমূহকে উহাদের ধর্ম্ম ও ব্যবহার অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় **:** (i) **ক্ষারকীয় অক্সাইড** (Basic Oxide), (ii) **আম্লিক অক্সাইড** (Acidic Oxide), (iii) **প্রশম অক্সাইড** (Neutral Oxide), (iv) **উভধর্ম্মী অক্সাইড** (Amphoteric Oxide) ও (v) **প্যারক্সাইড** (Peroxide)।

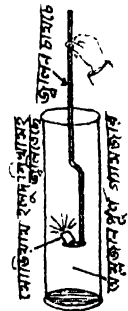
(i) ক্ষারকীয় অক্সাইড (Basic Oxide) **:** সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইড (oxides of metals) এই শ্রেণীর অন্তর্গত যেমন কিউপ্রিক অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম মনোক্সাইড, ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি। এই জাতীয় অক্সাইড অ্যাসিডের সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার ফলে লবণ* ও জল উৎপন্ন করে। কতকগুলি অক্সাইড জলের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষার (Alkali) উৎপন্ন করে। এই সমস্ত দ্রবণ লাল লিটমাসকে (Red litmus) নীল রঙে পরিবর্ত্তিত করে। ক্ষারগুলি অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে।

* লবণের সংজ্ঞা ১৭৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

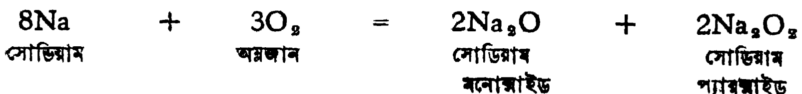


CuO	+	H_2SO_4	=	$CuSO_4$	+	H_2O	
কিউপ্রিক অক্সাইড		সালফিউরিক অ্যাসিড		কপার সালফেট (লবণ)		জল	
MgO	+	$2HCl$	=	$MgCl_2$	+	H_2O	
ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড		হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড		ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)		জল	
Na_2O	+	H_2O	=	$2NaOH$			
সোডিয়াম মনোক্সাইড		জল		সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড	(ক্ষার)		
CaO	+	H_2O	=	$Ca(OH)_2$			
ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড		জল		ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড	(ক্ষার)		
$NaOH$	+	HCl	=	$NaCl$	+	H_2O	
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড		হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড		সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)		জল	
$Ca(OH)_2$	+	H_2SO_4	=	$CaSO_4$	+	$2H_2O$	
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড		সালফিউরিক অ্যাসিড		ক্যাল্‌সিয়াম সালফেট (লবণ)		জল	

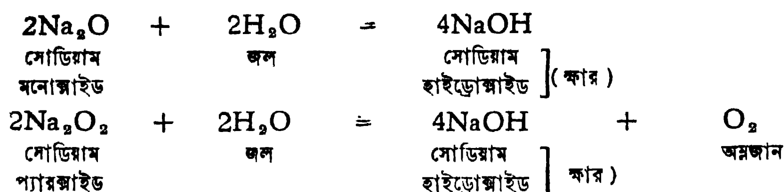
প্রথম পরীক্ষা ঃ একটি জ্বালন-চামচে (deflagrating spoon) ছোট একখণ্ড সোডিয়াম ধাতু লইয়া চামচটি উত্তপ্ত করিলে উহা গলিয়া যাইবে এবং ধীরে ধীরে জ্বলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় ঐ চামচটি অম্লজানপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইলে তাহা হলুদ শিখাসহ উজ্জ্বল-ভাবে জ্বলিতে থাকিবে। এই প্রজ্জ্বলনের ফলে সোডিয়াম মনোক্সাইড ও সোডিয়াম প্যারক্সাইড উৎপন্ন হইবে। গ্যাসজারে সামান্য জল ঢালিয়া চামচটি ডুবাইয়া দাও। ফলে তীব্র ক্ষারকীয় দ্রব (alkaline solution) উৎপন্ন হয় এবং ইহা লাল লিটমাস (Red litmus) দ্রবণকে নীলরঙে পরিবর্তিত করে।



১২৯নং চিত্র—ক্ষারকীয় অক্সাইডের পরীক্ষা



$8Na$	+	$3O_2$	=	$2Na_2O$	+	$2Na_2O_2$
সোডিয়াম		অম্লজান		সোডিয়াম মনোক্সাইড		সোডিয়াম প্যারক্সাইড



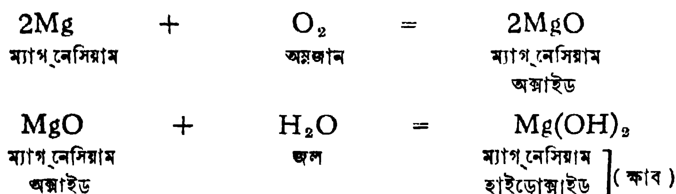
$$2Na_2O + 2H_2O = 4NaOH$$

সোডিয়াম মনোক্সাইড + জল = সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (ক্ষার)

$$2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$$

সোডিয়াম প্যারক্সাইড + জল = সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (ক্ষার) + অম্লজান

দ্বিতীয় পরীক্ষা ঃ একটি জ্বলন্ত ম্যাগ্‌নেসিয়ামের তার যদি অম্লজান গ্যাসজারে প্রবেশ করান হয় তবে উহা প্রখর আলোকরশ্মির সৃষ্টি করে এবং অতি দ্রুত পুড়িয়া যায়। গ্যাসজারের মধ্যে যে ছাই পড়িয়া থাকে তাহা ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড। ইহাকে গরম জলে দ্রব করিয়া উহার মধ্যে লাল কয়েক ফোঁটা লিটমাস দ্রবণ ঢালিলে উহা ঈষৎ নীল হইয়া যায়।



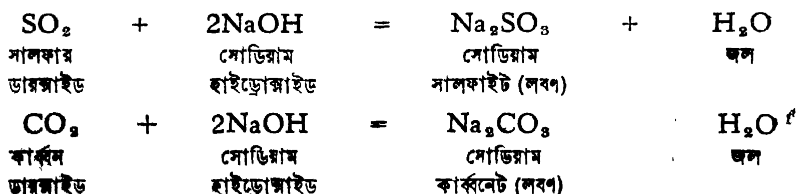
$$2Mg + O_2 = 2MgO$$

ম্যাগ্‌নেসিয়াম + অম্লজান = ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড

$$MgO + H_2O = Mg(OH)_2$$

ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড + জল = ম্যাগ্‌নেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (ক্ষার)

আম্লিক অক্সাইড (Acidic Oxide) **:** সাধারণতঃ অধাতব অক্সাইড (oxides of non-metals) এই শ্রেণীর অন্তর্গত ; যেমন সালফার ডায়ক্সাইড, কার্ব্বন ডায়ক্সাইড, নাইট্রোজেন পেণ্টোক্সাইড, ফস্‌ফরাস পেণ্টোক্সাইড ইত্যাদি। এই জাতীয় অক্সাইড ক্ষারের (alkalies) সহিত সতত ক্রিয়াশীল হয় এবং উহার ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই অক্সাইডগুলি জলে দ্রবীভূত হইয়া অ্যাসিডের সৃষ্টি করে এবং অ্যাসিডের একটি গুণ হইল নীল লিটমাসকে (Blue litmus) লাল রঙে পরিবর্ত্তিত করা।

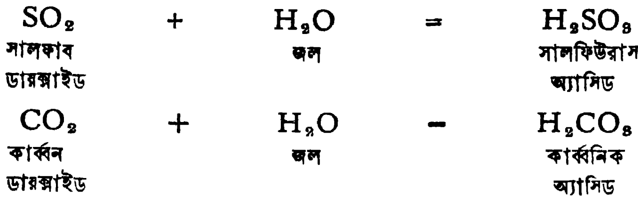


$$SO_2 + 2NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$$

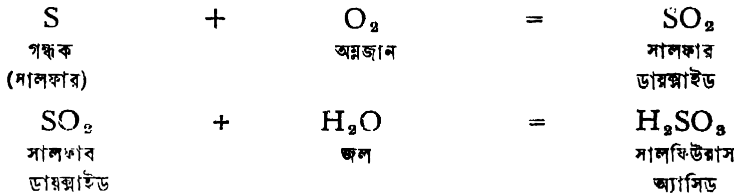
সালফার ডায়ক্সাইড + সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড = সোডিয়াম সালফাইট (লবণ) + জল

$$CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 \quad H_2O$$

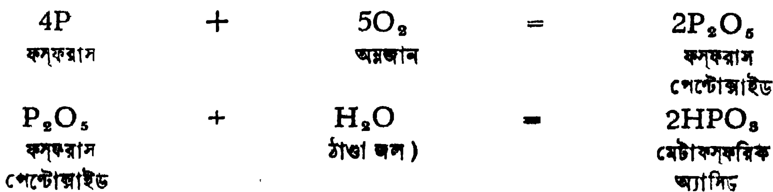
কার্ব্বন ডায়ক্সাইড + সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড = সোডিয়াম কার্ব্বনেট (লবণ) জল

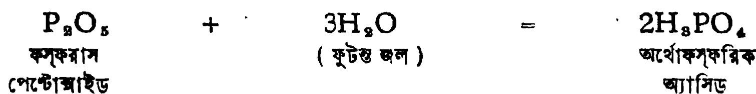


প্রথম পরীক্ষা: একটি জ্বালন-চামচে (deflagrating spoon) সামান্য গন্ধক (sulphur) লইয়া চামচটি উত্তপ্ত করিলে গন্ধক ঈষৎ নীলাভ শিখাসহ জ্বলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় উহাকে অম্লজানপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে গন্ধক উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। এই দহনের ফলে সালফার ডায়ক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস জলে দ্রবীভূত হইলে সালফিউরাস অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং ইহা নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিবর্ত্তিত করে।



দ্বিতীয় পরীক্ষা: একটি জ্বালন-চামচে একখণ্ড ফস্‌ফরাস লইয়া চামচটি উত্তপ্ত করিলে ফস্‌ফরাস জ্বলিতে থাকিবে। এই অবস্থায় উহাকে অম্লজানপূর্ণ গ্যাস জারে প্রবেশ করাইলে দেখা যাইবে উহা অতি তীব্র উজ্জ্বলতার সহিত জ্বলিতেছে। এই দহনের ফলে ফস্‌ফরাস পেন্টোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই ছাইকে **ঠাণ্ডা জলে** (cold water) দ্রবীভূত করিলে মেটাফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও **ফুটন্ত জলে** (boiling water) দ্রবীভূত করিলে অর্থোফস্‌ফরিক অ্যাসিড (ইহাকে সচরাচর ফস্‌ফরিক অ্যাসিড বলে) পাওয়া যায়। ইহা নীল লিটমাসকে লাল রঙে পরিবর্ত্তিত করে।




$$P_2O_5 + 3H_2O = 2H_3PO_4$$

(৩) **প্রশম অক্সাইড** (Neutral Oxide) : যে সমস্ত অক্সাইড অ্যাসিড বা ক্ষার কাহারও সহিত ক্রিয়া করে না এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থাতেও লিটমাসের রঙের কোন পরিবর্ত্তন করে না তাহাদিগকে **প্রশম অক্সাইড** বলা হয় ; যেমন জল (H_2O), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ইত্যাদি।

উভধর্ম্মী অক্সাইড (Amphoteric Oxide) : যে সমস্ত অক্সাইডে আম্লিক ও ক্ষারীয় গুণ উভয়ই বর্ত্তমান তাহাদিগকে উভধর্ম্মী অক্সাইড বলে অর্থাৎ যে সমস্ত অক্সাইড অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সহিত ক্রিয়াশীল হইয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাদিগকে **উভধর্ম্মী অক্সাইড** (Amphoteric Oxide) বলে। যেমন জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO), অ্যালুমিনিযাম অক্সাইড (AL_2O_3) ইত্যাদি।

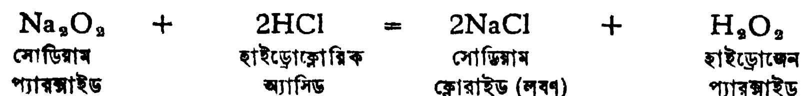
আম্লিক ব্যবহার :

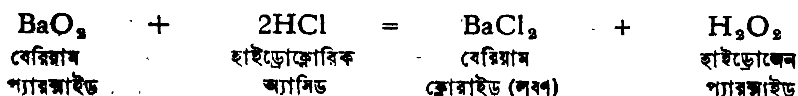

$$ZnO + 2NaOH = Zn(ONa)_2 + H_2O$$

ক্ষারকীয় ব্যবহার :


$$ZnO + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2O$$

প্যারক্সাইড (Peroxide) : যে সকল ধাতব অক্সাইডে অতিরিক্ত পরিমাণ অম্লজান সংযুক্ত আছে দেখা যায় এবং যাহারা অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিলে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করে তাহাদিগকে **প্যারক্সাইড** (Peroxide) বলে। যেমন সোডিয়াম প্যারক্সাইড (Na_2O_2), বেরিয়াম প্যারক্সাইড (BaO_2) ইত্যাদি।


$$Na_2O_2 + 2HCl = 2NaCl + H_2O_2$$


$$BaO_2 + 2HCl = BaCl_2 + H_2O_2$$

অ্যাসিড বা **অম্ল** (Acids) **:** হাইড্রোজেন বা উদজানের যৌগিক পদার্থ **অ্যাসিড** বা **অম্ল** বলিয়া খ্যাত হইবে যখন **উক্ত** হাইড্রোজেন বা উদজান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধাতু বা ধাতব অক্সাইড় বা ধাতব হাইড্রোক্সাইড দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ প্রস্তুত করে। সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ইত্যাদি অ্যাসিডের উদাহরণ। কেন ইহাদের অ্যাসিড বলা হইল তাহা নিম্নের সমীকরণগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

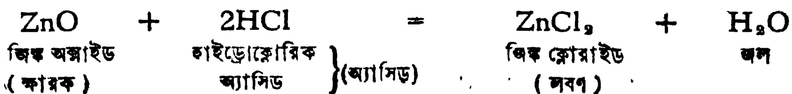


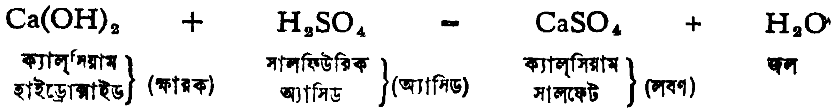




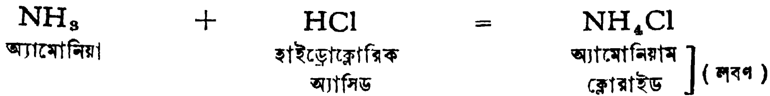
অ্যাসিড বা **অম্লের ধর্ম্ম** (Properties of Acids) **:** অ্যাসিড বা অম্লের আস্বাদ টক্। ইহা জলে দ্রবণীয়। দ্রবণ নীল লিটমসেকে লাল রঙে পরিবর্ত্তিত করে। অনেকগুলি অ্যাসিড বা অম্ল ধাতুর সহিত ক্রিয়া করিয়া হাইড্রোজেন বা উদজান গ্যাস উৎপন্ন করে। অ্যাসিড বা অম্ল ক্ষারের (alkalies) সংস্পর্শে আসিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং ফলে লবণ ও জল উৎপন্ন হয়।

ক্ষারক (Bases) **:** ধাতব অক্সাইড বা ধাতব হাইড্রোক্সাইড যাহা অ্যাসিড বা অম্লের সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাহাকে **ক্ষারক** (Bases) বলে। যেমন জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO), ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ca(OH)_2$, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), পোটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) ইত্যাদি।





অ্যামোনিয়া (NH_3), ফসফিন (PH_3) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ কোন ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড না হইলেও অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ার ফলে লবণ প্রস্তুত করে কিন্তু জল উৎপন্ন হয় না। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে ইহাদের ক্ষারক বলা যায় না কিন্তু ইহাদের ক্ষারক বলিয়া ধরা হয়।



ক্ষার (Alkalies ক্ষারকীয় হাইড্রোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইলে তাহাকে (Alkalies) বলে। যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH), পোটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH), ক্যাল্‌সিযাম হাইড্রোক্সাইড [$Ca(OH)_2$] ইত্যাদি। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Al(OH)_2$], ফেরিক হাইড্রোক্সাইড [$Fe(OH)_3$] ইত্যাদি জলে দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং ইহারা ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নহে। সমস্ত ক্ষার ক্ষারক কিন্তু সমস্ত ক্ষারক ক্ষার নহে (all alkalies are bases but all bases are not alkalies)। ক্ষার লাল লিটমাসকে নীল রঙে পরিণত করে। সচরাচর এই সকল দ্রবণ সাবানের মত হাতে পিচ্ছিল লাগে।

লবণ (Salts) **:** অ্যাসিড বা অম্লের হাইড্রোজেন বা উদজান আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধাতু বা ক্ষারীয় মূলক (Basic radical) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া যে যৌগ উৎপন্ন করে, তাহাকে **লবণ** (Salts) বলে। সুতরাং লবণে ধাতু বা ক্ষারকীয মূলক (basic radical) অধাতু বা আম্লিক মূলকের (acidic radical) সহিত যুক্ত থাকে। জিঙ্ক সালফেট ($ZnSO_4$), সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট ($CaCO_3$) ইত্যাদি লবণে জিঙ্ক, সোডিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম ক্ষারকীয় মূলক ও সালফেট (SO_4), ক্লোরাইড (Cl) ও কার্ব্বনেট (CO_3) আম্লিক মূলক।

লবণের শ্রেণীবিভাগ : (Types of Salts) **:** লবণ প্রধানত: তিন প্রকারের **:** (১) **শমিত লবণ** (Normal Salts), **অম্ল লবণ** (Acid Salts) ও (৩) **ক্ষার লবণ** (Basic Salts)।

শমিত লবণ (Normal Salts) **:** অ্যাসিড বা অম্লের সমস্ত হাইড্রোজেন

বা উদজান ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে **শমিত লবণ** বলে। যেমন সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4), পোটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি। সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) সমস্ত হাইড্রোজেন বা উদজান সোডিয়াম ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। নাইট্রিক অ্যাসিডের (HNO_3) সমস্ত হাইড্রোজেন বা উদজান পোটাসিয়াম ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইযা পোটাসিযাম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।

অম্ল লবণ (Acid Salts): অ্যাসিড বা অম্লের আংশিক হইড্রোজেন বা উদজান ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইযা যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে **অম্ল লবণ** বলে। যেমন পোটাসিযাম বাইকার্ব্বনেট ($KHCO_3$), সোডিযাম বাইসালফেট ($NaHSO_4$) ইত্যাদি। পোটাসিযাম বাইকার্ব্বনেটের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে কার্ব্বনিক অ্যাসিডের (H_2CO_3) সমস্ত হাইড্রোজেন বা উদজান ধাতু বা মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয নাই। সোডিয়াম বাইসালফেটের ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) সমস্ত হাইড্রোজেন বা উদজান ধাতু বা ক্ষারায মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় নাই। সেজন্য ইহারা অম্ল লবণ।

ক্ষার লবণ (Basic Salts): যে লবণে ক্ষারকীয় অংশ বেশী থাকে (excess of a base) তাহাকে **ক্ষার লবণ** বলে। এই উদ্বৃত্ত ক্ষারকীয় অংশ আম্লিক মূলক (acidic radical) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইযা শমিত লবণ প্রস্তুত করিতে পারে। ক্ষারকীয় লেড ক্লোরাইড [Pb(OH)Cl] লবণে লেড ক্ষারকীয় মূলক ছাড়াও (OH) ক্ষারকীয অংশ আছে। ক্ষারকীয অংশ বেশী আছে বলিযা ইহাকে ক্ষার লবণ বলে।

কয়েকটি লবণের সহিত পরিচয় (General knowledge of some salts): আমরা দৈনন্দিন জীবনে বহু প্রকার লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা যে সমস্ত আহার্য্য গ্রহণ করি তাহাতে নানা জাতীয় লবণ থাকে। তাহাদের মধ্যে সাধারণ লবণ বা নুন (common salt) অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রধান। তাহা ছাড়া রহিয়াছে লৌহঘটিত লবণ, পটাসঘটিত লবণ, ক্যাল্‌সিয়াম ঘটিত লবণ, ফস্‌ফরাস ঘটিত লবণ ইত্যাদি। আহার্য্য ছাড়া পোষাক পরিচ্ছদ, বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আমরা অনেক প্রকার লবণ ব্যবহার করি যেমন সোডিয়াম কার্ব্বনেট বা কাপড়-কাচার সোডা ইত্যাদি। কতকগুলি লবণের গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা নিম্নে আলোচনা করিব।

সোডিয়াম ক্লোরাইড বা **সাধারণ খাদ্যলবণ** (Sodium chloride বা Common Salt ; NaCl) : সোডিয়াম ও ক্লোরিণ এই দুইটি মৌলের সমন্বয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ বা যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক ভাষায় ইহা একটি লবণ। এই যৌগিক পদার্থটি প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সমুদ্রজলে গড়ে শতকরা ২.৬ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। লবণের খনিতে প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। বহু স্থানে লবণ হ্রদ বা উপসাগর বিশুষ্ক হইয়া গিয়া প্রধানতঃ লবণের স্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্থান হইতে প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে অধিকাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ সমুদ্রজল হইতে প্রস্তুত করা হয়। পাঞ্জাবের খেওড়া ও রাজপুতানার কলাবাগের লবণখনি হইতেও সাধারণ লবণ সংগৃহীত হয়। রাজপুতানার সম্বর হ্রদের জলেও প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে। সেই জলকে বাষ্পীভূত করিয়া সাধারণ লবণ প্রস্তুত করা হয়।

সমুদ্রজল হইতে সাধারণ লবণ প্রস্তুতকরণ (Preparation of Sodium chloride from sea-water) : গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রতীরে অগভীর ও প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সমুদ্রজল রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ও বায়ুপ্রবাহে দ্রুত বাষ্পীভবন ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ফলে দ্রবণটি যখন যথেষ্ট গাঢ় হয় তখন উহা হইতে সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হয় (crystallises)। ইহা সংগ্রহ করিয়া সাধারণ লবণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

শীতপ্রধান দেশে এইভাবে সমুদ্রজলকে গাঢ় করা সুকঠিন। সেইজন্য সমুদ্র জলকে শীতলীকৃত করিয়া উহাকে আংশিকভাবে কঠিন বরফে পরিণত করা হয় এবং বরফ পৃথক করিয়া লইয়া সমুদ্রজলকে গাঢ় করা হয়। তারপর তাপের সাহায্যে বাষ্পীভবন ক্রিয়া দ্রুত হারে চলে এবং তাহা হইতে সোডিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত হয়। ইহা সংগ্রহ করিয়া সাধারণ লবণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম ক্লোরাইডের ধর্ম্ম ও **ব্যবহার** (Properties of Sodium chloride and Uses) : বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড বর্ণহীন, স্ফটিকাকার, কঠিন পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। সাধারণ খাদ্যলবণ আর্দ্র বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহা বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়।

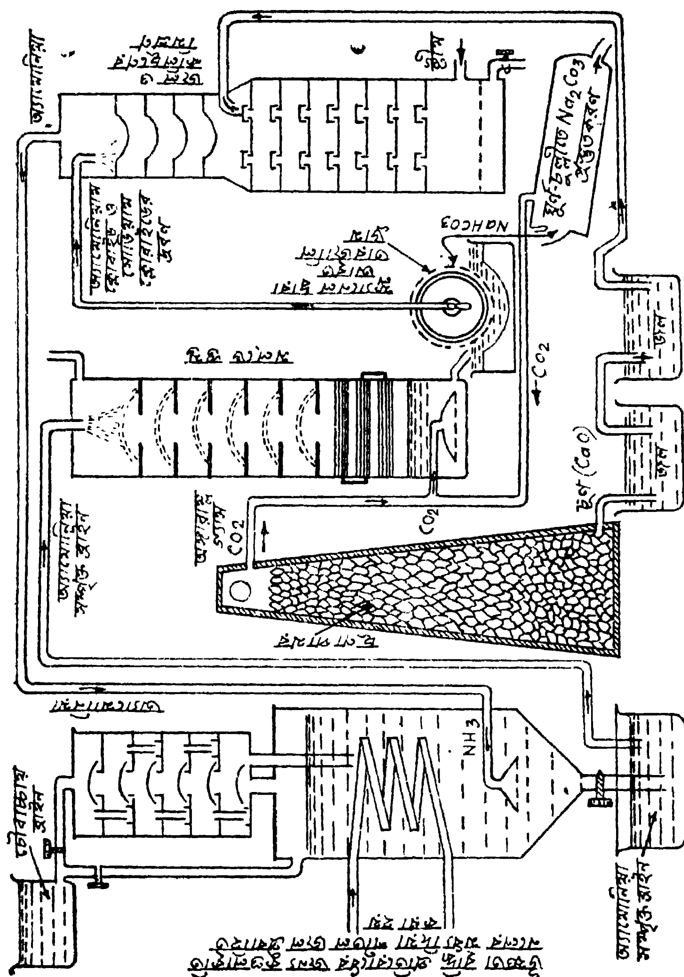
সোডিয়াম ক্লোরাইড বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ খাদ্যলবণ হিসাবে

ইহার ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বহুবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুতকরণে ইহা ব্যবহৃত হয় যেমন কষ্টিক সোডা, সোডিয়াম কার্ব্বনেট, সোডিয়াম সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ক্লোরিণ ইত্যাদি। পচন নিবারক (preservative) হিসাবে ইহার ব্যবহার নগণ্য নহে।

সোডিয়াম কার্ব্বনেট (Sodium carbonate ; Na_2CO_3) : সোডিয়াম কার্ব্বনেট একটি যৌগিক পদার্থ এবং রাসায়নিক ভাষায় ইহা একটি লবণ। ইহাতে তিনটি মৌল আছে—সোডিয়াম, কার্ব্বন ও অম্লজান। সমুদ্রে যে সকল উদ্ভিদ্ পাওয়া যায় সেই সকল উদ্ভিদ্‌কে পোড়াইলে উহার ভস্মে সোডিয়াম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে এইভাবে সোডিয়াম কার্ব্বনেট প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমানে উন্নত পদ্ধতিতে এই অতি প্রযোজনীয় যৌগিক পদার্থটি প্রস্তুত হয। উন্নত পদ্ধতি তিনটি : (১) **লেঁ ব্লাঙ্ক পদ্ধতি** (Leblanc Process), (২) **অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি** বা **সল্‌ভে পদ্ধতি** (Ammonia-Soda Process or Solvay's Process) ও (৩) **বৈদ্যুতিক পদ্ধতি** (Electrolytic Process)। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অধিকতর সুবিধাজনক বলিয়া অধিকাংশ দেশে এই পদ্ধতির সাহায্যে সোডিয়াম কার্ব্বনেট উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষে এই পদ্ধতিতে টাটা কেমিক্যালস্ কর্তৃক (Tata Chemicals Ltd.) সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত মিঠাপুরে (Mithapur) সোডিয়াম কার্ব্বনেট উৎপাদিত হয। নিম্নে এই পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হইল।

অ্যামোনিয়া সোডা পদ্ধতি বা **সল্‌ভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্ব্বনেট শিল্পোৎপাদন** (Manufacture of Sodium Carbonate by Ammonia Soda Process or Solvay's Process) : সাধারণ লবণের দ্রবণ বা লবণোদক (brine) প্রথমে অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা একটি লোহার ট্যাঙ্কে সম্পৃক্ত করিয়া লওয়া হয়। উপরিস্থিত একটি চৌবাচ্চা হইতে লবণোদককে ধীরে ধীরে ঐ লোহার ট্যাঙ্কে পাঠান হয এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসকে ট্যাঙ্কের নীচের দিক দিয়া পাঠান হয়। অ্যামোনিয়া গ্যাস ঊর্দ্ধদিকে বুদ্‌বুদের ন্যায় উঠিবার সময় লবণোদকে দ্রবীভূত হয। অ্যামোনিয়া গ্যাস সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত নাও হইতে পারে। এই সম্ভাবনা থাকায় ঐ গ্যাসকে একটি ছোট স্তম্ভের মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হয়। এই স্তম্ভের মধ্যে কতকগুলি ঢাকৃনিযুক্ত লোহার প্লেট আড়াআড়ি ভাবে সাজান থাকে এবং

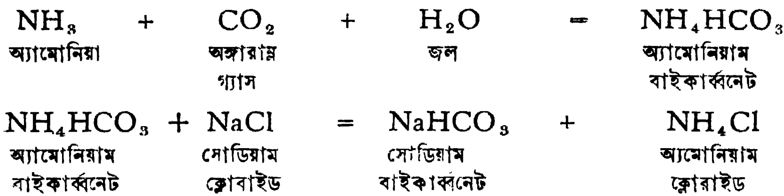
উপরিস্থিত চৌবাচ্চা হইতে কিছু পরিমাণ লবণোদক ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। ফলে সমস্ত অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হয়। অ্যামোনিয়া দ্রবীভূত হইবার সময় তাপের উদ্ভব হয় এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধি অ্যামোনিয়ার দ্রাব্যতা (solubility) হ্রাস



১৩০নং চিত্র—সল্‌ভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপাদন

করে। উষ্ণতা-বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য ট্যাঙ্কস্থিত কুণ্ডলাকৃতি নলের ভিতর দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করা হয়। এইভাবে অ্যামোনিয়া সম্পৃক্ত লবণোদক (nearly

saturated solution of ammonical brine) উৎপন্ন করিয়া পাম্পের সাহায্যে একটি ঢালাই লৌহ নির্ম্মিত সু-উচ্চ স্তম্ভের উপর (Solvay's Tower) লইয়া যাওয়া হয় এবং উহাকে ধীরে ধীরে স্তম্ভের ভিতর প্রবাহিত করা হয়। স্তম্ভের অভ্যন্তরে কতকগুলি লোহার প্লেট আড়াআড়ি ভাবে সাজান এবং তাহার উপর ছিদ্রযুক্ত ঢাক্‌নি থাকে। চূণ-চুল্লীতে চুণাপাথরকে (limestone) বিয়োজিত করিয়া উহা হইতে উৎপন্ন অঙ্গারাম্ল গ্যাস (carbon dioxide) অধিক পরিমাণে সলৃভে টাওযারের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রথমে অ্যামোনিয়াম বাইকার্ব্বনেট উৎপন্ন হয়। তারপর অ্যামোনিয়াম বাইকার্ব্বনেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড পরস্পরের সহিত বিক্রিয়া করিয়া সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট ও অ্যামোনিযাম ক্লোরাইডে পরিণত হয়।



$$NH_3 + CO_2 + H_2O = NH_4HCO_3$$

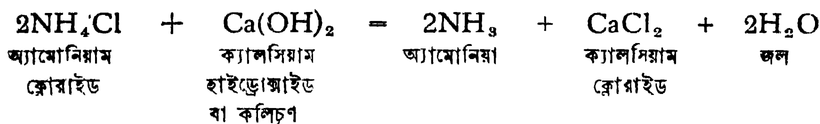
$$NH_4HCO_3 + NaCl = NaHCO_3 + NH_4Cl$$

সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটের দ্রবণীয়তা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ইহা স্ফটিকাকারে দ্রবণের মধ্যে প্রলম্বিত (suspended) অবস্থায় থাকে। সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটকে ছাঁকিয়া পৃথক করা হয়। এইজন্য একটি অণুপ্রেস-পরিস্রুতি ব্যবস্থা (vacuum filtration) প্রয়োগ করা হয়। তারজালি সম্পন্ন ড্রামকে (wire-gauze drum) ফ্লানেল কাপড় দ্বারা আবৃত রাখা হয় এবং ড্রামের মধ্যে চাপ পাম্পের সাহায্যে যথাসাধ্য কম রাখা হয়। সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটসহ সমস্ত দ্রবণকে ফ্লানেলের উপর ঢালিয়া দিতে থাকিলে সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট ফ্লানেল কাপড়ের বাহিরে লাগিয়া যায় এবং দ্রবণটি ড্রামের মধ্যে প্রবেশ করে। সংগৃহীত সোডিয়াম বাই-কার্ব্বনেটকে তারপর ঘূর্ণ চুল্লীতে (rotatory furnace) ১৮০°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয়। ফলে সোডিয়াম কার্ব্বনেট ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়।



$$2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

এই অঙ্গারাম্ল গ্যাসকে সলূভে স্তম্ভে পরে ব্যবহার করা হয়। ড্রামের মধ্যে যে দ্রবণটি পড়ে তাহাতে প্রধানতঃ থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হইতে অ্যামোনিয়া উদ্ধার করিয়া উহাকে অ্যামোনিয়া সম্পৃক্ত ব্রাইন প্রস্তুতকরণে ব্যবহার করা হয়। ড্রাম হইতে দ্রবণটিকে পাম্প করিয়া একটি সুউচ্চ স্তম্ভের উপরে লইয়া যাওয়া হয় এবং দ্রবণটিকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে পরিচালিত করা হয়। চুণ-চুল্লী হইতে উৎপন্ন ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণকে জলের সাহায্যে ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইডে বা কলিচুণে পরিণত করিয়া জল ও কলিচুণের মিশ্রণকে স্তম্ভের প্রায় মাঝামাঝি স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করান হয়। স্তম্ভের নীচের দিক দিয়া ষ্টীম পরিচালিত করা হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া ও ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। এই অ্যামোনিয়াকে আবার অ্যামোনিয়া সম্পৃক্ত ব্রাইন প্রস্তুতকরণে ব্যবহার করা হয় (১৬০নং চিত্র দেখ)।



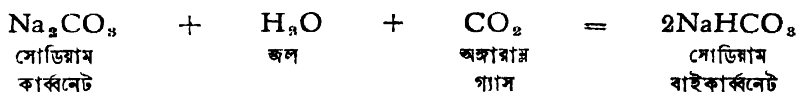
$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

সোডিয়াম কার্ব্বনেটের ধর্ম্ম ও ব্যবহার (Properties of Sodium carbonate and Uses): সোডিয়াম কার্ব্বনেট স্বচ্ছ, স্ফটিকাকার, কঠিন পদার্থ এবং ইহার প্রত্যেক অণুতে ১০টি জলের অণু সংযুক্ত থাকে ($Na_2CO_3, 10H_2O$)। ইহাই বাজারে **'কাপড়-কাচা সোডা'** নামে পরিচিত। শুষ্ক বায়ুতে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে এই স্ফটিক হইতে জল বাষ্পীভূত হইয়া যায় এবং একটি নূতন গুঁড়া সোডিয়াম কার্ব্বনেটের উদ্ভব হয়। উহার প্রতি অণুতে একটি মাত্র জলের অণু থাকে (Na_2CO_3, H_2O)। অধিকতর উত্তাপে সম্পূর্ণ জল দূরীভূত হইয়া **অনার্দ্র** সোডিয়াম কার্ব্বনেটে (anhydrous sodium carbonate: Na_2CO_3) পরিণত হয়। ইহাকে **সোডা-ভস্ম** বা Soda Ash বলে। সোডিয়াম কার্ব্বনেটকে আরও উত্তপ্ত করিলে 832° সেন্টিগ্রেডে ইহা তরলে পরিণত হয় কিন্তু ইহা বিযোজিত (decomposes) হয় না। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং জলীয় দ্রব মৃদু ক্ষারগুণসম্পন্ন।

কাচ, সাবান, কষ্টিক সোডা প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে প্রচুর সোডিয়াম কার্ব্বনেটের প্রয়োজন হয়। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পেও যথেষ্ট সোডিয়াম কার্ব্বনেট ব্যবহৃত হয়।

বস্ত্র ও অন্যান্য বস্তু পরিষ্করণে, জলের খরতা (hardness) দূরীকরণে ও অন্যান্য আরও বহুবিধ কার্য্যে এই বস্তুটির প্রয়োজন হয়।

সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট বা **বেকিং সোডা** (Sodium bicarbonate or Baking Soda ; $NaHCO_3$) **:** সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট একটি আম্লিক লবণ। ইহাতে চারিটি মৌল আছে—সোডিয়াম, উদজান, কার্ব্বন ও অম্লজান। অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি বা সল্‌ভে পদ্ধতির সাহায্যে এই যৌগটি প্রস্তুত করা যায়। সোডিয়াম কার্ব্বনেটের সম্পৃক্ত দ্রবণের (saturated solution) মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরিচালিত করিলে সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটের দানা পৃথক হইয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটের অপর একটি সাধারণ নাম **বেকিং সোডা** (Baking Soda)।



$$Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 = 2NaHCO_3$$

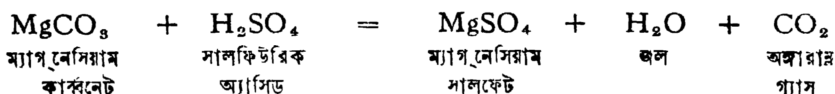
সোডিয়াম কার্ব্বনেট   জল   অঙ্গারাম্ল গ্যাস   সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট

সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটের ধর্ম্ম ও **ব্যবহার** (Properties of Sodium bicarbonate and Uses) **:** সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট সাদা বর্ণের কঠিন পদার্থ। ইহাকে উত্তপ্ত করিলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নিজে সোডিয়াম কার্ব্বনেটে পরিণত হয়।

ইহা বহুল পরিমাণে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা হজমে সাহায্য করে এবং কোনস্থান পুড়িয়া গেলে বেকিং সোডার লোশন (এক পাইণ্ট উষ্ণ জলে বড় চামচের এক চামচ সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট দিলে এই লোশন হয়) লাগাইলে জ্বালা কমে এবং ফোস্কা পড়ে না। কেক্, পাউরুটি প্রভৃতি তৈরী করিতে যে **বেকিং পাউডার** (Baking Powder) ব্যবহৃত হয় তাহা সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট ($NaHCO_3$) ও পোটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারট্রেট এই দুইটি যৌগিক পদার্থের মিশ্রণ। শুষ্ক অবস্থায় এই দুইটি যৌগের মধ্যে কোন বিক্রিয়া হয় না। জলের সংস্পর্শে বিক্রিয়া ঘটে এবং তার সঙ্গে অঙ্গারাম্ল গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ উঠে। ময়দার লেইয়ের মধ্যে ছোট ছোট বুদ্‌বুদগুলি আবদ্ধ থাকে ; লেই উত্তপ্ত হইলে বুদ্‌বুদ্‌গুলি প্রসারিত হইয়া পাউরুটি, কেক্ ইত্যাদিকে বেশ ফোলাইয়া তোলে।

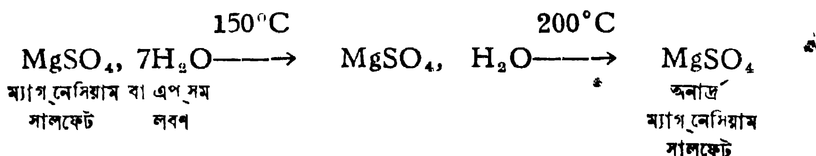
ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট (Magnesium Sulphate ; $MgSO_4$) **:** ইহা একটি লবণ। ইহাতে তিনটি মৌল আছে—ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সালফার বা গন্ধক

ও অম্লজান। খনিজ কেজারাইটকে (Kieserite ; $MgSO_4,H_2O$) ফুটন্ত জলে দ্রবীভূত করিয়া (ঠাণ্ডা জলে ইহা প্রায় দ্রবীভূত হয় না) তারপর কেলাসিত করিলে যে **স্ফটিক** দানা পাওয়া যায়, তাহাকে ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট বা **এপ্‌সম লবণ** (Epsom Salt ; $MgSO_4, 7H_2O$) বলে। ইহার প্রতি অণুতে ৭টি জলের অণু যুক্ত থাকে। পরীক্ষাগারে (Laboratory) এই যৌগিক পদার্থটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করা হয়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্ব্বনেটের সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (dilute sulphuric acid) মিশাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বুদ্বুদন বন্ধ হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্ব্বনেটের বিক্রিয়ায় অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং জলীয় দ্রবণে ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট থাকে। দ্রবণকে ছাঁকিয়া পরিস্রুতকে (filtrate) বাষ্পাভবন দ্বারা গাঢ় করিলে ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেটের স্ফটিক দানা পাওয়া যায়। ইহাকে ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট বা **এপ্‌সম লবণ** (Epsom Salt ; $MgSO_4, 7H_2O$) বলে।



$$MgCO_3 + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2O + CO_2$$

ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেটের ধর্ম্ম ও **ব্যবহার** (Properties of Magnesium Sulphate and Uses) : ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট স্বচ্ছ, বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। উহা জলে খুব দ্রবণীয়। উত্তপ্ত করিলে প্রায় ১০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহা ৪টি জলের অণু হারায় এবং প্রায় ২০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উহা সম্পূর্ণ **অনার্দ্র** (anhydrous) হইয়া পড়ে।

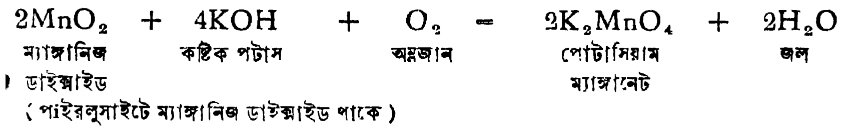


$$MgSO_4, 7H_2O \xrightarrow{150^\circ C} MgSO_4, H_2O \xrightarrow{200^\circ C} MgSO_4$$

ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফেট ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া কাগজ, বস্ত্র, চর্ম্ম ইত্যাদি শিল্পে ইহার ব্যবহার আছে।

পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (Potassium Permanganate ; $KMnO_4$) : ইহা একটি লবণ। ইহাতে তিনটি মৌল আছে—পোটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও অম্লজান। পাইরলুসাইট (pyrolusite) নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতে

পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রস্তুত করা যায়। পাইরলুসাইটে ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড (MnO_2) থাকে। কাল রং-এর এই খনিজ পদার্থটি ভারতবর্ষে যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাইরলুসাইটকে স্বক্ষ্মভাবে চুর্ণ করিয়া কষ্টিক পটাসের (KOH) সহিত একটি সংবৃত চুল্লীতে (Muffle furnace) বায়ুর সহিত সংস্পর্শ রাখিয়া গলাইয়া ফেলা হয়। ইহার ফলে সবুজ রঙের পোটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট প্রস্তুত হয়।

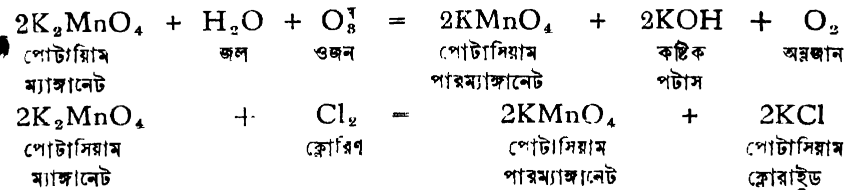


$$2MnO_2 + 4KOH + O_2 = 2K_2MnO_4 + 2H_2O$$

ম্যাঙ্গানিজ ডাইক্সাইড — কষ্টিক পটাস — অম্লজান — পোটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট — জল

(পাইরলুসাইটে ম্যাঙ্গানিজ ডাইক্সাইড থাকে)

তারপর জলের সাহায্যে দ্রবণীয় অংশ বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং দ্রবণটির মধ্য দিয়া ওজন গ্যাস বা ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করা হয়। ফলে পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের গাঢ় লাল রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়। ইহাকে গাঢ় করিলে গাঢ় লাল রঙের দানা পৃথক হইয়া যায়। ইহাই পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।



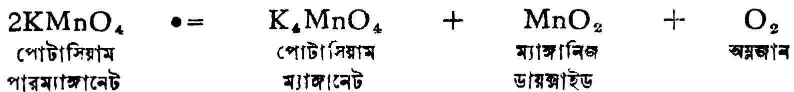
$$2K_2MnO_4 + H_2O + O_3 = 2KMnO_4 + 2KOH + O_2$$

পোটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট — জল — ওজন — পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট — কষ্টিক পটাস — অম্লজান

$$2K_2MnO_4 + Cl_2 = 2KMnO_4 + 2KCl$$

পোটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট — ক্লোরিণ — পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট — পোটাসিয়াম ক্লোরাইড

পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের ধর্ম্ম ও ব্যবহার (Properties of Potassium Permanganate and Uses): পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গাঢ় লাল রঙের স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে দ্রবণীয় এবং সেই দ্রবণের রঙ গাঢ় লাল রঙের হয়। ইহাকে উত্তপ্ত করিলে অম্লজান পাওয়া যায়।



$$2KMnO_4 = K_4MnO_4 + MnO_2 + O_2$$

পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট — পোটাসিয়াম ম্যাঙ্গানেট — ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড — অম্লজান

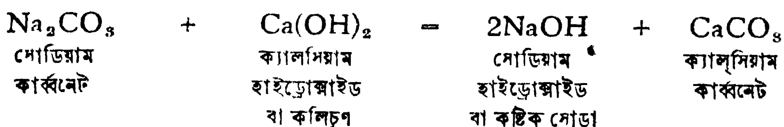
পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জারক হিসাবে (oxidising agent) ব্যবহৃত হয়। ইহা বীজাণুনাশক ; ইহা ঔষধরূপে ও বীজঘ্ন (disinfectant) রূপে ব্যবহৃত হয়। কূপের বা পুকুরের দূষণীয় জল পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ দিয়া পরিষ্কার করা হয়। কোন জীবজন্তু বা পোকামাকড় কামড়াইলে এমন কি সর্পাঘাতেও ক্ষতস্থানে পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগাইলে কিছু উপকার পাওয়া যায়।

স্মেলিং-সল্টস্ (Smelling Salts) **:** অ্যামোনিয়াম বাইকার্ব্বনেটের সহিত লাভেণ্ডার (lavender) বা অন্য কোন সুগন্ধি বস্তু মিশাইয়া স্মেলিং-সল্টস্ প্রস্তুত করা হয়। ঔষধ হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে ঝাঁজালো অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) বাহির হয়। ইহার ঘ্রাণ লইলে তরল সর্দ্দিতে কষ্ট পাইতেছে লোকের কিছুটা কষ্টের লাঘব হয়। হঠাৎ ফিট্ হইলে বা অবসাদ বোধ করিলে স্মেলিং-সল্টস্ শোঁকতে হয়। তাহা হইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা **কষ্টিক সোডা** (Sodium Hydroxide or Caustic Soda ; NaOH) **:** ইহা লবণ নহে, তীব্র ক্ষার (strong alkali)। ইহাতে তিনটি মৌল আছে—সোডিয়াম, অম্লজান ও উদজান।

ব্যবহারিক জীবনে ইহার বহুল ব্যবহার আছে বলিয়া প্রত্যেক দেশেই এই যৌগিক পদার্থটিকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। ইহার প্রস্তুতির দুইটি পদ্ধতি আছে **:** (১) **ক্ষারীকরণ পদ্ধতি** (Causticising Process) ও **তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি** (Electrolytic Process)।

(১) **ক্ষারীকরণ পদ্ধতিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড** বা **কষ্টিক সোডা শিল্পোৎপাদন** (Manufacture of Caustic Soda by Causticising Process) **:** এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্ব্বনেটের লঘু দ্রবণের (30% Na_2CO_3 solution) সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ [$Ca(OH)_2$)] মিশাইয়া ঐ মিশ্রণকে ষ্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করিতে হয় (দ্রবণের উষ্ণতা মোটামুটি ৮০° হইতে ৯০° সেণ্টিগ্রেডে রাখা হয়)। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ঐ দ্রবণে কষ্টিক সোডা ও ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট উৎপন্ন হয়।



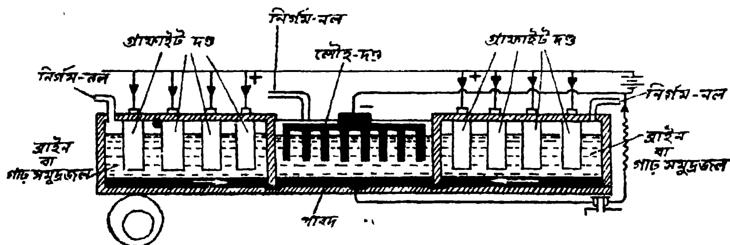
$$Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 = 2NaOH + CaCO_3$$

সোডিয়াম কার্ব্বনেট	ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচূণ	সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা	ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট

ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট জলে অদ্রবণীয় কিন্তু কষ্টিক সোডা অত্যন্ত দ্রবণীয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট থিতাইয়া যায় এবং উপর হইতে কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণ আস্রাবণ (decantation) করিয়া লওয়া হয়। কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণটি পৃথক করিয়া অহ্রপ্রেষ পাতন (vacuum distillation) সাহায্যে উহার জলীয় অংশ যথাসম্ভব বাষ্পীভূত করিয়া দেওয়া হয়। দ্রবণে যখন

কষ্টিক সোডার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ থাকে তখন উহাকে খোলা লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া কষ্টিক সোডায় পরিণত করা হয়। তারপর ইহাকে আবার গলাইয়া যষ্টির আকারে ঢালাই করা হয় (cast into sticks)। এই পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডা উৎপাদন করিলে খরচ বেশী পড়ে। সেইজন্য অধিকাংশ দেশে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ দ্বারা কষ্টিক সোডা উৎপাদন করা হয়।

(২) **তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড** বা **কষ্টিক সোডা শিল্পোৎপাদন** (Manufacture of Caustic Soda by Electrolytic Process) : এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা খাদ্য লবণের গাঢ় দ্রবণ বা **গাঢ় সমুদ্রজলের** তড়িৎ-বিশ্লেষণ ঘটাইয়া প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন প্রকার সেলে এই বিশ্লেষণ করা হয়। নিম্নে ক্যাসনার-কেলনার সেলের (Castner-Kellner Cell) বর্ণনা দেওয়া হইল। শ্লেট দ্বারা প্রস্তুত প্রশস্ত কিন্তু অগভীর ট্যাঙ্ক লওয়া হয়। প্রতিটি ট্যাঙ্ক দুইটি শ্লেট প্রাচীর দ্বারা তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত থাকে এবং প্রাচীর দুইটি পারদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের মেঝের উপর কিছুটা পারদ থাকে। চাকার উপর বসান ট্যাঙ্কটিকে উঁচু ও নীচু করিয়া এক প্রকোষ্ঠের পারদ অপর প্রকোষ্ঠে গড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। পারদের উপর প্রথম ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ব্রাইন অথবা গাঢ় সমুদ্রজল লওয়া হয় এবং দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে পারদের উপর জল থাকে। কয়েকটি গ্রাফাইট দণ্ড প্রথম ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ব্রাইন অথবা গাঢ় সমুদ্রজলের মধ্যে নিমজ্জিত রাখা হয় এবং ইহা অ্যানোডের

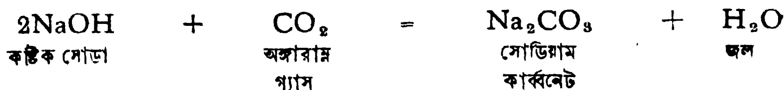


১৩১নং চিত্র—কষ্টিক সোডা উৎপাদন

(anode) কাজ করে। কয়েকটি লৌহ দণ্ড মধ্যস্থিত প্রকোষ্ঠের জলের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং ইহা ক্যাথোডের (cathode) কাজ করে। সমস্ত ট্যাঙ্কটি আবৃত থাকে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের উপর দিকে গ্যাস নির্গমনের জন্য নির্গম

নল থাকে। গ্রাফাইট অ্যানোড ও লোহার ক্যাথোড যথারীতি ব্যাটারীর সহিত যুক্ত করিয়া দিলে দ্রবণের ভিতর দিয়া তড়িৎ পরিচালিত হয়। ইহার ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লেষিত হইয়া গ্রাফাইটে ক্লোরিণ ও পারদে সোডিয়াম উৎপন্ন হয়। ক্লোরিণ গ্যাস নির্গমন-নল দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং এই গ্যাস হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড, ব্লীচিং পাউডার বা বিরঞ্জক চূর্ণ ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন সোডিয়াম ধাতু পারদের সহিত মিশিয়া সোডিয়াম পারদমিশ্র (sodium amalgam) সৃষ্টি করে। চাকার উপর বসান ট্যাঙ্কটিকে দোলাইলে সোডিয়াম পারদমিশ্র বাহিরের প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া আসে। এখানে জলের সহিত সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটে এবং ফলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা ও উদজান গ্যাস উৎপন্ন হয়। উদজান গ্যাস লৌহ ক্যাথোডে উৎপন্ন হয় ও নির্গমন-নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। কষ্টিক সোডা দ্রবণ পারদের উপর মধ্য প্রকোষ্ঠে থাকিয়া যায়। যখন বিক্রিয়ার ফলে মধ্য প্রকোষ্ঠের জল শতকরা ২০ ভাগ কষ্টিক সোডা দ্রবণে পরিণত হয় তখন উহাকে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। কষ্টিক সোডার লঘু দ্রবণটিকে খোলা লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া **কঠিন** সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে বা কষ্টিক সোডায় পরিণত করা হয়। তারপর ইহাকে আবার গলাইয়া যষ্টির আকারে ঢালাই করা হয় (cast into sticks)।

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা **কষ্টিক সোডার ধর্ম** ও **ব্যবহার** (Properties of Caustic Soda and Uses): সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি সাদা, অতি উদগ্রাহী (highly deliquescent), স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। ইহা একটি তীব্র ক্ষার এবং দেহের সংস্পর্শে আসিলে উহা দাহ ও ক্ষতের সৃষ্টি করে। বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাস আহরণ করিয়া ইহা সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়।



$$2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$$

2NaOH	+	CO_2	=	Na_2CO_3	+	H_2O
কষ্টিক সোডা		অঙ্গারাম্ল গ্যাস		সোডিয়াম কার্বনেট		জল

বহুবিধ শিল্পে কষ্টিক সোডার বহুল ব্যবহার দেখা যায়—সাবান, কাগজ, বস্ত্র, কৃত্রিম রেশম ইত্যাদি। ইহা ছাড়া পেট্রোলিয়াম শোধনে ও ল্যাবরেটরীতে বিকারক (reagent) হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরিণ (Chlorine)

রাসায়নিক চিহ্ন / Symbol — Cl | সঙ্কেত / Formula — Cl_2

পরমাণু ক্রমাঙ্ক / Atomic Number — 17 | পারমাণবিক গুরুত্ব / Atomic Weight — 35·46

স্ফুটনাঙ্ক / Boiling Point — 34·6°C | গলনাঙ্ক / Melting Point — 101·6°C

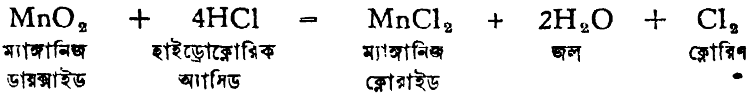
বৈজ্ঞানিক **সীলে** (Scheele) ক্লোরিণ আবিষ্কার করেন। মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে ক্লোরিণ থাকে না। ইহার প্রকৃতিলব্ধ যৌগগুলির মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্লোরিণ প্রস্তুতকরণ (Preparation of Chlorine): বিভিন্ন উপায়ে ক্লোরিণ প্রস্তুত করা যায়। কয়েকটা উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল

(১) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে তড়িৎ সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করিয়া (by decomposition) বা উহাকে অন্য যৌগিক পদার্থের সাহায্যে (যেমন ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড, বায়ু, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি) জারিত করিয়া (by oxidation)

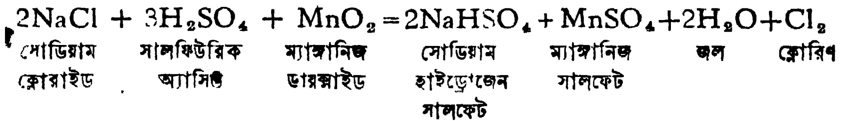


$$2HCl = H_2 + Cl_2$$



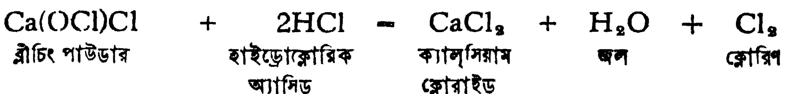
$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

(২) যে কোন ধাতব ক্লোরাইড (যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, পোটাসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি) ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইডকে উত্তপ্ত করিয়া



$$2NaCl + 3H_2SO_4 + MnO_2 = 2NaHSO_4 + MnSO_4 + 2H_2O + Cl_2$$

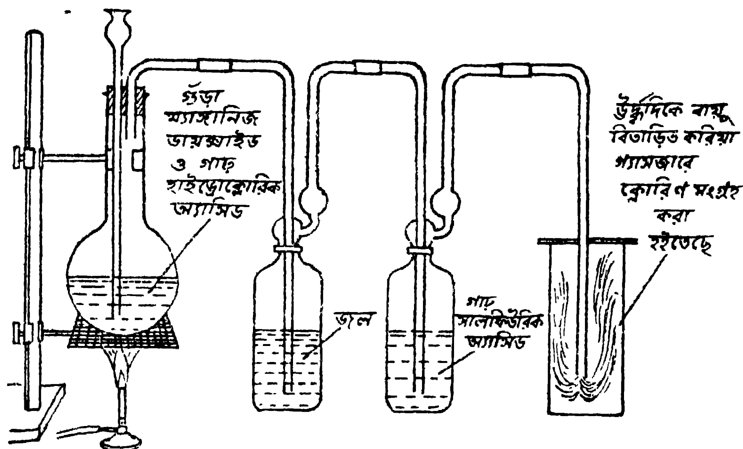
(৩) ব্লীচিং পাউডারের উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়া দ্বারা



$$Ca(OCl)Cl + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + Cl_2$$

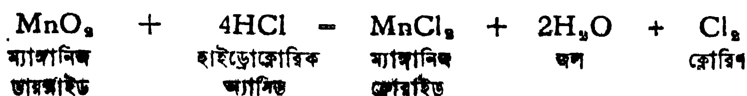
পরীক্ষাগারে ক্লোরিণ প্রস্তুতকরণ (Laboratory method of preparation of Chlorine): একটি কাচকুপীতে গুঁড়া ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড লওয়া

হইল। কাচকুপীর মুখের ছিপির মধ্যে দিয়া একটি দীর্ঘনাল ফানেল (Thistle funnel) ও একটি নির্গম-নল (delivery tube) লাগান থাকে। ফানেলের মধ্য দিয়া কাচকুপীতে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালা হইল এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ফানেলের প্রান্তটি অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। কাচকুপীটি তারজালির উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে উত্তাপ দেওয়া হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরিণ



১৩২নং চিত্র—পরীক্ষাগারে ক্লোরিণ প্রস্তুতকরণ

গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নির্গম-নল দিয়া বাহির হয়। এই গ্যাসের সহিত কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বাষ্প ও জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। এইজন্য নির্গত গ্যাসটিকে জল ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড পূর্ণ দুইটি ধাবন-বোতলের (wash bottle) মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। জলের বোতলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বাষ্প ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বোতলে জলীয় বাষ্প অবশোষিত হয় (absorbed)। ক্লোরিণ গ্যাসের উপর ইহাদের কোন ক্রিয়া হয় না। ক্লোরিণ বায়ু অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ ভারী। পরিশোধিত ক্লোরিণ ঊর্দ্ধদিকে বায়ু বিতাড়িত করিয়া (upward displacement of air) গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়।



$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$$

ম্যাঙ্গানিজ ডায়ক্সাইড	হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড	জল	ক্লোরিণ

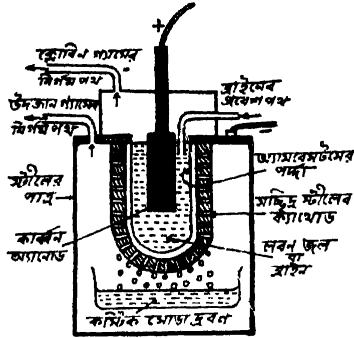
ক্লোরিণের শিল্পোৎপাদন (Manufacture of Chlorine): অধিক পরিমাণে ক্লোরিণ উৎপাদনে সাধারণতঃ তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় :

(১) **ওয়েলডন পদ্ধতি** (Weldon's Process)—ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে পাইরলুসাইট খনিজ দ্বারা জারিত করা হয় ;

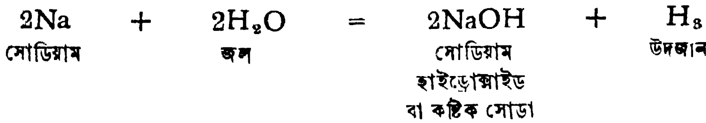
(২) **ডিকনের পদ্ধতি** (Deacon's Process)—এই পদ্ধতিতে কিউপ্রিক ক্লোরাইড অনুঘটকের (catalytic agent) উপস্থিতিতে বায়ুর অম্লজান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে জারিত (oxidises) করিয়া ক্লোরিণ প্রস্তুত করে।

(৩) **তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি** (Electric Method): এই পদ্ধতির সাহায্যে সোডিযাম ক্লোরাইডকে বিশ্লিষ্ট করিযা ক্লোরিণ উৎপাদন করা হয়। বর্ত্তমানে ক্লোরিণ উৎপাদনের জন্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় কারণ ইহাতে খরচ কম পড়ে। সমুদ্রের জলকে আংশিক বাষ্পীভূত করিয়া ফেলিলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটি গাঢ় দ্রবণ পাওয়া যায়। ইহার ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বিশ্লিষ্ট হয় এবং অ্যানোডে (anode) ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়। এই ক্লোরিণ বেশ গাঢ়, বিশুদ্ধ ও সহজপ্রাপ্য। কষ্টিক সোডা প্রসঙ্গ আলোচনাকালে এই পদ্ধতির একটি বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ক্যাসনার-কেলনার সেল (Castner-Kellner Cell) ছাড়াও আরও অনেক রকম সেলে এই বিশ্লেষণ করা হয়। তাহাদের নাম নেলসন সেল (Nelson Cell), গিবস্ সেল (Gibbs Cell), ভোর্স সেল (Vorce Cell) ইত্যাদি। নিম্নে নেলসন সেলের সাহায্যে ক্লোরিণ উৎপাদনের বিবরণ দেওয়া হইল। নেলসন সেলে U-আকৃতির একটি সচ্ছিদ্র ষ্টীল বা ইস্পাতের পাত্র থাকে এবং তাহার ভিতর-কার গাত্র অ্যাসবেসটসের পর্দ্দা দ্বারা মোড়া থাকে। পাত্রের উপর দিক হইতে বিশুদ্ধ লবণজল বা ব্রাইন (NaCl) পাত্রের মধ্যে পাঠান হয় এবং পাত্রের মধ্যে সর্ব্বদা ইহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট তল পর্য্যন্ত রাখা হয। সচ্ছিদ্র ষ্টীল বা ইস্পাতের পাত্রটিকে আর একটি ষ্টীল বা ইস্পাতের পাত্রের মধ্যে রাখা হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া ষ্টীম প্রবাহিত থাকে। ষ্টীম লবণজল বা ব্রাইনকে উত্তপ্ত রাখে, ইহার রোধকে হ্রাস করে (reduces its resistance) এবং সচ্ছিদ্র ষ্টীল পাত্রের ছিদ্রগুলিকে উন্মুক্ত রাখে। লবণজল বা ব্রাইনের মধ্যে নিমজ্জিত কার্ব্বন দণ্ড অ্যানোডের

(carbon anode) কার্য্য করে এবং সচ্ছিদ্র ষ্টীল পাত্র ক্যাথোডের (perforated steel cathode) কার্য্য করে। কার্ব্বন অ্যানোডকে ব্যাটারীর পজিটিভের সহিত ও সচ্ছিদ্র ষ্টীলের পাত্রটিকে ব্যাটারীর নেগেটিভের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। সচ্ছিদ্র ষ্টীল পাত্রের মধ্যে লবণজল বা ব্রাইন অ্যাসবেসটস চুযাইয়া বাহির হইয়া আসে এবং তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ক্লোরিণ কার্ব্বন অ্যানোডে উৎপন্ন হয় এবং সোডিয়াম সচ্ছিদ্র ষ্টীল ক্যাথোডে উৎপন্ন হয়। সচ্ছিদ্র ষ্টীল পাত্রের উপরের নির্গমন-পথ দিয়া ক্লোরিণ বাহির হইয়া আসে [ক্লোরিণ গ্যাসকে বিশুদ্ধ ও চাপে ঠাণ্ডা করিয়া তরলীভূত করা হয় এবং হলদে রঙের তরল ক্লোরিণকে ষ্টীলের সিলিণ্ডারে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়]। ক্যাথোডে উৎপন্ন সোডিয়াম জলের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সোডিযাম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা ও উদজান উৎপন্ন করে।



১৩৩নং চিত্র—নেলসন সেলে ক্লোরিণ উৎপাদন



$$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2$$

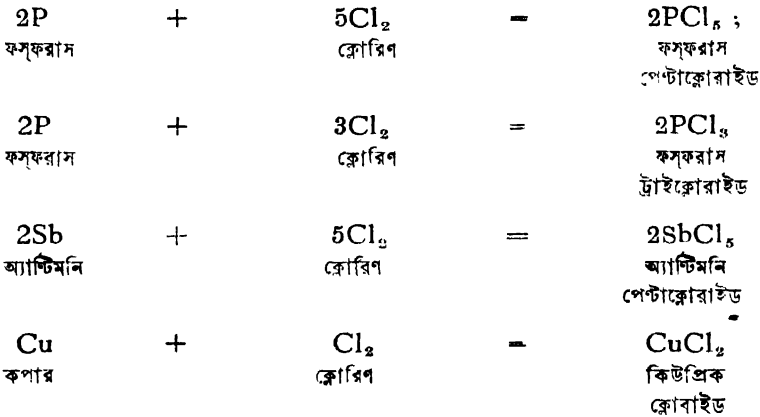
সোডিয়াম + জল = সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডা + উদজান

উদজান গ্যাস ষ্টীল পাত্রের উপরের নির্গমন-পথ দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কষ্টিক সোডার দ্রবণ নিম্নের একটি পাত্রে জমা হয় এবং সেখান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং ঐ দ্রবণ হইতে কষ্টিক সোডা উৎপাদন করা হয়।

ক্লোরিণের ধর্ম্ম (Properties of Chlorine): (১) ক্লোরিণ হরিতাভ পীত (greenish yellow) বর্ণের তীব্র অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত বিষাক্ত গ্যাস। ইহা শুকিলে নাক ও গলা জ্বালা করে। দেহের ত্বক (skin) ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে (mucous membrane) ইহা মারাত্মকভাবে আক্রমণ করে। বায়ুর চেয়ে ইহা

প্রায় আড়াই গুণ ভারী (heavy)। ইহা জলে বেশ কিছুটা দ্রবণীয় (moderately soluble in water) কিন্তু গাঢ় লবণ জলে খুব সামান্যই দ্রবণীয়। শীতল অবস্থায় অল্প চাপে ক্লোরিণ তরলীভূত (liquefies) হয়।

(২) **ক্লোরিণ দাহ্য নহে** কিন্তু অম্লজানের ন্যায় **দহন কার্য্যে সাহায্য করে।** ফস্‌ফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, কপার, সোডিয়াম প্রভৃতি মৌল ক্লোরিণ গ্যাসের সংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে ও উহাদের ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। অধিকাংশ ধাতু ও অধাতুর সহিত ক্লোরিণ গ্যাসের সোজাসুজি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং ফলে তাহাদের ক্লোরাইড প্রস্তুত হয। কিন্তু ক্লোরিণ গ্যাসের **কার্ব্বন** বা **অঙ্গার, অম্লজান** ও **সোরাজানের** উপর কোন ক্রিয়া নাই।



$2P$ ফস্‌ফরাস	$+$	$5Cl_2$ ক্লোরিণ	$=$	$2PCl_5$; ফস্‌ফরাস পেণ্টাক্লোরাইড
$2P$ ফস্‌ফরাস	$+$	$3Cl_2$ ক্লোরিণ	$=$	$2PCl_3$ ফস্‌ফরাস ট্রাইক্লোরাইড
$2Sb$ অ্যান্টিমনি	$+$	$5Cl_2$ ক্লোরিণ	$=$	$2SbCl_5$ অ্যান্টিমনি পেণ্টাক্লোরাইড
Cu কপার	$+$	Cl_2 ক্লোরিণ	$=$	$CuCl_2$ কিউপ্রিক ক্লোবাইড

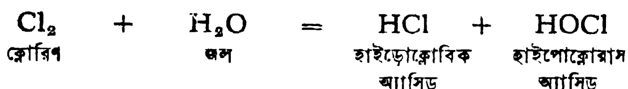
পরীক্ষা: (i) একটি জ্বালন-চামচে (deflagrating spoon) একখণ্ড ফস্‌ফরাস লইয়া তাহা ক্লোরিণ গ্যাসজারে প্রবেশ করান হইল। ফস্‌ফরাস প্রথমে গলিযা যায় এবং তারপর জ্বলিয়া উঠে। ইহার ফলে ফস্‌ফরাসের ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়।

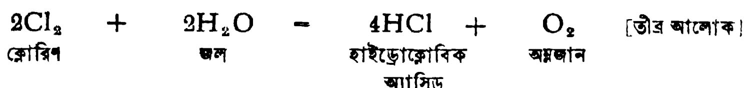
(ii) একটি জারে ক্লোরিণ গ্যাস লইয়া তাহার মধ্যে আর্সেনিক কিংবা অ্যান্টিমনি কিংবা বিস্‌মাথের গুঁড়া দাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ, প্রত্যেকটি কণা গ্যাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্র স্ফুলিঙ্গ সহকারে জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে উহাদের ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়।

(iii) একটি জারে ক্লোরিন গ্যাস লইয়া তাহার মধ্যে খুব পাতলা কপার বা

তামার পাত প্রবেশ করান হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, পাতলা তামার পাত জ্বলিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে কিউপ্রিক ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়।

(৩) পূর্ব্বেই বলিয়াছি **ক্লোরিণ জলে বেশ কিছুটা দ্রবণীয়।** বরফের মত শীতল জলে ক্লোরিণ গ্যাস পরিচালিত করিলে আমরা কেলাসিত **ক্লোরিণ হাইড্রেট** (Cl_2, $6H_2O$) পাই। সাধারণ উষ্ণতায় ক্লোরিণ গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবের বর্ণ হলুদে হয়। দ্রবকে **ক্লোরিণ জল** (chlorine water) বলে। নীল লিটমাস দিয়া ক্লোরিণ জল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহা লাল রঙে পরিবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ ইহার অম্ল গুণ আছে। ক্লোরিণ জল ক্রমশঃ হাইড্রো-ক্লোরিক ও হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডে পরিণত হয়। সূর্য্যালোকে ইহা দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং তীব্র আলোক সম্পাতে জল হইতে অম্লজান বাহির হইয়া যায়।





(৪) **ক্লোরিণের উদজানের প্রতি গভীর আসক্তি আছে।** অন্ধকারে স্বাভাবিক উষ্ণতায় ক্লোরিণ ও উদজানের সংযোগ ঘটে না। কিন্তু সূর্য্যালোকে ক্লোরিণ ও উদজানের বিস্ফোরণ পূর্ব্বক সংযোগ ঘটে। ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

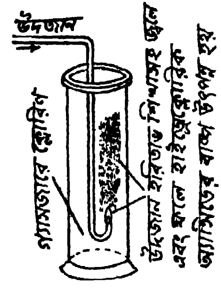


পরীক্ষা : (i) একটি পরীক্ষ-নল সম আয়তন উদজান ও ক্লোরিণ গ্যাসে পূর্ণ করা হইল। পরীক্ষ-নলকে নাড়িয়া তোয়ালে দিয়া ঢাকিয়া ইহার মুখটিকে অগ্নি-শিখার সামনে ধরা হইল। বিস্ফোরণের সহিত দুইটি গ্যাস সংযুক্ত হইয়া হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করিল।

(ii) একটি জারে ক্লোরিণ গ্যাস লইয়া তাহার মধ্য দিয়া জলন্ত উদজান শিখা (উদজান গ্যাস দাহ) প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, হরিতাভ

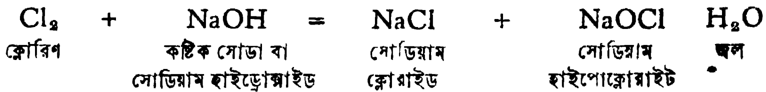
শিখাসহ উদজান জ্বলিতেছে এবং ফলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বাষ্প (fumes of hydrochloric acid) প্রস্তুত হইতেছে।

(iii) একটি জারে ক্লোরিণ গ্যাস লইয়া উহার মধ্যে জ্বালন-চামচের সাহায্যে একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি প্রবেশ করান হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, মোমবাতিটি ম্লান লাল শিখাসহ জ্বলিতেছে এবং প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হইতেছে। মোমের উপাদান কার্ব্বন বা অঙ্গার ও উদজান। ক্লোরিণ উদজানের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করে এবং কার্ব্বন বা অঙ্গার ধোঁযার আকারে (soot) মুক্ত হয়।



১৩৪নং চিত্র—ক্লোরিণ গ্যাসের মধ্যে উদজান প্রজ্বলন

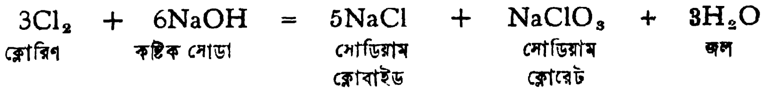
(৫) **ক্লোরিণের বিভিন্ন ক্ষারের** (alkalies) **উপর ক্রিয়া আছে।** ক্লোরিণকে **ঠাণ্ডা** ক্ষারীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিলে ক্লোরাইড ও হাইপোক্লোরাইট উৎপন্ন হয়। সমস্ত ক্ষার নিঃশেষ হইবার পর অতিরিক্ত ক্লোরিণ পরিচালিত করিলে হাইপোক্লোরাইট ক্লোরেটে পরিণত হয়।



$$Cl_2 + NaOH = NaCl + NaOCl \quad H_2O$$

Cl_2	+	$NaOH$	=	$NaCl$	+	$NaOCl$	H_2O
ক্লোরিণ		কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড		সোডিয়াম ক্লোরাইড		সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট	জল

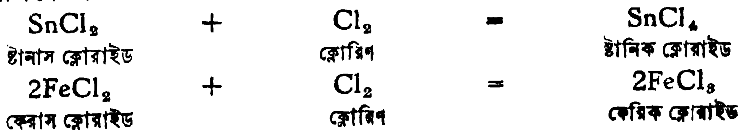
ক্লোরিণকে **গরম** ক্ষারীয় দ্রবণের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিলে ক্লোরাইড ও ক্লোরেট উৎপন্ন হয়।



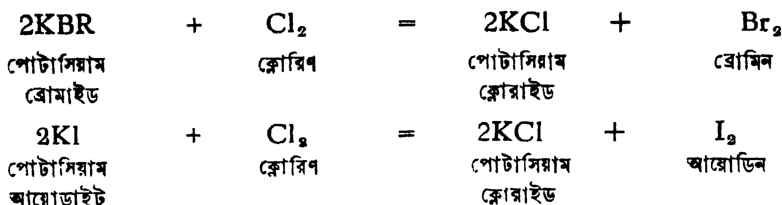
$$3Cl_2 + 6NaOH = 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$$

$3Cl_2$	+	$6NaOH$	=	$5NaCl$	+	$NaClO_3$	+	$3H_2O$
ক্লোরিণ		কষ্টিক সোডা		সোডিয়াম ক্লোবাইড		সোডিয়াম ক্লোরেট		জল

(৬) **ক্লোরিণের জারক গুণ আছে।** ক্লোরিণ গ্যাসে ষ্টানাস ও ফেরাস লবণ (Stannous and Ferrous salts) ষ্টানিক ও ফেরিক লবণে পরিণত হয় (Stannic and Ferric salts)। ইহা ব্রোমাইড ও আয়োডাইড হইতে যথাক্রমে ব্রোমিন ও আয়োডিন উৎপন্ন করিতে পারে।



$SnCl_2$	+	Cl_2	=	$SnCl_4$
ষ্টানাস ক্লোরাইড		ক্লোরিণ		ষ্টানিক ক্লোরাইড
$2FeCl_2$	+	Cl_2	=	$2FeCl_3$
ফেরাস ক্লোরাইড		ক্লোরিণ		ফেরিক ক্লোরাইড



2KBR	+	Cl_2	=	2KCl	+	Br_2
পোটাসিয়াম ব্রোমাইড		ক্লোরিণ		পোটাসিয়াম ক্লোরাইড		ব্রোমিন
2KI	+	Cl_2	=	2KCl	+	I_2
পোটাসিয়াম আয়োডাইট		ক্লোরিণ		পোটাসিয়াম ক্লোরাইড		আয়োডিন

(৭) **সাধারণ জৈব রঙ সমূহকে আর্দ্র অবস্থায় ক্লোরিণ বিরঞ্জিত করিয়া থাকে।** আর্দ্র রঙীন ফুল বা পাতা বা রঙীন বস্ত্রখণ্ড ক্লোরিণপূর্ণ গ্যাস-জারে রাখিয়া দিলে উহারা সাদা হইয়া যায়। ছাপাকালি ক্লোরিণে বিরঞ্জিত হয় না কারণ এই ছাপাকালিতে কার্ব্বন বা অঙ্গার থাকে এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার উপর ক্লোরিণের কোন ক্রিয়া নাই।

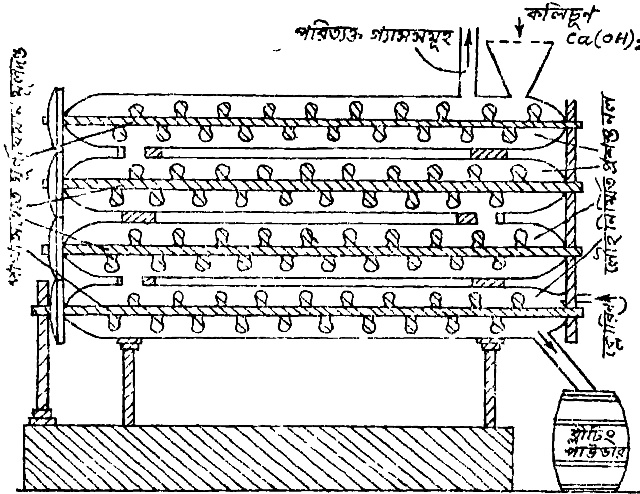
ক্লোরিণের ব্যবহার (Uses of Chlorine): ক্লোরিণ (i) কাগজ ও বস্ত্রশিল্পে বিরঞ্জক হিসাবে, (ii) পানীয় জলের বীজাণুনাশক হিসাবে, (iii) ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরোফর্ম্ম, ব্রোমিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে, (iv) বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বিষাক্ত গ্যাস (যথা মাষ্টার্ড গ্যাস, ফস্‌জিন ইত্যাদি) প্রস্তুতিতে, (v) খনিজ হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনে ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ক্লোরিণের পরীক্ষা (Tests of Chlorine) : (১) ক্লোরিণ গ্যাসের হরিতাভ-পীত বর্ণ ও ইহার তীব্র অপ্রীতিকর গন্ধ ইহাকে চিনাইয়া দেয়। (২) ষ্টার্চ (Starch) ও পোটাসিয়াম আযোডাইড দ্রবণে সিক্ত একটি কাগজের খণ্ড ক্লোরিণ গ্যাসে দিলে উহা নীল হইয়া যায়।

ব্লীচিং পাউডার বা **বিরঞ্জক চূর্ণ** [Bleaching Powder, Ca(OCl)Cl] : ব্লীচিং পাউডার বা বিরঞ্জক চূর্ণ নামে যাহা পরিচিত তাহার রাসায়নিক যৌগিক নাম **ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট**। এই যৌগিক পদার্থে তিনটি মৌল আছে—ক্যাল্‌সিযাম, অম্লজান ও ক্লোরিণ। ইহা একটি প্রয়োজনীয় যৌগিক পদার্থ এবং নিম্নে ইহার শিল্পোৎপাদন প্রণালী বর্ণিত হইল।

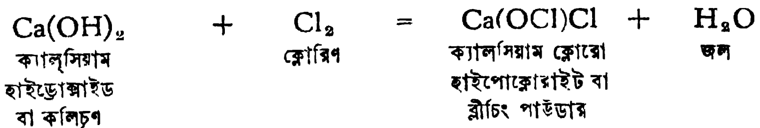
হেজেনক্লেভারের যন্ত্রে (Hasenclever plant) কয়েকটি লৌহ নির্ম্মিত অনুভূমিক প্রশস্ত নল বা সিলিণ্ডার থাকে। প্রত্যেকটি নলের মধ্যে পাখা সমেত ঘূর্ণায়মান মূলদণ্ড (rotating shaft fitted with blades) থাকে। ইহা আলোড়কের কার্য্য করে। সকলের উপরে যে নল থাকে তাহার ভিতর দিয়া

কলিচুণ [$Ca(OH)_2$] দেওয়া হয়। আলোড়কের কার্য্যের দরুণ কলিচুণ নলের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে থাকে এবং অবশেষে নির্গম পথে দ্বিতীয় লৌহ নলে প্রবেশ করে। এইভাবে কলিচুণ বিভিন্ন নল অতিক্রম করে। নীচের



১৩০নং চিত্র—ব্লীচিং পাউডাব উৎপাদন

নল দিয়া লঘু ক্লোরিণ গ্যাস কলিচূণের বিপরীত পথে পরিচালিত হয় এবং ফলে ক্লোরিণ ও কলিচুণ নিবিড় সংস্পর্শে আসে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ব্লীচিং পাউডার বা বিরঞ্জক চুর্ণ প্রস্তুত হয়। সর্ব্বনিম্ন নল হইতে ব্লীচিং পাউডার কাচের পিপেতে ভরিয়া লওয়া হয়।

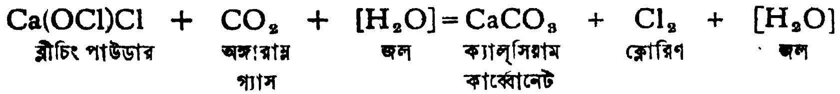


$$Ca(OH)_2 + Cl_2 = Ca(OCl)Cl + H_2O$$

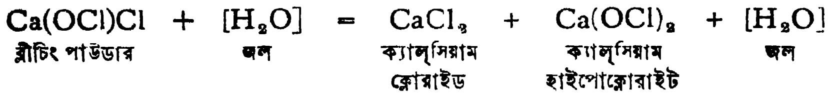
$Ca(OH)_2$	+	Cl_2	=	$Ca(OCl)Cl$	+	H_2O
কাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচূণ		ক্লোরিণ		ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট বা ব্লীচিং পাউডার		জল

ব্লীচিং পাউডারের ধর্ম্ম (Properties of Bleaching Powder) **:** ব্লীচিং পাউডার সাদা অনিয়তাকার (amorphous) পদার্থ এবং ইহা হইতে সর্ব্বদাই ক্লোরিণের গন্ধ পাওয়া যায়। বায়ুতে অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া দিলে ইহার

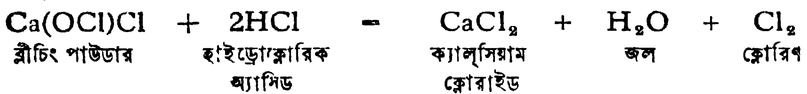
ক্লোরিণ্ অংশ ক্রমশঃ চলিয়া যায়। বায়ুর জলীয় বাষ্প ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস ইহার উপর ক্রিয়া করিয়া ক্লোরিণ মুক্ত করে।



জলের সহিত বিক্রিয়ার ফলে ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যাল্‌সিয়াম হাইপোক্লোরাইট প্রস্তুত হয়।



লঘু অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়ার ফলে ক্লোরিণ উৎপন্ন হয়।



ব্লীচিং পাউডারের ব্যবহার (Uses of Bleaching Powder): ব্লীচিং পাউডার প্রধানতঃ (১) জীবাণুনাশক হিসাবে ও (২) বিরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাড়ীতে কোন সংক্রামক রোগ হইলে বাড়ীর নর্দ্দমায়, শৌচাগারে ব্লীচিং পাউডার ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ব্লীচিং পাউডার হইতে ক্লোরিণ উৎপন্ন হইয়া নানা প্রকার জীবাণু ধ্বংস করিয়া ফেলে। কিন্তু ইহার ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজনীয় কারণ ক্লোরিণের গন্ধ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর।

(২) বস্ত্র, সূতা ও কাগজ শিল্পে বিরঞ্জন হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। বস্ত্র বা সূতাকে বিরঞ্জিত করিতে হইলে প্রথমে উহাকে সোডা বা কষ্টিক সোডায় সিদ্ধ করিয়া উহার আঁইশগুলি তৈলহীন করিয়া লইতে হয়। তারপর উহাকে জলে ধৌত করিয়া ঠাণ্ডা লঘু ব্লীচিং পাউডার দ্রবণে ডুবাইতে হয়। বস্তুটিকে ইহার পরে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ধোয়া হয়। ইহাতে ব্লীচিং পাউডার বিয়োজিত হইয়া ক্লোরিণ উৎপন্ন করে এবং এই ক্লোরিণ বিরঞ্জন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিরঞ্জিত বস্তুটিকে তারপর জলে ধৌত করিয়া 5% সোডার দ্রবণে ডুবান হয় এবং সোডিয়াম সালফাইট বা সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে ধৌত করিয়া ক্লোরিণ বা অ্যাসিড মুক্ত করা হয়। পরিশেষে বস্তুটিকে জলে ধৌত করিয়া শুকান হয়।

(৩) পানীয় জল জীবাণুমুক্ত করার জন্য ও ক্লোরোফর্ম্ম প্রস্তুতকরণের জন্য ব্লীচিং পাউডার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বায়ু (Air) : আমাদের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে। ইহাকেই বায়ুমণ্ডল বলা হয়। ইহা ধরাতল হইতে উর্দ্ধদিকে পাঁচশত মাইলের অধিক দূরত্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বায়ু পৃথিবীর একটা আচ্ছাদনবিশেষ এবং পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর সহিত লাগিয়া আছে। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক ও ঋষিগণ এবং পুরাকালের গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুকে একটি মৌলিক পদার্থ মনে করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক **লাভয়সিয়ে** (Lavoisier) কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে বায়ুর অন্ততঃ দুইটি উপাদান আছে—একটি **অম্লজান** (Oxygen) ও অপরটি **সোরাজান** (Nitrogen)। বায়ুতে অম্লজান অপেক্ষা সোরাজানের পরিমাণ অধিক। অম্লজানের সাহায্যে দহন ও শ্বাসক্রিয়া চলে। সোরাজানের সেরূপ ধর্ম্ম নাই। বায়ুতে অম্লজানের সহিত সোরাজান মিশ্রিত থাকায় শ্বাসকার্য্য ও তজ্জনিত দহনক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে।

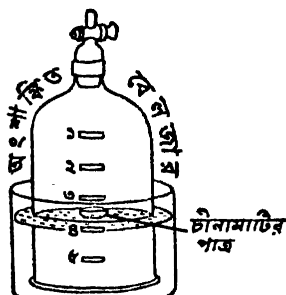
আয়তন হিসাবে বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত (Constituents of Air by Volume) ঃ বায়ুর উপাদান মুখ্যতঃ অম্লজান ও সোরাজান হইলেও উহাতে আরও কতিপয় গ্যাসীয় পদার্থ আছে। এই সকল উপাদানের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্ট না হইলেও মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে বায়ুতে :—

অম্লজান	শতকরা	২০˙৬০ ভাগ
সোরাজন	,,	৭৬˙১৬ ,,
অঙ্গারাম্ল	,,	˙০৪ ,,
জলীয় বাষ্প	,,	১˙৪০ ,,
অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস	,,	˙৮০ ,,
		১০০˙০০ ভাগ

ইহা ছাড়া বায়ুতে স্থানীয় পদার্থ অনুযায়ী নানা প্রকার গ্যাসও অল্পমাত্রায় মিশ্রিত থাকে। নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প ও অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ধূলিকণা বায়ুর সহিত মিশিয়া আছে। আবার নানাপ্রকার ভাসমান জীবাণুও বায়ুতে দেখা যায়।

আয়তন হিসাবে বায়ুর মুখ্য দুইটি উপাদানের অনুপাত সম্বন্ধে পরীক্ষা (Experiment on the volumetric composition of the two important constituents of air) **:** বায়ুর মুখ্য দুইটি উপাদান হইল অম্লজান ও সোরাজান। আয়তন হিসাবে বায়ুতে ইহারা কি পরিমাণে মিশ্রিত থাকে তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়।

পরীক্ষা: একটি বড় খোলা পাত্রে খানিকটা জল রাখ। একটি ছোট চীনামাটির পাত্রে একটু সাদা ফস্‌ফরাস (white phosphorus) লইয়া উহাকে পাত্রের জলে ভাসাইয়া দাও। তারপর একটি অংশাঙ্কিত রোধকযুক্ত বেলজার (graduated and stoppered bell-jar) উহার উপর ঢাকা দাও ও বেলজারের মধ্যে জলের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া রাখ। বেলজার হইতে রোধকটি খুলিয়া সাদা ফস্‌ফরাসটিতে গরম তার দিয়া আগুন ধরাইয়া দাও ও অতি সত্বর বেলজারে রোধকটি আটকাইয়া দাও। ফস্‌ফরাসটি খানিকক্ষণ পুড়িয়া নিভিয়া যাইবে। বেলজার ঠাণ্ডা হইলে দেখা যাইবে বেলজারের ভিতর জলের উচ্চতা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে এবং ইহা আবদ্ধ স্থানের বায়ুর প্রায় এক—পঞ্চমাংশ ভরিয়া ফেলিয়াছে।



১৩৬নং চিত্র—বেলজারের মধ্যে সাদা ফস্‌ফরাস ইত্যাদি প্রজ্জ্বলন

ফস্‌ফরাসের দহনকালে উহা আবদ্ধ স্থানের বায়ুর সমস্ত অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া ফস্‌ফরাস্ পেণ্টোক্সাইড (phosphorus pentoxide) নামক একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। উক্ত যৌগিক পদার্থটি জলে দ্রবণীয় বলিয়া উহা পাত্রের জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই ঐ বেলজারের আবদ্ধ স্থানে বায়ুর অন্যতম প্রধান অংশ সোরাজান শুধু রহিয়া যায়। ইহাতে জারের মধ্যস্থ বায়ুর চাপ কমিয়া যায় এবং বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপে জল জারের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত উঠে। এই পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে মোটামুটি বায়ুতে পাঁচভাগের মধ্যে একভাগ মাত্র অম্লজান ও আর চারভাগই সোরাজান ও অন্যান্য গ্যাস।

এই পরীক্ষা ফস্‌ফরাসের পরিবর্ত্তে গন্ধক (sulphur), অঙ্গার (carbon), ম্যাগ্‌নেসিয়াম (magnesium) বা মোমবাতি (candle) জ্বালাইয়াও সম্পন্ন করা

যায় এবং একই সিদ্ধান্তে—মোটামুটি বায়ুতে পাঁচভাগের মধ্যে একভাগ অম্লজান ও চারভাগই সোরাজান ও অন্যান্য গ্যাস—উপনীত হওয়া যায়।

উপরোক্ত পরীক্ষা আয়তন হিসাবে বায়ুতে অম্লজান ও সোরাজানের অনুপাত কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ দিল। **ডুমার প্রণালীর** (Dumas' method) সাহায্যে ওজন হিসাবে বায়ুতে অম্লজান ও সোরাজানের অনুপাত কিরূপ তাহা নিরূপিত হয়। ওজন হিসাবে মোটামুটি বায়ুতে অম্লজানের পরিমাণ **২৩ ভাগ** ও সোরাজানের পরিমাণ **৭৭ ভাগ**।

বায়ু মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে (Air is a mechanical mixture and not a chemical compound) **ঃ** বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে। উপরোক্ত পরীক্ষা হইতে তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে বায়ুর প্রধান উপাদান হইল অম্লজান ও সোরাজান। আয়তন হিসাবে মোটামুটি বায়ুর মধ্যে অম্লজান একভাগ ও সোরাজান চারিভাগ থাকে। **বায়ু যে যৌগিক পদার্থ নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হইল :—**

১। বায়ুর উপাদানগুলিকে সহজেই পৃথক করা যাইতে পারে ; যৌগিক পদার্থ হইলে বায়ুর উপাদানগুলিকে পৃথক করা সহজসাধ্য হইত না।

২। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল স্থানে ও সকল সময়ে বায়ুর অম্লজান ও সোরাজানের ভাগ নির্দ্দিষ্ট নহে। সমুদ্রের ধারে ও পর্ব্বতের উপরে অম্লজানের ভাগ বেশী এবং বড় বড় শহরে ও খনিতে সোরাজানের ভাগ বেশী। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে উহার উপাদানের ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

৩। যদি একভাগ অম্লজান ও চারিভাগ সোরাজান মিশ্রিত করা যায়, তবে উহার ধর্ম্ম বায়ুর মত হয়। কিন্তু মিশ্রণ করিবার সময় উষ্ণতার কোন তারতম্য হয় না। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে কখনও ইহা সম্ভবপর হইত না।

৪। তরল বায়ুকে **আংশিক পাতন** (Fractional distillation) করিলে প্রথমে সোরাজান বাহির হইয়া আসে, পরে অম্লজান বাহির হয়। বায়ু যৌগিক পদার্থ হইলে ইহা কখনও সম্ভবপর হইত না [বায়ু প্রায় – 190° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় তরল হয়। তরল বায়ুতে অম্লজান ও সোরাজান মিশ্রিত থাকে। সোরাজানের স্ফুটনাঙ্ক প্রায় – 195 8° সেন্টিগ্রেড্ এবং অম্লজানের স্ফুটনাঙ্ক প্রায় – 183° সেন্টিগ্রেড্। আংশিক পাতনে সোরাজান প্রথমে বাষ্পীভূত হয়]।

রাসায়নিক চিহ্ন / Symbol N	**সোরাজান** (Nitrogen)	সংকেত / Formula N_2
পরমাণু-ক্রমাঙ্ক / Atomic Number 7		পারমাণবিক গুরুত্ব / Atomic Weight 14
স্ফুটনাঙ্ক / Boiling point −195.8°C		গলনাঙ্ক / Melting Point −209.8°C

বৈজ্ঞানিক ড্যানিয়াল **রাদারফোর্ড** (Danial Rutherford) ১৭৭৩ খৃঃ এই গ্যাসটি আবিষ্কার করেন। এই গ্যাসের প্রকৃত স্বরূপ পরে বৈজ্ঞানিক **লাভয়সিয়ে** দেখান।

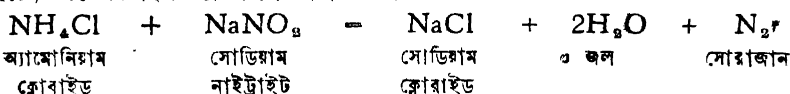
সোরাজানের স্থিতি (Occurrence) **:** সোরাজান বায়ুর মধ্যে মৌলিক অবস্থায় আছে এবং ইহার প্রায় $\frac{4}{5}$ অংশ অধিকার করে। মিশ্র ও যৌগিক অবস্থায় ইহাকে বিভিন্ন বস্তুতে দেখা যায়—যেমন প্রাকৃতিক জলে দ্রব অবস্থায়, উর্ব্বর মৃত্তিকায় নাইট্রেট ও নাইট্রাইট আকারে ইত্যাদি। প্রোটিনের মুখ্য উপাদান সোরাজান। সুতরাং উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদেহে প্রচুর সোরাজান থাকে।

সোরাজান প্রস্তুতকরণ (Preparation of Nitrogen) **:**—বিভিন্ন উপায়ে সোরাজান প্রস্তুত করা হয়। কয়েকটি উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) বায়ু হইতে সোরাজান ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলিকে সরাইয়া :—

তোমরা জান বায়ুমণ্ডলের $\frac{4}{5}$ ভাগ সোরাজান ও বাকী অম্লজান ও অন্যান্য গ্যাস। বায়ু হইতে অম্লজান দূর করিতে পারিলেই সাধারণতঃ সোরাজান পাওয়া যায়। বেলজারকে জলপাত্রে বসাইয়া উহার মধ্যে ফস্‌ফরাস (phosphorus) পুড়াইলে অম্লজান ফস্‌ফরাস পেণ্টোক্সাইড তৈয়ারী করিবে। তাহা জলে গুলিয়া গেলে সোরাজান পড়িয়া থাকিবে।

(২) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (ammonium chloride) ও সোডিয়াম নাইট্রাইট (sodium nitrite) একত্রে মিশাইয়া উত্তাপ দিলে সোরাজান পাওয়া যায়।

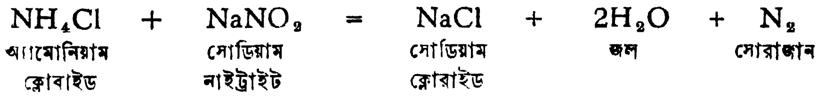


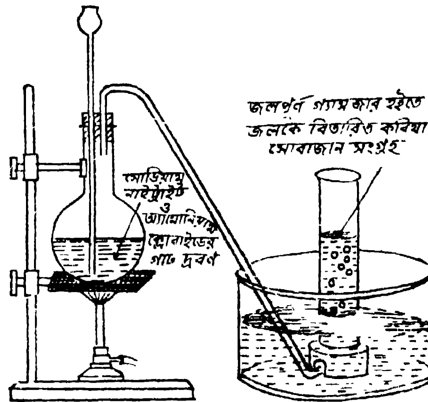
$$NH_4Cl + NaNO_2 = NaCl + 2H_2O + N_2\uparrow$$

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড + সোডিয়াম নাইট্রাইট = সোডিয়াম ক্লোরাইড + জল + সোরাজান

পরীক্ষাগারে সোরাজান প্রস্তুতকরণ (Laboratory method of preparation of Nitrogen) **:** পরীক্ষাগারে সোরাজান প্রস্তুত করিবার জন্য একটা কাচকুপীর মধ্যে **সোডিয়াম নাইট্রাইট** (sodium nitrite) এবং **অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের** (ammonium chloride) গাঢ় জলীয় দ্রবণ লইয়া কুপীটির মুখের কর্ক হইতে বাঁকা নল জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। এইবার কুপীমধ্যস্থ দ্রব পদার্থে ধীরে ধীরে উত্তাপ দিলে সোরাজান গ্যাস

বাহির হইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু সোরাজান প্রস্তুতকালে গ্যাস বাহির হইবামাত্রই উত্তাপ বন্ধ করা চাই নচেৎ হঠাৎ প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হইয়া কাচকুপী ফাটিয়া যাইতে পারে। এক্ষণে জলের মধ্য হইতে বুড় বুড় করিয়া গ্যাস বাহির হইতে আরম্ভ করিলে জলপূর্ণ গ্যাসজার সাহায্যে গ্যাস সংগ্রহ করা যাইবে।





১৩৭নং চিত্র—পরীক্ষাগারে সোরাজান প্রস্তুতকরণ

সোরাজানের শিল্পোৎপাদন (Manufacture of Nitrogen): তরলীকৃত বায়ু হইতে সোরাজান উৎপাদন করা হয়। বায়ু হইতে প্রথমে উহার অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্প দূরীভূত করা হয়। তারপর অত্যাধিক চাপে উহাকে ক্রমাগত শীতল করা হয়। উষ্ণতা হ্রাসের জন্য বাহ্যিক উপায় ছাড়াও হঠাৎ অতিরিক্ত চাপ হইতে সরু নলের মধ্য দিয়া অল্প চাপে বায়ুকে প্রসারিত করা হয়। ইহাতে বায়ুর উষ্ণতা খুব কমিয়া যায় (জুল-থমসন প্রক্রিয়া—Joule Thomson effect)। এইভাবে যখন উষ্ণতা -190° সেন্টিগ্রেডের নীচে আসে তখন বায়ু ক্রমশঃ তরল হইতে থাকে। তরল বায়ুতে অম্লজান ও সোরাজান মিশ্রিত থাকে। সোরাজানের স্ফুটনাঙ্ক $-195{\cdot}8^{\circ}C$ এবং অম্লজানের স্ফুটনাঙ্ক $-183^{\circ}C$। সোরাজান অম্লজান

অপেক্ষা অধিকতর উদ্বায়ী (volatile)। সুতরাং তরল বায়ুকে আংশিকভাবে পাতিত করিলে (fractional distillation) প্রথমে সোরাজান বাষ্পীভূত হইবে।

১৩৮নং চিত্র—তরল বায়ু হইতে সোরাজান উৎপাদন

এইরূপে সোরাজান সংগ্রহ করা হয় এবং সোরাজান উৎপাদনের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

সোরাজানের ধর্ম্ম (Properties of Nitrogen): (১) সোরাজান বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ। (২) ইহা বায়ু অপেক্ষা সামান্য হাল্‌কা এবং জলে অল্পমাত্রায় দ্রবীভূত হয়। (৩) ইহা নিজে দাহ্য নহে বা দহনক্রিযার সহায়তা করে না।

পরীক্ষা: সোরাজানপূর্ণ গ্যাসজারে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে দেখিবে, কাঠিটি তৎক্ষনাৎ নিভিয়া যাইবে এবং গ্যাসটি জ্বলিবে না।

(৪) এই গ্যাস অতিশয় নিষ্ক্রিয়; সাধারণতঃ কোন বস্তুর সহিত সহজে সংযুক্ত হয় না। (৫) **অধিক চাপে** ইহা উদজানের সহিত মিলিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করে। (৬) **অধিক উত্তাপে** ইহা ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিযাম ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের সহিত মিলিত হয়। (৭) ইহা মৌলিক পদার্থ।

সোরাজানের উপকারিতা (Usefulness of Nitrogen):—(১) অম্লজানের মত ইহা প্রয়োজনীয় না হইলেও প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহের ইহা একটি বিশিষ্ট

উপাদান। ইহা অম্লজানের তীব্র দাহিকা শক্তি কিছুটা সংহত করে। তাহা না হইলে উহার তীব্রতার জন্য মানবদেহের অশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। (২) ইহা জীবদেহের পুষ্টির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে সোরাজানের প্রাচুর্য্য থাকিলেও, জীব তাহা সোজাসুজি গ্রহণ করিয়া নিজেদের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। **প্রাণী উদ্ভিদ্ হইতে সোরাজান গ্রহণ করে; আর উদ্ভিদ্ লয় মাটি হইতে।** সোরাজান চক্র (Nitrogen cycle) আলোচনাকালে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইবে।

সোরাজানের পরীক্ষা (Tests of Nitrogen): সোরাজানপূর্ণ গ্যাস-জারের মধ্যে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা তৎক্ষণাৎ নিভিযা যাইবে এবং উহা পরিষ্কৃত চূণের জল ঘোলা করিবে না।

সোরাজানের ব্যবহার (Uses of Nitrogen):—অম্লজানের মত ইহা প্রয়োজনীয় না হইলেও জীবদেহের ইহা একটি বিশিষ্ট উপাদান। অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি প্রস্তুতকরণে প্রচুর সোরাজানের প্রয়োজন হয। বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর এবং গ্যাস থার্ম্মোমিটারে সোরাজান ব্যবহৃত হয়।

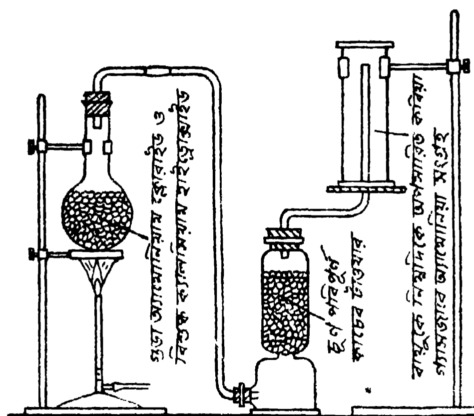
সংকেত / Formula NH_3 **অ্যামোনিয়া** (Ammonia) আণবিক গুরুত্ব / Molecular Weight 17

স্ফুটনাঙ্ক / Boiling Point $-33{\cdot}4^{\circ}C$ গলনাঙ্ক / Melting Point $-77{\cdot}7^{\circ}C$

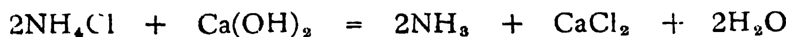
বৈজ্ঞানিক **প্রিষ্টলি** (Priestly) ১৭৭৫ **খৃঃ** প্রথম অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করেন। বায়ুতে ও প্রাকৃতিক জলে (natural water) স্বল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদ্দেহের ধ্বংস ও পচনের ফলে এই গ্যাস উদ্ভূত হয। অ্যামোনিযা একটি যৌগিক পদার্থ এবং ইহাতে দুইটি মৌল আছে—সোরাজান (Nitrogen) ও উদজান (Hydrogen)।

পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতকরণ (Laboratory method of preparation of Ammonia): এক ভাগ গুঁড়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তিন ভাগ বিশুদ্ধ ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণের সহিত ভালভাবে মিশ্রিত করিযা একটি কাচকুপীতে লওয়া হইল। কাচকুপীর মধ্য দিয়া একটি নির্গম-নল (delivery tube) লাগান থাকে। কাচকুপীটি তারজালির উপর রাখিয়া ধীরে

ধীরে উত্তাপ দেওয়া হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নির্গম-নল দিয়া বাহির হয়। এই গ্যাসের সহিত জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে। ইহাকে বিশুষ্ক করিবার জন্য ক্যাল্‌সিযাম অক্সাইড বা চুণ পরিপূর্ণ একটি কাচের টাওয়ারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। তারপর বায়ুকে নীচের দিকে অপসারিত করিয়া (অ্যামোনিয়া বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা বলিয়া এইভাবে বায়ুর অপসরণ করা হয়) ইহাকে গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। অ্যামোনিয়া জলে দ্রবণীয়, সেইজন্য ইহাকে জলের অপসরণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা যায় না।



১৩৯নং চিত্র—পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতকরণ



$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$$

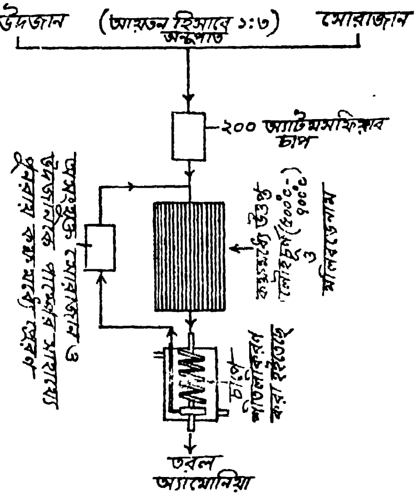
$2NH_4Cl$	$Ca(OH)_2$	$2NH_3$	$CaCl_2$	$2H_2O$
অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	ক্যাল্‌সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ	অ্যামোনিয়া	ক্যাল্‌সিয়াম ক্লোরাইড	জল

অ্যামোনিয়ার বিশুষ্ককরণ (Drying of Ammonia): অ্যামোনিয়া বিশুষ্ককরণের জন্য ক্যাল্‌সিযাম অক্সাইড বা চুণ ব্যবহৃত হয়। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা ফস্‌ফরাস পেন্টোক্সাইড (P_2O_5) বা ক্যাল্‌সিযাম ক্লোরাইডের ($CaCl_2$) সাহায্যে বিশুষ্ককরণ সম্ভব নয় কারণ অ্যামোনিয়ার সহিত ঐ বস্তুগুলির বিক্রিয়া হয়।

অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদন (Manufacture of Ammonia): নানা উপায়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা যায়: (১) **কয়লার অন্তর্ধূমপান হইতে** (destructive distillation of coal), (২) **সায়ানামাইড পদ্ধতিতে** (Cyanamide Process)—এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণ ও কোকের সাহায্যে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বাইড (CaC_2) প্রস্তুত করা হয়। তারপর যোরাজান ও ষ্টীমের সাহায্যে ইহাকে অ্যামোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত করা হয়; (৩) **হেভার পদ্ধতি** (Haber Process)—বৈজ্ঞানিক **হেভার** উদজান ও

সোরাজান সংযুক্ত করিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করেন নিম্নে ইহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

বিশুদ্ধ (pure) সোরাজান ও উদজান আয়তন হিসাবে ১ : ৩ অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া ২০০ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপে (200 atmospheric pressure) সঙ্কুচিত করা হয় এবং তারপর ইহাকে ৫০০°C—৭০০°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত একটি কক্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। কক্ষের মধ্যে ঐ উষ্ণতার উত্তপ্ত লৌহচূর্ণ থাকে এবং তাহার সহিত মলিবডেনাম (Molybdenum) মিশ্রিত থাকে [লৌহচূর্ণ-অনুঘটকের (catalytic agent) কাজ করে এবং মলিবডেনাম প্রমোটর (promoter) স্বরূপ]। উদজান ও সোরাজানের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং ফলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার সহিত অসংযুক্ত সোরাজান ও উদজান গ্যাস রহিয়া যায়। ইহাদের দূরীকরণের জন্য সমস্ত গ্যাসগুলিকে অধিক চাপে ঠাণ্ডা করা হয়। অ্যামোনিয়া প্রথমে তরলিত হয় কিন্তু উদজান ও সোরাজান তখনও তরলিত হয় না। তরল অ্যামোনিয়াকে বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং অসংযুক্ত সোরাজান ও উদজান গ্যাসকে পাম্পের সাহায্যে ঐ কক্ষের মধ্যে আরও অ্যামোনিয়া প্রস্তুতকরণের জন্য পাঠান হয়।

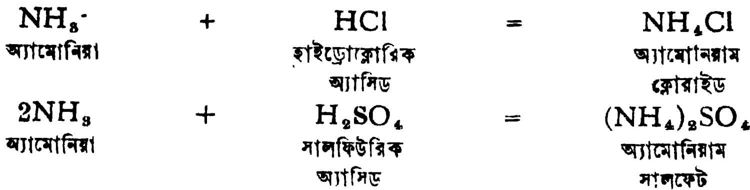


১৪০নং চিত্র—হেভার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদন

অ্যামোনিয়ার ধর্ম্ম (Properties of Ammonia) : (১) অ্যামোনিয়া একটি বর্ণহীন, ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত (এই গ্যাস ঘ্রাণে অশ্রুজল আসে), বায়ু অপেক্ষা হালকা গ্যাস। এই গ্যাসকে অতি সহজেই তরলিত করা যায় (৬ অ্যাটমস্ফিয়ার চাপে ও ১০°C উষ্ণতায় ইহা তরলিত হয়)।

(২) অ্যামোনিয়া জলে অত্যন্ত দ্রবণীয় এবং অ্যামোনিয়ার গাঢ় দ্রবণকে

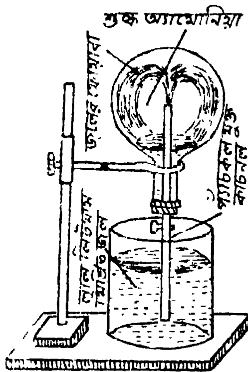
'লাইকর অ্যামোনিয়া' (liquor ammonia) বলে। জলে দ্রবীভূত হইয়া ইহা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। ইহা একটি ক্ষার এবং সেইজন্য অ্যামোনিয়াকে একটি ক্ষারক বস্তু বলিয়া গণ্য করা হয়। অ্যামোনিয়া লাল লিট-মাসকে নীল রঙে পরিবর্ত্তিত করে ও বিভিন্ন অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে।



NH_3	+	HCl	=	NH_4Cl
অ্যামোনিয়া		হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড		অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড
$2NH_3$	+	H_2SO_4	=	$(NH_4)_2SO_4$
অ্যামোনিয়া		সালফিউরিক অ্যাসিড		অ্যামোনিয়াম সালফেট

নিম্নের পরীক্ষা হইতে অ্যামোনিযার ক্ষারকত্ব ও জলে অধিক দ্রাব্যতা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

পরীক্ষা ঃ একটি গোল কাচকুপীতে শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাসে পূর্ণ করিয়া ছিপি আঁটিয়া দেওয়া হইল। ছিপির মধ্য দিয়া একটি প্যাঁচকলযুক্ত (stop cock) কাচ নল লাগান থাকে। গোল কাচকুপীটিকে উল্টা করিয়া কাচনলের প্রান্তটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। পাত্রের জলে লাল লিটমাস মিশ্রিত করা হয। প্যাঁচকল খুলিয়া দিয়া গোল কাচকুপীটিকে একটু ঈথার ঢালিযা ঠাণ্ডা কর। এই ঠাণ্ডার ফলে অ্যামোনিযা গ্যাস সঙ্কুচিত হইয়া ফ্লাস্কে সামান্য রিক্ততার (partial vacuum) সৃষ্টি করে এবং লাল লিটমাস জল নলের মধ্য দিয়া উঠিতে থাকে। অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে আসিলেই লাল লিটমাস **নীল** হইয়া যায় এবং অ্যামো-নিয়া জলে দ্রুত দ্রবীভূত হয। ফলে কাচকুপীর অভ্যন্তরে চাপ হ্রাস পায় এবং পাত্রের লাল লিটমাস জল বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটি ফোয়ারার সৃষ্টি করে এবং তাহার রঙ নীল হয়। এই পরীক্ষাকে 'ফোয়ারা পরীক্ষা' (Fountain Experiment) বলে।

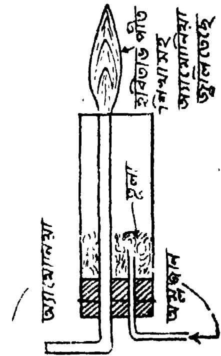


১৪১নং চিত্র—ফোয়ারা পরীক্ষা

(৩) অ্যামোনিয়া নিজে দাহ্য নয় বা দহনক্রিয়ার সহায়তা করে না, কিন্তু অম্লজান গ্যাসের মধ্যে হরিতাভ-পীত (greenish-yellow) শিখাসহ জ্বলিতে থাকে।

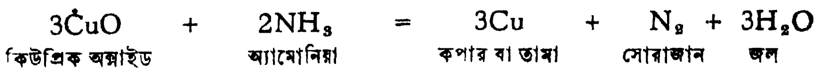
পরীক্ষা ঃ (i) অ্যামোনিয়া গ্যাসপূর্ণ জারে একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যাইবে, কাঠি নিভিয়া যায় ও গ্যাসও জ্বলিতেছে না।

(ii) একটি কাচের দুইমুখ খোলা চিমনির এক মুখে ছিপি আঁটিয়া ছিপির মধ্য দিয়া একটি লম্বা ও একটি ছোট কাচনল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। লম্বা নলটি চিমনির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছায় এবং ছোট নলটি ছিপির একটু উপরে শেষ হয় ; ছিপির পর চিমনির মধ্যে কিছুটা তুলা গোঁজা থাকে। প্রথমে ছোট নলের মধ্য দিয়া অম্লজান এবং তারপর লম্বা নলের মধ্য দিয়া শুষ্ক অ্যামোনিয়া প্রবেশ করান হয়। অম্লজান তুলার মধ্য দিয়া বিস্তার লাভ করে। হাতের তালুই দিয়া চিমনির খোলা মুখটি অল্পক্ষণ চাপিয়া ধরিয়া হাত সরাইযা লওয়া হইল এবং একটি জলন্ত কাঠি লম্বা নলের মুখে ধরা হইল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, অ্যামোনিয়া হরিতাভ-পীত (greenish-yellow) শিখাসহ জ্বলিতেছে।



১৪২নং চিত্র—অম্লজান গ্যাসের মধ্যে অ্যামোনিয়া প্রজ্জ্বলন

(৪) অ্যামোনিয়া **লঘু বিজারক দ্রব্য** (mild reducing agent)। উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইড বা লেড মনোক্সাইডের উপর দিয়া অ্যামোনিয়া পরিচালনা করিলে কিউপ্রিক অক্সাইড কপারে বা তামায় ও লেড মনোক্সাইড লেডে বা সীসায় পরিণত হয়।



$$3CuO + 2NH_3 = 3Cu + N_2 + 3H_2O$$

কিউপ্রিক অক্সাইড — অ্যামোনিয়া — কপার বা তামা — সোরাজান — জল

(৫) অ্যামোনিয়ার সহিত ক্লোরিণের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং ফলে সোরাজান উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়ার পরিমাণ বেশী থাকা প্রয়োজন, কারণ অ্যামোনিয়া কম পরিমাণে থাকিলে বিস্ফোরক সোরাজান বা নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



$$2NH_3 + 3Cl_2 = N_2 + 6HCl$$

অ্যামোনিয়া — ক্লোরিণ — সোরাজান — হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড



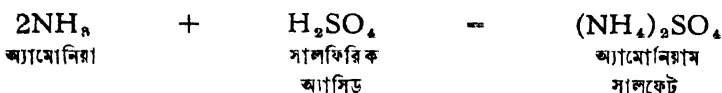
$$2NH_3 + 6Cl_2 = 2NCl_3 + 6HCl$$

অ্যামোনিয়া — ক্লোরিণ — নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড — হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

অ্যামোনিয়ার ব্যবহার (Uses of Ammonia) : অ্যামোনিয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যবহারিক জীবনে দ্রুত বাড়ার দরুণ ইহার উৎপাদন এখন বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত। (১) জমির সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রচুর অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন। সল্‌ভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্ব্বনেট বা সোডা প্রস্তুত করার জন্য অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমানে অ্যামোনিয়াকে জারিত করিয়া (by oxidising ammonia) নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। এইজন্য অ্যামোনিয়ার চাহিদা আরও বাড়িয়াছে। (২) বরফ উৎপাদনে জল ঠাণ্ডা করার জন্য তরল অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রশীতকের (refrigerant) কাজ করে। (৩) অ্যামোনিয়া ল্যাবরেটরীতে বিকারক (reagent) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার নগণ্য নহে।

অ্যামোনিয়ার পরীক্ষা (Tests of Ammonia) : (১) অ্যামোনিয়া ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত গ্যাস, লাল লিটমাসকে নীল করে। (২) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের সংস্পর্শে ইহা সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। (৩) মারকিউরাস নাইট্রেট দ্রবণে সিক্ত কাগজকে ইহা কাল রঙে পরিণত করে।

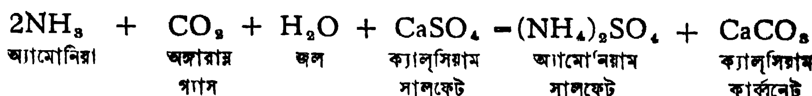
অ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium Sulphate ; $(NH_4)_2SO_4$) : ইহা একটি লবণ। ইহাতে চারিটি মৌল আছে—সোরাজান, উদজান, সালফার বা গন্ধক ও অম্লজান। সস্তা অথচ ভাল সার (manure) বলিয়া ইহার উৎপাদন বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত। (১) কয়লার অন্তর্ধূমপাতন (destructive distillation of coal) অথবা হেভার পদ্ধতি (Haber Process) হইতে যে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায় উহার সহিত **লঘু** (dilute) সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।



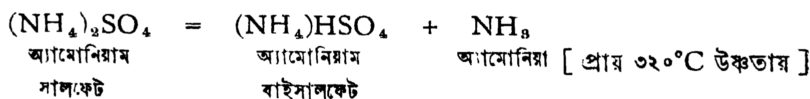
$$2NH_3 + H_2SO_4 = (NH_4)_2SO_4$$

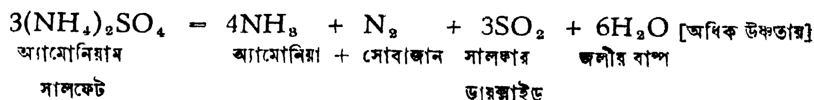
অ্যামোনিয়া সালফিরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম সালফেট

(২) বিচূর্ণ ক্যাল্‌সিয়াম সালফেট জলের সহিত মিশাইয়া উহার ভিতর দিয়া অঙ্গারাম্ল ও অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদিত হইতেছে। সিন্ধ্রীর কারখানা এইজন্য সুবিখ্যাত।


$$2NH_3 + CO_2 + H_2O + CaSO_4 = (NH_4)_2SO_4 + CaCO_3$$

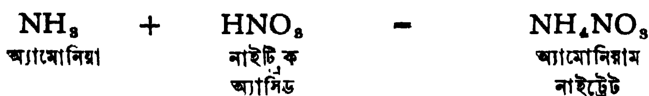
অ্যামোনিয়াম সালফেটের ধর্ম্ম ও ব্যবহার (Properties and Uses of Ammonium Sulphate): অ্যামোনিয়াম সালফেট বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে দ্রবণীয। উত্তপ্ত করিলে ইহা বিযোজিত হয (decomposes) এবং এই বিযোজন দুইটি ধাপে সম্পূর্ণ হয। ৩২০°C উষ্ণতায় এই লবণ অ্যামোনিয়া পরিত্যাগ করে এবং অ্যামোনিয়াম বাইসালফেট উৎপন্ন হয়। উষ্ণতা আরও বাড়াইলে অ্যামোনিযাম বাইসালফেট বিযোজিত হয এবং ফলে অ্যামোনিয়া, সালফার ডায়ক্সাইড, সোরাজান ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।


$$(NH_4)_2SO_4 = (NH_4)HSO_4 + NH_3$$


$$3(NH_4)_2SO_4 = 4NH_3 + N_2 + 3SO_2 + 6H_2O$$

অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রধানতঃ জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অ্যামোনিযার লবণ প্রস্তুতকরণ, ফট্‌কিরি প্রস্তুতকরণে ও ল্যাবরেটরীতে বিকারক (reagent) হিসাবে ইহার ব্যবহার আছে।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium Nitrate ; NH_4NO_3): ইহা একটি লবণ। ইহাতে তিনটি মৌল আছে—সোরাজান, উদজান ও অম্লজান। ইহার উৎপাদন প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে করা হয় : (১) লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড সাহায্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে প্রশমিত করিয়া লইয়া (neutralises) উহাকে ষ্টীলের পাত্রে গাঢ় করিযা লইলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের দানা পৃথক হইয়া যায়। (২) অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিযাম নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণ দ্বিগুণ বিযোজনে (double decomposition) সোডিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করে। উত্তপ্ত দ্রবণ হইতে প্রথমে সোডিয়াম সালফেট কেলাসিত হয। পরিস্রুতি প্রণালীর সাহায্যে সোডিয়াম সালফেটকে পৃথক করিয়া ফেলা হয় এবং দ্রবণকে ঠাণ্ডা করিলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কেলাসিত হয়।



$$NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$$

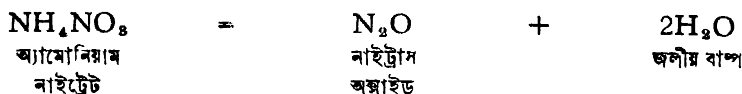
অ্যামোনিয়া + নাইট্রিক অ্যাসিড = অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট



$$(NH_4)_2SO_4 + 2NaNO_3 = Na_2SO_4 + 2NH_4NO_3$$

অ্যামোনিয়াম সালফেট + সোডিয়াম নাইট্রেট = সোডিয়াম সালফেট + অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের ধর্ম্ম ও ব্যবহার (Properties and Uses of Ammonium Nitrate) : অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সাদা স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে দ্রবণীয়। উত্তপ্ত করিলে ইহা প্রথমে গলে (প্রায় ১৭০° উষ্ণতায়) এবং আরও অধিক উত্তপ্ত করিলে ইহা বিযোজিত (decomposes) হইয়া নাইট্রাস অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে।



$$NH_4NO_3 = N_2O + 2H_2O$$

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট = নাইট্রাস অক্সাইড + জলীয় বাষ্প

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক (explosives) প্রস্তুতিতে, জমির সার হিসাবে ও মিশ্র পদার্থকে জমাট বাধানর দরুণ (in freezing mixtures) ব্যবহৃত হয়।

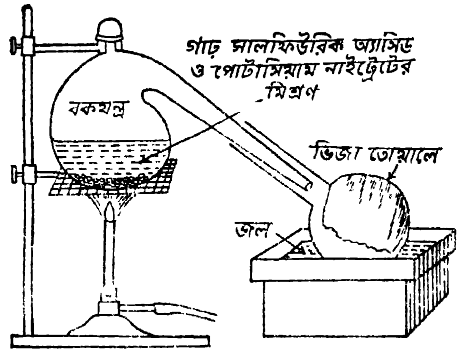
সঙ্কেত / Formula HNO_3 **নাইট্রিক অ্যাসিড** (Nitric Acid) আণবিক গুরুত্ব / Molecular weight 63

স্ফুটনাঙ্ক / Boiling Point 78·2°C হিমাঙ্ক / Freezing Point – 41·3°C

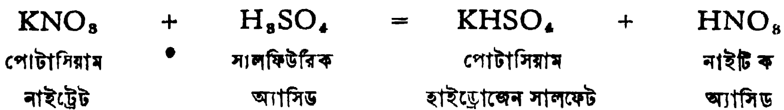
প্রাচীন ভারতে সোরার (পোটাসিয়াম নাইট্রেট ; KNO_3) সহিত হিরাকস (ফেরাস সালফেট ; $FeSO_4, 7H_2O$) উত্তপ্ত করিয়া এক প্রকার দ্রাবক প্রস্তুতির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা প্রকৃতপক্ষে নাইট্রিক অ্যাসিড। ঐ অ্যাসিড রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুকে গলাইতে পারিত বলিয়া উহাকে দ্রাবক বলা হইত। অ্যালকেমী যুগের বিজ্ঞানীরা নাইট্রিক অ্যাসিডকে 'অ্যাকুয়া ফর্টিস' (Aqua Fortis) অর্থাৎ শক্তিশালী জল হিসাবে ব্যবহার করিতেন। বৈজ্ঞানিক **জাবের** (Geber) ৭৭৮ খৃঃ ফটকিরি ($K_2SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$) ও হিরাকসের (ফেরাস সলফেট ; $FeSO_4, 7H_2O$) সহিত নাইটার বা সোরার (পোটাসিয়াম নাইট্রেট ; KNO_3) একত্রে পাতিত করিয়া এই অ্যাসিড উৎপন্ন করিতেন। বৈজ্ঞানিক **লাভয়সিয়ে** ১৭৭৬ খৃঃ ইহার সংযুক্তি (composition) নির্দ্ধারণ করেন।

নাইট্রিক অ্যাসিডের স্থিতি (Occurrence) : বায়ুমণ্ডলে বজ্রপাতের দরুণ অতি সামান্য পরিমাণে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেমন ভারতে ইহাকে পোটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3—ইহার ব্যবহারিক নাম 'নাইটার' বা সোরা) হিসাবে জমিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির সমুদ্র উপকূলে ইহাকে সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$—ইহার ব্যবহারিক নাম 'চিলি সল্টপিটার') হিসাবে পাওয়া যায়।

পরীক্ষাগারে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতকরণ (Preparation of Nitric acid in the laboratory) : একটি কাচের ছিপিযুক্ত বকযন্ত্রে (retort) সমপরিমাণ ওজনের পোটাসিয়াম নাইট্রেট ও **গাঢ়** সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ লওয়া হয়। বকযন্ত্রের শেষ প্রান্ত একটি গোল কাচকুপীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা জলের প্রবাহ দ্বারা এই গোল কাচকুপীটির উষ্ণতা যথাসম্ভব কম রাখা হয়। বকযন্ত্রকে উত্তপ্ত করা হইলে সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত পোটাসিয়াম নাইট্রেটের বিক্রিয়া হয় এবং ফলে পোটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।



১৪নং চিত্র—পরীক্ষাগারে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতকরণ

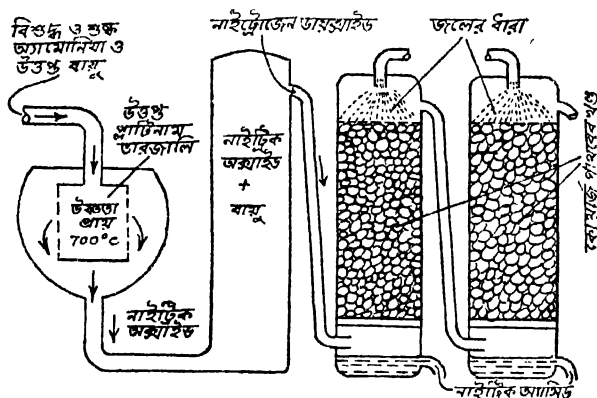


KNO_3	+	H_2SO_4	=	$KHSO_4$	+	HNO_3
পোটাসিয়াম নাইট্রেট		সালফিউরিক অ্যাসিড		পোটাসিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট		নাইট্রিক অ্যাসিড

নাইট্রিক অ্যাসিড উদ্বায়ী (volatile) বলিয়া উহা গ্যাসের আকারে বাহির হইয়া আসিয়া গোল কাচকুপীতে তরলিত হয় এবং ইহার রঙ হয় ঈষৎ হরিদ্রাভ।

নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্পোৎপাদন (Manufacture of Nitric Acid) : বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে বিশেষতঃ বিস্ফোরক (Explosives) প্রস্তুতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড অপরিহার্য্য। সেই কারণে প্রচুর নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনের

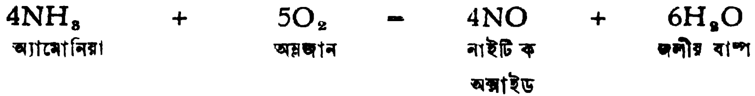
প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার শিল্পোৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি চলিত আছে : (১) চিলি সল্টপিটার ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে—**পাতন প্রণালী** (Distillation Process); (২) বায়ুর অম্লজান ও সোরাজানের সংযোগ হইতে—**আর্ক প্রণালী** (Arc Process); (৩) অ্যামোনিয়াকে জারিত করিয়া—**ওস্‌ওয়াল্ড প্রণালী** (Ostwald Process)। ওস্‌ওয়াল্ড পদ্ধতির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

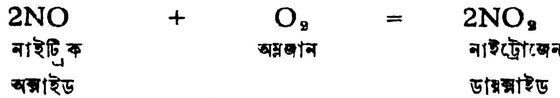


১৪৪নং চিত্র—নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন

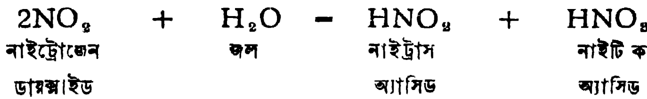
স্বল্প ব্যয় ও অল্প আয়াসে হেভর প্রণালীতে বর্তমানে অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। উত্তপ্ত বায়ুর দ্বারা এই হেভর অ্যামোনিয়াকে জারিত করিয়া নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করা হয়। প্রায় ১ : ৭.৫ আয়তন অনুপাতের বিশুদ্ধ ও শুষ্ক অ্যামোনিয়া ও পূর্ব্ব উত্তপ্ত (preheated) বায়ুর মিশ্রণকে একটি উত্তপ্ত প্লাটিনাম তারজালির [প্লাটিনাম তারজালি অনুঘটকের কার্য্য করে (catalytic agent) এবং উহার উষ্ণতা ৭০০°C রাখা হয়।] ভিতর দিয়া **দ্রুতবেগে** (*rapidly*) পরিচালিত করা হয়। প্লাটিনাম তারজালিটি একটি অ্যালুমিনিয়ামের গোল বাক্সে লওয়া হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়ার শতকরা ৯০ ভাগের বেশী নাইট্রিক অক্সাইডে পরিণত হয়। নাইট্রিক অক্সাইডকে ঠাণ্ডা করিয়া বায়ুর

সাহায্যে নাইট্রোজেন ডায়ক্সাইডে পরিবর্ত্তিত করা হয়। নাইট্রোজেন ডায়ক্সাইড মিশ্রিত বায়ুকে কয়েকটি পাথরের টাওয়ারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হয়। টাওয়ারগুলি কোয়ার্জ পাথরের টুকরা দিয়া প্রায় পরিপূর্ণ থাকে এবং উপর হইতে জলের ধারা প্রবাহিত করা হয়।





নাইট্রোজেন ডায়ক্সাইড জলে দ্রব হইয়া নাইট্রাস ও নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। গাঢ়তা বৃদ্ধির সঙ্গে নাইট্রাস অ্যাসিডও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং ইহার ফলে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক অক্সাইডকে আবার জারণের (oxidation) জন্য ব্যবহার করা হয়।

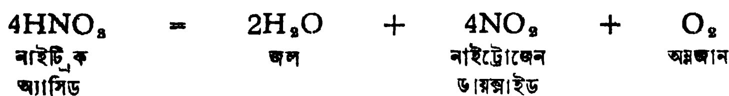




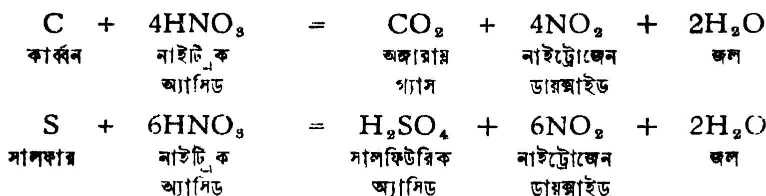
নাইট্রিক অ্যাসিডের ধর্ম্ম (Properties of Nitric Acid) : (১) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি বর্ণহীন, ধূমায়িত, জলাকর্ষী, শ্বাসরোধী গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ (fuming, hygroscopic liquid with a choking smell)। ইহা জলে দ্রবণীয়। পরীক্ষ-নলে নীল লিটমাস লইয়া এক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড দিলে নীল লিটমাস লাল হইবে।

(২) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি তীব্র ক্ষারী তরল পদার্থ (highly corrosive liquid)। দেহের ত্বকের সংস্পর্শে আসিলে উহাকে হলদে করে এবং যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা পড়ে। অনেক জৈব পদার্থ যেমন চামড়া, সিল্ক ইত্যাদির উপর গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড পড়িলে হলদে হইয়া যায়।

(৩) উত্তপ্ত করিলে ইহা বিয়োজিত হইয়া জল, অম্লজান ও পিঙ্গল বর্ণের নাইট্রোজেন ডায়ক্সাইড বাষ্প উৎপন্ন করে।


$$4HNO_3 = 2H_2O + 4NO_2 + O_2$$

(৪) নাইট্রিক অ্যাসিড একটি তীব্র জারক দ্রব্য (oxidising agent)। অধিকাংশ অধাতব মৌল গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডে ফুটাইলে উহা জারিত হইয়া অক্সাইড বা অ্যাসিডে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ কার্ব্বন হইতে কার্ব্বন ডায়ক্সাইড বা অঙ্গারাম্ল গ্যাস, সালফার বা গন্ধক হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড, ফস্‌ফরাস হইতে ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

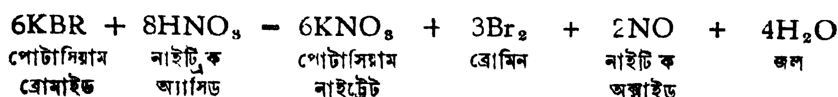

$$C + 4HNO_3 = CO_2 + 4NO_2 + 2H_2O$$
$$S + 6HNO_3 = H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$$

জলন্ত কার্ব্বন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। উত্তপ্ত কাঠের গুঁড়া গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ সহকারে জ্বলিয়া উঠে।

পরীক্ষা: (i) একটি জারে অল্প পরিমাণ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে জলন্ত কার্ব্বনের টুক্‌রা প্রবেশ করাইলে উহা আরও তীব্রভাবে জ্বলিতে থাকিবে।

(ii) বালি খোলাতে কাঠের গুঁড়া বেশ উত্তপ্ত করিয়া উহাতে কয়েক ফোঁটা ধূমায়িত নাইট্রিক অ্যাসিড দিলে উহা স্ফুলিঙ্গ সহকারে জ্বলিয়া উঠিবে।

মৌল ছাড়াও অনেক যৌগিক পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিডে জারিত হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ আয়োডাইড ও ব্রোমাইড যৌগসমূহ হইতে আয়োডিন ও ব্রোমিন নির্গত হয়।


$$6KBR + 8HNO_3 = 6KNO_3 + 3Br_2 + 2NO + 4H_2O$$

(৫) অধিকাংশ ধাতুর সহিত নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটে এবং ফলে ধাতব নাইট্রেট ও নাইট্রোজেনের যৌগ উৎপন্ন হয়। কোন্ প্রকার ধাতব নাইট্রেট

ও কোন্ প্রকার নাইট্রোজেন যৌগ উৎপন্ন হইবে তাহা অ্যাসিডের গাঢ়ত্ব, তাপমাত্রা ও ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ম্যাগনেসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন-যৌগ উৎপন্ন না হইয়া উদজান গ্যাস উৎপন্ন হয়। সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুর উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই। নিম্নে কয়েকটি ধাতুর সহিত নাইট্রিক অ্যাসিড বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হইল।

ম্যাগনেসিয়ামের সহিত

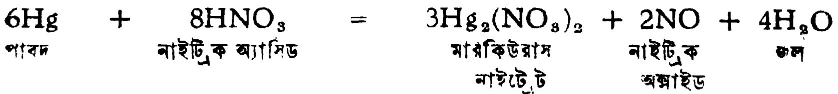
লঘু ও ঠাণ্ডা নাইট্রিক অ্যাসিডে,



$$Mg + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2$$

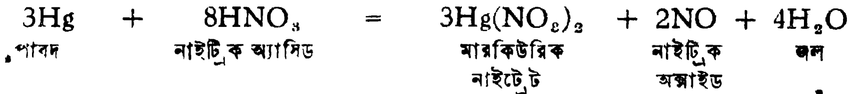
ম্যারকারি বা **পারদের** সহিত

(ক) খুব লঘু ও ঠাণ্ডা অ্যাসিডে,



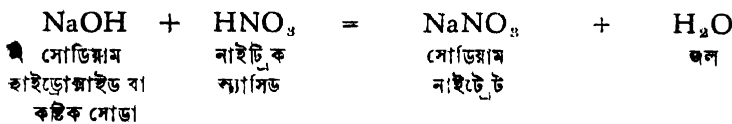
$$6Hg + 8HNO_3 = 3Hg_2(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

(খ) গাঢ় ও উষ্ণ অ্যাসিডে,



$$3Hg + 8HNO_3 = 3Hg(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

(৬) ক্ষারের (alkalies) সহিত ক্রিয়ার ফলে নাইট্রিক অ্যাসিড লবণ ও জল উৎপন্ন করে।



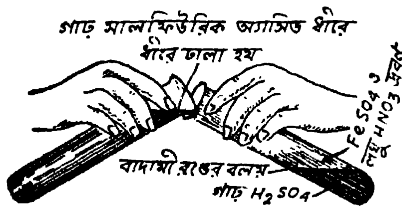
$$NaOH + HNO_3 = NaNO_3 + H_2O$$

(৭) তিন ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও একভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া অ্যাকুয়া রেজিয়া বা অম্লরাজ (Aqua Regia) প্রস্তুত হয়। ইহা সোনা, প্লাটিনাম প্রভৃতি ধাতুকেও দ্রবীভূত করিতে পারে।

নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার (Uses of Nitric Acid) **:** ল্যাবরেটরীতে বহু কার্যে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রধান ব্যবহার বিস্ফোরক

প্রস্তুতিতে যেমন গান কটন, নাইট্রোগ্লিসারিণ, ডিনামাইট [বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড **নোবেল** নাইট্রোগ্লিসারিণ হইতে ডিনামাইট বিস্ফোরক প্রস্তুত করেন। তাঁহার নামে প্রতি বছর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়], পিকরিক অ্যাসিড, ট্রাইনাইট্রো-টলুইন (সংক্ষেপে T. N. T.) ইত্যাদি। কৃত্রিম রঙ, কৃত্রিম রেশম, সেলুলয়েড প্রভৃতি শিল্পেও এই অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। খুব লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিডের পরীক্ষা (Tests of Nitric Acid) : (১) নাইট্রিক আসিডকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও কপারের ছিলা (turning) সহ একত্রে উত্তপ্ত করিলে লাল আভাযুক্ত পিঙ্গল (reddish brown) বর্ণের নাইট্রোজেন ডাযক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে এবং পাত্রস্থিত দ্রবণের রঙ নীলাভ-হরিৎ (bluish green) হইবে। (২) নাইট্রিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণের সহিত ফেরাস সালফেট দ্রবণ মিশাইযা একটি পরীক্ষ-নলে নেওয়া হইল। তারপর অতি ধীরে ধীরে পরীক্ষা নলের গা বাহিয়া গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দিতে হইবে। সালফিউরিক অ্যাসিড গাঢ বলিয়া উহা দ্রবণের নীচে জমিবে। সালফিউরিক অ্যাসিড ও পূর্ব্বোক্ত দ্রবণের সংযোগস্থলে একটি খয়েরী বা বাদামী রংয়ের বলয় বা চক্র উৎপন্ন হইবে। ইহা **রীং টেষ্ট** (Ring Test) বলিযা খ্যাত।

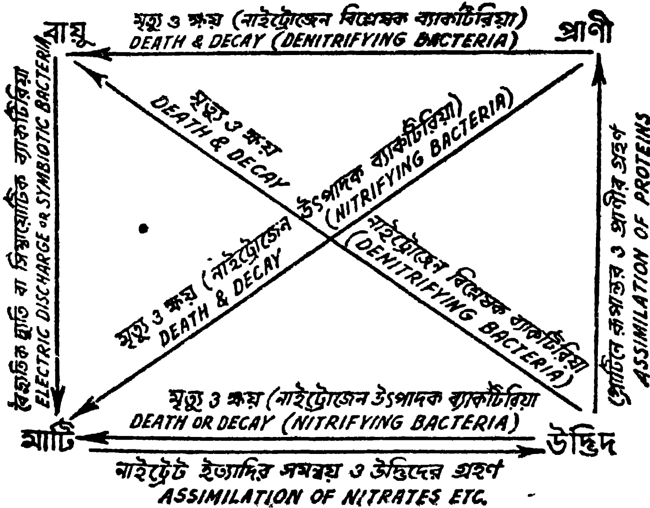


১৪৫নং চিত্র—রীং টেষ্ট

সোরাজান চক্র (Nitrogen Cycle) : জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে সদা সর্ব্বদা সোরাজানের যে আদান-প্রদান চলিতেছে তাহাকেই **সোরাজান চক্র** (Nitrogen Cycle) বলে। জীবের পুষ্টির জন্য প্রোটিন খাদ্য একান্ত প্রয়োজন। এই খাদ্যের প্রধান উপাদান সোরাজান (Nitrogen) বায়ু হইতে আসে এবং সোরাজান চক্রের সাহায্যে বায়ুতে সোরাজানের সমতা রক্ষিত হয। প্রথমে আমরা বায়ুমণ্ডল হইতে সোরাজান জীবজগতে কিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা আলোচনা করিব এবং তারপর জীবজগৎ হইতে সোরাজান জড়জগতে অর্থাৎ এইস্থলে বায়ুমণ্ডলে কিরূপে ফিরিয়া আসিতেছে তাহা দেখিব।

(ক) বৈদ্যুতিক চ্যুতিতে (by electric discharge) বায়ুমণ্ডলের সোরাজান প্রথমে অক্সাইডে পরিবর্ত্তিত হয় ও বৃষ্টির জলে পরিশেষে নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হইয়া বৃষ্টির সহিত ভূমিতে চলিয়া আসে। এইখানে মৃত্তিকাস্থিত ক্ষার-জাতীয় পদার্থের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষারজাতীয় নাইট্রেট প্রস্তুত হয় এবং অবশেষে উদ্ভিদ্ তাহা হইতে প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুতকরণের জন্য যে সোরাজান প্রযোজন তাহা আহরণ করে। [জীববিদ্যায় পুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনাকালে (পৃষ্ঠা ৩১—২৩৮) ইহার বিশদ বিবরণ পাইবে]। প্রাণী উদ্ভিদ্দেহের অংশগুলি ভোজন করিয়া তাহা হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে।

(খ) শিম্বগোত্রীয উদ্ভিদের (leguminous plants) মূলস্থিত ব্যাকটিরিয়া মাটির মধ্যস্থ বায়ু হইতে সোজাসুজি সোরাজান আহরণ করে এবং ইহাকে শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের খাদ্যপযোগী করিয়া দেয় ও ব্যাকৃটিরিযাগুলি ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। বায়ুমণ্ডল হইতে এইভাবে সোজাসুজি সোরাজান আহরণ বেশি মাত্রায হয় না কারণ শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ্ উদ্ভিদ্জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ।



১৪৬নং চিত্র—সোরাজান চক্র

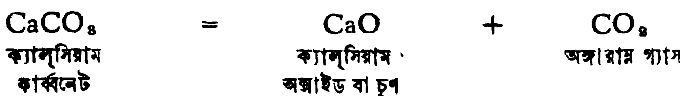
এইবার জীবজগৎ হইতে সোরাজান কিরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে তাহা আলোচনা করা যাক্।

পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ (যেমন মৃত প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদ্‌দেহ, প্রাণীর মলমূত্র ইত্যাদি) যখন মাটিতে ফিরিয়া আসে তখন দুই প্রকার ব্যাকৃটিরিয়া উহাদের উপর ক্রিয়া করে: (১) **সোরাজান-সংযোগ ব্যাকৃটিরিয়া** (*nitrifying bacteria*)—ইহারা সোরাজান ঘটিত জৈব পদার্থগুলিকে প্রথমে অ্যামোনিয়া ও পরিশেষে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণত করে। নাইট্রেট হইতে উদ্ভিদ্ আবার তাহার খাদ্য আহরণ করে। (২) **সোরাজান বিশ্লেষক ব্যাকটিরিয়া** (*denitrifying bacteria*)—ইহারা সোরাজান ঘটিত জৈব পদার্থগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সোরাজান (Nitrogen) উৎপন্ন করে এবং সেই মুক্ত সোরাজান বায়ুমণ্ডলে আসিয়া মিশে। এইভাবে সোরাজান উদ্ভিদ্‌জগৎ ও প্রাণিজগৎ পরিভ্রমণ করিয়া জড়জগতে অর্থাৎ এইস্থলে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে। ইহা সোরাজান চক্র (Nitrogen Cycle) নামে খ্যাত।

ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চূণ

(Calcium Oxide or Lime or Quicklime : CaO)

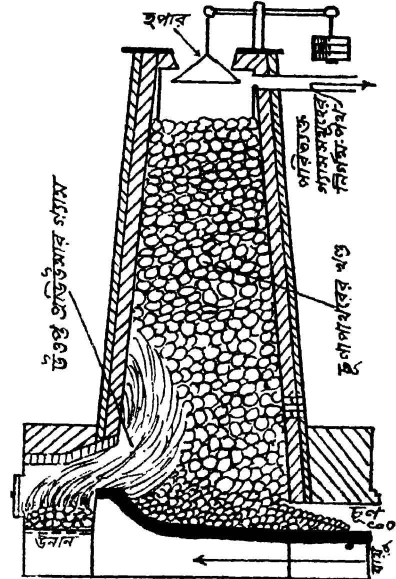
ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চূণ একটি ক্ষারক (Base) এবং এই যৌগিক পদার্থে দুইটি মৌল আছে—ক্যাল্‌সিয়াম ও অম্লজান। উত্তাপ প্রয়োগে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেটকে বিযোজিত করিয়া সর্ব্বদা **ক্যালসিয়াম অক্সাইড** বা **চূণ** প্রস্তুত করা হয়। বহু প্রকার খনিজ পদার্থে প্রচুর পরিমাণ ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়—যেমন চূণাপাথর (limestone), খড়িমাটি (chalk), মার্ব্বেল পাথর (marble) ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কাটনি, সুতনা, বিসরা, জব্বলপুর ইত্যাদি স্থানে এই সকল খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।



$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

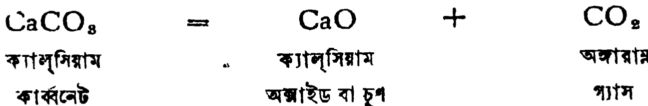
ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট = ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চূণ + অঙ্গারাম্ল গ্যাস

ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুণের শিল্পোৎপাদন (Manufacture of Calcium Oxide or Lime or Quicklime) : ইষ্টক-নির্ম্মিত বড় বড় চুণের ভাঁটিতে বা চুণ-চুল্লীতে (lime- kiln) চুণাপাথরকে (limestone) বিযোজিত করিয়া ক্যাল্‌সিযাম অক্সাইড বা চুণ উৎপাদন করা হয়। চুণের ভাঁটি বা চুণ-চুল্লী দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ গম্বুজের ন্যায়। চুল্লীর নীচে বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে। চুল্লীর নিম্নাংশে এক পার্শ্বে অবস্থিত উনানে (fire place) কয়লা জ্বালাইয়া উত্তপ্ত প্রডিউসার গ্যাস চুল্লীর ভিতর পরিচালিত করা হয়। চুল্লীর মাথার ফাঁক (hopper) দিয়া ছোট ছোট কাঁকরের আকারের চুণাপাথর (limestone) চুল্লীতে প্রবেশ করে। চুল্লীর অভ্যন্তরের উষ্ণতা প্রায় ১০০০° সেন্টিগ্রেড্ হইলে চুণাপাথর বিযোজিত হইয়া ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চূণ এবং অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন করে।



১৪৭নং চিত্র—চূণের শিল্পোৎপাদন

উত্তপ্ত গ্যাসপ্রবাহের সহিত উৎপন্ন অঙ্গারাম্ল গ্যাস উপরের নির্গম-পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। চুল্লীর নীচে সাদা ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণ আসিয়া জমা হয় এবং উহাকে একটি নির্গম-দ্বার দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়।

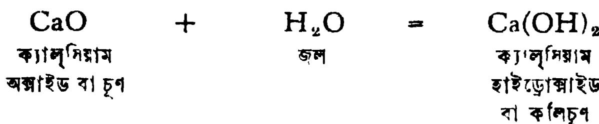


$$CaCO_3 = CaO + CO_2$$

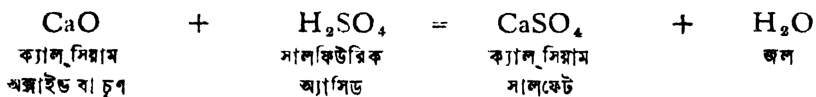
ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট ... ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণ ... অঙ্গারাম্ল গ্যাস

ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণের ধর্ম্ম (Properties of Calcium Oxide or Lime) ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড বা চুণ একটি সাদা অনিয়তাকার (amorphous) কঠিন পদার্থ। উত্তপ্ত করিলে ইহা সহজে গলে না এবং অগ্নি-

হাইড্রোজেন শিখার (oxy-hydrogen flame) অতিরিক্ত উষ্ণতায় উহা ভাস্বর (incandescent) হইয়া উঠে এবং আলোক বিকিরণ করে। ইহাকে **চূণের আলোক** (lime light) বলে। বৈদ্যুতিক-চুল্লীতে (electrical furnace) প্রায় ২৭৫০° সেণ্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় উহাকে গলান যায়। জলের প্রতি চুণের আসক্তি খুব বেশী যদিও জলে ইহার দ্রাব্যতা (solubility) খুব বেশী নহে। চুণের সহিত অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে চুণ উহা তৎক্ষণাৎ সশব্দে শোষণ করিয়া লয়। দ্রবীভূত না হইয়াও এইভাবে চুণ যথেষ্ট জল শুষিয়া লইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সময় যথেষ্ট তাপের সৃষ্টি হয এবং চুণ আয়তনে অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং বিচূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বিচূর্ণ কঠিন বস্তু ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ [$Ca(OH)_2$]। ইহা একটি তীব্র ক্ষার (alkali)।



চুণ অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে।



ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা **চূণের ব্যবহার** (Uses of Calcium Oxide or Lime or Quicklime) **:** ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা চুণ ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ উৎপাদনে, চুণের আলোক প্রস্তুতিতে, শুষ্কীকারক হিসাবে (desiccating agent), ধাতু-নিষ্কাশন শিল্পে বিগালকরূপে (flux), ক্যাল্সিয়াম কারবাইড প্রস্তুতকরণে [ক্যালসিয়াম কারবাইড জলের সহিত ক্রিয়া করিয়া অ্যাসিটিলিন গ্যাস (acetylene ; C_2H_2) উৎপন্ন করে। উৎসবাদিতে গ্যাস হোল্ডারে এই অ্যাসিটিলিন জ্বালিয়া আলোক উৎপন্ন হয়] ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ (Calcium Hydroxide or Slaked Lime) **:** ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা চুণের সহিত অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে চুণ উহা তৎক্ষণাৎ সশব্দে শোষণ করিয়া লয। দ্রবীভূত না হইয়াও এইভাবে চুণ যথেষ্ট জল শুষিয়া লইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সময় যথেষ্ট তাপের

সৃষ্টি হয় এবং চুণ আয়তনে অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে বিচূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই বিচূর্ণ কঠিন বস্তুকে **ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড** বা **কলিচুণ** (slaked lime) বলে।



$$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$$

ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা চুণ + জল = ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ

ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণের ধর্ম (Properties of Calcium Hydroxide or Slaked lime): ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ একটি সাদা অনিয়তাকার (amorphous) কঠিন পদার্থ। প্রায় ৪৫০° সেণ্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলে ইহা শোষিত জল পরিত্যাগ করিয়া ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা চুণে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহা তীব্র ক্ষার (strong alkali)। ইহা জলে খুব সামান্যই দ্রবীভূত হয় এবং উষ্ণতা-বৃদ্ধির সাথে সাথে ইহার দ্রাব্যতা হ্রাস পায়।

ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণের ব্যবহার (Uses of Calcium Hydroxide or Slaked lime): ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুণ দালান-গাঁথনির মশল্লাতে, দালান চুণকামের জন্য, কৃষিকার্য্যে, সিমেণ্ট, কাচ, কংক্রীট, ব্লীচিং পাউডার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

কলিচুণের কতকগুলি পণ্যদ্রব্য (Products of slaked lime) : কলি-চুণের কতকগুলি পণ্যদ্রব্য নিম্নে বিবৃত হইল ঃ

(i) **চুণের জল** (lime water): কলিচুণকে যদি **অতিরিক্ত পরিমাণ জলের** সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে চুণ নীচে থিতাইয়া যায় এবং উহার উপর একটি স্বচ্ছ পরিষ্কার সম্পৃক্ত দ্রবণ পাওয়া যায়। এই স্বচ্ছ সম্পৃক্ত দ্রবণটিকে সাধারণতঃ 'চুণের জল' (lime water) বলে। ল্যাবরেটরীতে ইহার ব্যবহার আছে। অঙ্গারাম্ল গ্যাস পরীক্ষায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

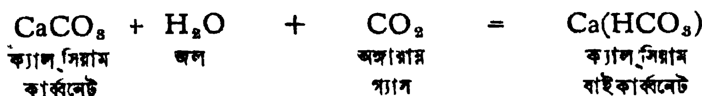
(ii) **চুণ গোলা** (Milk of lime): কলিচুণকে যদি **সামান্য জলের** সহিত মিশ্রিত করা হয় তবে উহা জলে প্রায় ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া দুধের মত সাদা একটি মিশ্রণের সৃষ্টি করে, উহাকে 'চুণ গোলা' (milk of lime) বলে। সস্তা ক্ষার (alkali) বলিয়া বহু শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয়।

(iii) **সোডা চূণ** (Soda lime): পোর্সেলেন পাত্রে বিশুদ্ধ কলিচুণকে কষ্টিক সোডার (NaOH) সহিত গুলিয়া উত্তপ্ত করিলে অতিরিক্ত জল বাষ্পীভূত হয় এবং 'সোডা চূণ' (soda lime) উৎপন্ন হয়। সোডা চূণ শুষ্কীকারক হিসাবে, অঙ্গারাম্ল গ্যাস শোষণ করিতে ও ল্যাবরেটরীতে মার্স গ্যাস (Marsh gas ; CH_4) প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়।

(iv) **মর্টার** (Mortar): একভাগ কলিচুণ ও তিনভাগ বালি একত্রে **অল্প পরিমাণ জল** দিয়া মিশাইলে **চুণা মর্টার** (lime mortar) প্রস্তুত হয়। বাষ্পীভবন ক্রিয়ায় জল বাষ্পীভূত হয় এবং ছিদ্রযুক্ত মর্টারের মধ্য দিয়া কলিচুণ বায়ুর অঙ্গারাম্লকে শোষণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেটে পরিণত হয়। এই ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট বালির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া জমাট বাঁধে এবং দুই ধারের ইট বা পাথরের খণ্ডকে শক্ত করিয়া আট্কাইয়া রাখে। বালির পরিমাণ কম দিলে মর্টারে ফাটল দেখা দেয়। কারণ কলিচূণ ছিদ্রযুক্ত না থাকিলে ইহা বায়ুর অঙ্গারাম্ল শোষণ করিযা সম্পূর্ণভাবে ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেটে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং মর্টারের জল বাষ্পীভূত হইলে কলিচূণের আযতন কমে এবং সঙ্কোচনের জন্য মর্টারে ফাটল দেখা দেয়। সিমেণ্ট, বালি ও জলের মিশ্রণকে **সিমেণ্ট মর্টার** (cement mortar) বলে।

ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট (Calcium Carbonate ; $CaCO_3$) : কলিচুণের সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস সংযোগে ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে খনিজ পদার্থ হিসাবে এত ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট পাওয়া যায় [যেমন চুণাপাথর (limestone), খড়িমাটি (chalk), মার্ব্বেল পাথর (marble) ইত্যাদি] যে ইহার উৎপাদনের কোন প্রশ্নই উঠে না।

ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ধর্ম্ম (Properties of Calcium Carbonate) : ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট একটি সাদা অনিয়তাকার কঠিন পদার্থ। ইহা জলে অদ্রবণীয় কিন্তু জলে দ্রবীভূত অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সম্পৃক্ত দ্রবণে ইহা দ্রবীভূত হইয়া ক্যাল্সিয়াম বাইকার্ব্বনেট উৎপন্ন করে।


$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)$$

অধিক উত্তাপে ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট বিযোজিত হইয়া চুণ ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন করে।

ক্যালসিয়াম কার্ব্বনেটের ব্যবহার (Uses of Calcium Carbonate): ক্যাল্সিয়াম কার্ব্বনেট ক্যাল্সিয়াম অক্সাইড বা চুণ, অঙ্গারাম্ল গ্যাস, সিমেণ্ট, কাচ, ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে বিগালকরূপে (flux), সোডিয়াম কার্ব্বনেট প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মার্ব্বেল পাথর প্রাসাদ নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। খড়িমাটি (chalk) লিখিবার কার্য্যে, চা-খড়ি চূর্ণ (whiting) প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়।

সিমেণ্ট (Cement) : চুণাপাথরের সূক্ষ্ম গুঁড়া ও এঁটেল মাটি বা ক্লে (clay) ঘূর্ণায়মান দীর্ঘ চুল্লীতে রাখিয়া চুল্লীর নিম্নাংশ দিয়া উত্তপ্ত প্রডিউসার গ্যাস পরিচালিত করা হয় এবং চুল্লীর উষ্ণতা ১৪০০° সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত করা হয়। মিশ্রণ পুড়িয়া যায় এবং জমাট বাঁধে। ইহাকে 'ক্লিনকার' (clinker) বলে। চুল্লীর তলদেশ হইতে ইহাকে বাহির করিয়া শীতল করা হয় এবং যন্ত্রে পিষিয়া গুঁড়া করিয়া বায়ুশূন্য থলিতে ভর্ত্তি করা হয়। ইহাকে **সিমেণ্ট** (cement) বলে। এই পদার্থটি প্রধানতঃ ট্রাইক্যাল্সিয়াম সিলিকেট ও ট্রাইক্যাল্সিয়াম অ্যালুমিনেটের মিশ্রণ ($3CaO, SiO_2$; $3CaO, Al_2O_3$)। ক্যাল্সিয়াম সিলিকেট ও ক্যাল্সিয়াম অ্যালুমিনেট আর্দ্র-বিশ্লিষ্ট (hydrolysis) হইয়া জমাট বাঁধে। সাধারণ মর্টার জলের নীচে জমাট বাঁধে না কারণ ইহার জমাট বাঁধার জন্য অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রয়োজন হয় এবং জলের নীচে তাহা পাওয়া যায না। কিন্তু সিমেণ্ট মর্টারের জমাট বাঁধার দরুণ অঙ্গারাম্ল গ্যাসের প্রযোজন হয় না এবং ইহা জলের নীচেও জমাট বাঁধিতে পারে।

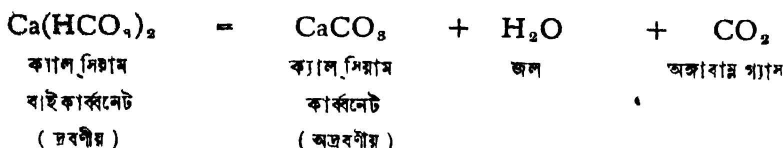
বাড়ীঘর, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে এই বস্তুটির বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অনেকগুলি সিমেণ্টের কারখানা আছে। ১৯৪৮ সালের পর হইতে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং বর্ত্তমানে উৎপাদন বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ টন। জাতীয় সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহার উৎপাদন আরও বৃদ্ধির দরুণ সচেষ্ট আছেন।

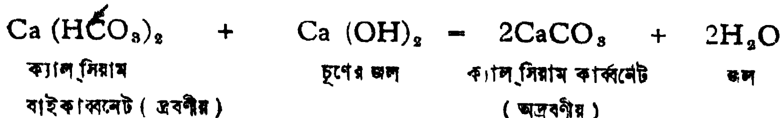
কংক্রীট (Concrete) : সিমেণ্ট, বালি ও পাথরের কুচির মিশ্রণকে **কংক্রীট** (concrete) বলে। এই মিশ্রণ পাথরের মত শক্ত হয়। ষ্টীলের কাঠামোর উপর

কংক্রীট জমাইলে তাহাকে reinforced concrete বলা হয়। দালান-নির্ম্মাণে, সেতু নির্ম্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

জলের খরতা দূরীকরণ (Removal of hardness of water): সাধারণতঃ আমরা যে জল ব্যবহার করি তাহাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: **কোমল জল** (soft water) ও **কড়া জল** (hard water)। (১) যে সব জল সাধারণ সাবানের সহিত অতি সহজেই ফেন (lather) উৎপন্ন করে তাহাকে **কোমল জল** বলে। (২) যে সকল জল সাধারণ সাবানের সহিত সহজে ফেন উৎপন্ন করে না তাহাকে **কড়া জল** বলে। ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থ জলে দ্রবীভূত থাকিলে জল **কড়া** হয় এবং কড়া জলকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়— **অস্থায়ী কড়া জল** (Temporary hard water) ও **স্থায়ী কড়া জল** (Permanent hard water)।

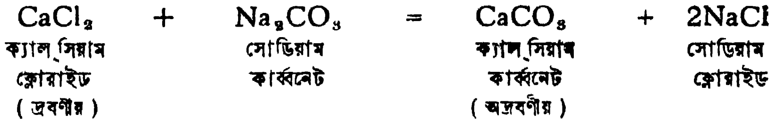
(১) ক্যাল্‌সিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর বাইকার্ব্বনেট অথবা উভয়েই (bicarbonate of calcium or magnesium or both) যখন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে **অস্থায়ী কড়া জল** বলে। এইরূপ কড়া জলকে উত্তপ্ত করিয়া **ফুটাইলে** (by boiling) অথবা প্রয়োজনমত **চুণের জল** (lime water) মিশাইলে দ্রবীভূত বাইকার্ব্বনেট **অদ্রবণীয়** কার্ব্বনেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং ফলে জল আর কড়া থাকে না—কোমল হইয়া পড়ে অর্থাৎ সাবানের সহিত সহজেই ফেন উৎপন্ন করে।





(২) ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট যখন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে **স্থায়ী কড়া জল** বলে। সেই জলকে উত্তপ্ত করিয়া ফুটাইলে বা তাহাতে চুণের জল মিশাইলে কোমল করা যায় না। **সোডিয়াম**

কার্ব্বনেট বা সোডা মিশাইলে ক্যাল্‌সিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড ও সালফেট রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অদ্রবণীয় কার্ব্বনেটে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে এবং ফলে জল আর কড়া থাকে না—কোমল হয় অর্থাৎ উহা তখন সাবানের সহিত সহজেই ফেন উৎপন্ন করে।



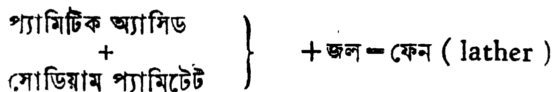


কড়া জলের কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে বলিয়াই উহাকে কোমল করা হয়। (১) ধোপার কারখানায় (laundry) এই জল ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ ইহাতে সাবানের অপব্যবহার হয়। (২) কড়া জল কলকারখানায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে কারণ এই জল ব্যবহারে 'বয়লার' (Boiler) এর ভিতরস্থিত গাত্রে কার্ব্বনেটের স্তর জমে এবং ফলে অনেক কয়লা পোড়াইয়াও জল ফুটান দুষ্কর হইয়া উঠে। (৩) অধিক কড়া জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নহে কারণ ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।

ফেন কি (What is lather)? : সাবান যখন কোমল জলে দেওয়া হয় তখন উহা আর্দ্র-বিশ্লেষণের দরুণ (due to hydrolysis) কষ্টিক সোডা (caustic soda) বা কষ্টিক পটাস (caustic potash) ও ঐ সাবান প্রস্তুত-করণে যে জৈব অ্যাসিড (organic acid) ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই অ্যাসিডে পরিবর্ত্তিত হয়। ধরা যাক, কোন সাবান প্রস্তুতকরণে প্যামিটিক অ্যাসিড (palmitic acid) ও কষ্টিক সোডা ব্যবহৃত হইযাছে। ঐ সাবান যদি কোমল জলে দেওয়া হয় তবে আর্দ্র-বিশ্লেষণের দরুণ উহা কষ্টিক সোডা ও প্যামিটিক অ্যাসিডে পরিবর্ত্তিত হইবে। ঐ মুক্ত অ্যাসিড তারপর সোডিয়াম প্যামিটেটের অণুর সহিত যুক্ত হইয়া

অদ্রাব্য পদার্থ (insoluble substance) উৎপন্ন করে এবং ইহা জলের সহিত মিশিয়া ফেন উৎপাদন করে।

সোডিয়াম প্যামিটেট (soap) + জল = কষ্টিক সোডা + প্যামিটিক অ্যাসিড।



Questions

1. What do you mean by an Oxide ? Classify oxides giving suitable examples.
2. What is a Salt ? Classify them giving suitable examples,
3. What are the constituents of the following compounds : (a) Common Salt, (d) Sodium Carbonate. (c) Epsom Salt, (d) Potassium Permanganate. (e) Caustic Soda. Mention their properties and uses.
4. Describe the manufacturing process of Sodium Carbonate and Caustic Soda.
5. How is Chlorine prepared in the laboratory ? Mention its properties, uses and tests.
6. How is Bleaching Powder manufactured ? Mention its properties and uses.
7. What is the composition of Air ? How do you know that air is a mechanical mxiture and not a chemical compound ?
8. How would you prepare Nitrogen in the laboratory ? Mention its properties, tests and uses.
9. Describe the laboratory method of preparation of Ammonia. Mention its properties, tests anc uses.
10. Describe the manufacturing process of Nitrogen and Ammonia.
11. How is Nitric Acid prepared in the laboratory ? Mention its properties, tests and uses.
12. How is Nitric Acid manufactured ?
13. Write a short essay on Nitrogen Cycle.
14. How is Lime manufactured ? Mention its propertis and uses.
15. Starting from limestone how will you obtain (a) quicklime, (b) slaked lime, (c) milk of lime, (d) soda lime, (e) mortar (f) cement mortar.

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীববিদ্যা (*Biology*)

পুষ্টি (Nutrition)

জীবদেহের—তাহা উদ্ভিদ্‌দেহই হউক বা প্রাণীদেহই হউক—প্রধান উপাদান হইল **কোষ** (cell)। নগ্নচক্ষে ইহাদের দেখা যায় না (অণুবীক্ষণে ইহারা দৃষ্ট)। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে জীবকোষের উপাদানের মধ্যে জৈব পদার্থ (organic substances) ও অজৈব পদার্থ (inorganic substances) দুইই আছে। জৈব পদার্থ মধ্যে আছে প্রোটিন (protein), চর্ব্বি(fat), শ্বেতসার ও শর্করা (carbohydrates) ইত্যাদি এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে অনেক অজৈব লবণ (যেমন সোডিয়াম, পোটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ ইত্যাদি ধাতুর ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, নাইট্রেট্, ফস্‌ফেট, সালফেট ইত্যাদি)। এই সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে জীবকোষের উপাদান হইল কতকগুলি মৌলিক পদার্থ—অঙ্গার (Carbon), উদজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), সোরাজান (Nitrogen), গন্ধক (Sulphur), ফস্‌ফরাস (Phosphorus), পোটাসিয়াম (Potassium), ক্যাল্‌সিয়াম (Calcum), ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesium), লৌহ (Iron) প্রভৃতি। জীবকোষের মধ্যে জলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

জীবকোষের সমস্ত উপাদানগুলিই জড় পদার্থ। জীবকোষে এমন কোন উপাদান নাই, যাহা জড়বস্তু নহে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের মতে **মূল উপাদানে** জীবদেহে ও জড়দেহে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু জীবের এমন কতকগুলি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে যাহা জড়দেহে দেখা যায় না এবং **পুষ্টি** (Nutrition) তাহাদের মধ্যে অন্যতম (জীবের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি হইল—জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে, জীব বংশবিস্তার করে, জীবের শ্বাসক্রিয়া আছে, আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করিয়া জীব দেহের পুষ্টিসাধন করে, উত্তেজনা হইলে চাঞ্চল্যের দ্বারা জীব তাহতে সাড়া দেয়, জীবের গমনশক্তি আছে ইত্যাদি)। পুষ্টির অর্থ

হইতেছে শোষিত খাদ্যবস্তুকে দৈহিক উপাদানে পরিণত করা (শেষ বিশ্লেষণে সেই উপাদানগুলি হইতেছে কতকগুলি মৌলিক জড় পদার্থ যাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)। পুষ্টিসাধন ব্যতীত জীব বাঁচিতে পারে না। জীব প্রতিনিয়ত বহুবিধ কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য দেহযন্ত্রাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ জীবকোষের ধ্বংস হইতেছে। সুতরাং তাহাদের সংস্কার করা বা ক্ষতিপূরণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ দেহের বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন কোষ প্রয়োজন। এই উভয়বিধ কার্য্য পুষ্টির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

উদ্ভিদ্ প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে তাহার খাদ্য সংগ্রহ করে। উদ্ভিদেরা তাহাদের মূলের সাহায্যে মাটির ভিতর হইতে জল ও জলের সহিত মিশ্রিত কতকগুলি আকরিক খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের দেহের প্রধান উপাদান অঙ্গার (carbon) তাহারা মাটি হইতে পায় না। বায়ুমণ্ডলের অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide) গ্যাসকে তাহারা পত্রের দ্বারা শোষণ করে। তাহার পর সূর্য্যালোক, জল ও পত্রের ক্লোরোফিলের (chlorophyll) সাহায্যে আকরিক পদার্থগুলি নানারূপ যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া তাহার দ্বারা জীবকোষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদেরা তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া কঠিন দ্রব্য খায় না।

প্রাণী তাহার দেহের জন্য খানিকটা জল, লবণ ও অম্লজান গ্যাস ছাড়া আর কোন জিনিস প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। উদ্ভিদের কাণ্ড, ফল, মূল, পাতা, ফুল ও বীজে প্রাণীর খাদ্যের উপাদানগুলি—প্রোটিন, শ্বেতসার ও শর্করা, জল, নানাজাতীয় লবণ, চর্ব্বি ও ভিটামিন সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রাণী উদ্ভিদ্‌দেহের অংশগুলি ভোজন করিয়া তাহা হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। প্রাণীরা কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিন প্রকার খাদ্যই খায়। অবশ্য মাংসাশী প্রাণীরা অপর প্রাণীর দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা যে সব প্রাণীর মাংস খায়, তাহাদের রক্তমাংস উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতেই প্রস্তুত। উদাহরণস্বরূপ বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা গরু, ছাগল প্রভৃতির মাংস খায়। কিন্তু গরু ও ছাগলের মাংস তৃণখাদ্য হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং মাংসাশী প্রাণী প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তাহার আহার্য্যের জন্য উদ্ভিদের কাছে ঋণী।

উদ্ভিদেরা প্রত্যক্ষভাবে জড়জগৎ হইতে যে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদের সতেজ বৃদ্ধির জন্য দশটি মৌলের (elements)

একান্ত প্রয়োজন। উহাদের নাম—অঙ্গার (Carbon), উদজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), সোরাজান (Nitrogen), গন্ধক (Sulphur), ফস্ফরাস (Phosphorus), পোটাসিয়াম (Potassium), ক্যাল্সিয়াম (Calcium), ম্যাগ্নেসিয়াম (Magnessium) ও লৌহ (Iron)।

ইহা ছাড়া যে কয়েকটি মৌল অল্প পরিমাণে থাকিলে উদ্ভিদের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির সাহায্য হয় তাহাদের নাম তামা (copper), ম্যাঙ্গানিজ (manganese), বোরন (boron), দস্তা (zinc) ও মলিবডেনাম (molybdenum)। উদ্ভিদের সতেজ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদার্থের প্রভাব যে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়, তাহাকে **জল-চাষ পরীক্ষা** (Water culture experiment) বলে। পূর্ব্বে যে দশটি অপরিহার্য্য মৌলের কথা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে অঙ্গার (carbon) উদ্ভিদ্ বায়ুর অঙ্গারাম্ল হইতে সংগ্রহ করে এবং উদজান (hydrogen) ও অম্লজান (oxygen) জল ও বায়ু হইতে সংগ্রহ করে। আমাদের জল-চাস পরীক্ষা বায়ু ও জলের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়া উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অঙ্গার, উদজান ও অম্লজানের প্রভাব এই পরীক্ষা হইতে জানা সম্ভবপর নয়। বাকী সাতটি মৌলিক পদার্থ বা মৌলকে বিভিন্ন লবণরূপে জলের সহিত মিশাইয়া জল-চাষের জল প্রস্তুত করা হয় এবং মিশ্রিত দ্রবণে এক একটি মৌলের অভাব রাখিয়া সেই দ্রবণের মধ্যে উদ্ভিদের চারা বাড়িতে দিয়া বিভিন্ন চারাগাছের বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষ্য করা হয়।

পরীক্ষা: সম মাপের আটটি কাচের জার লওয়া হইল। প্রথম জারে যে দ্রবণ নেওয়া হইল তাহার মধ্যে সাতটি উপাদানই রহিল। এইজন্য 'নপ'-এর দ্রবণ (Knop's culture solution) ব্যবহার করা হয়। এই দ্রবণে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে:

(i) ক্যাল্সিয়াম নাইট্রেট্ [$Ca(NO_3)_2$] ... .. 1·0 গ্রাম

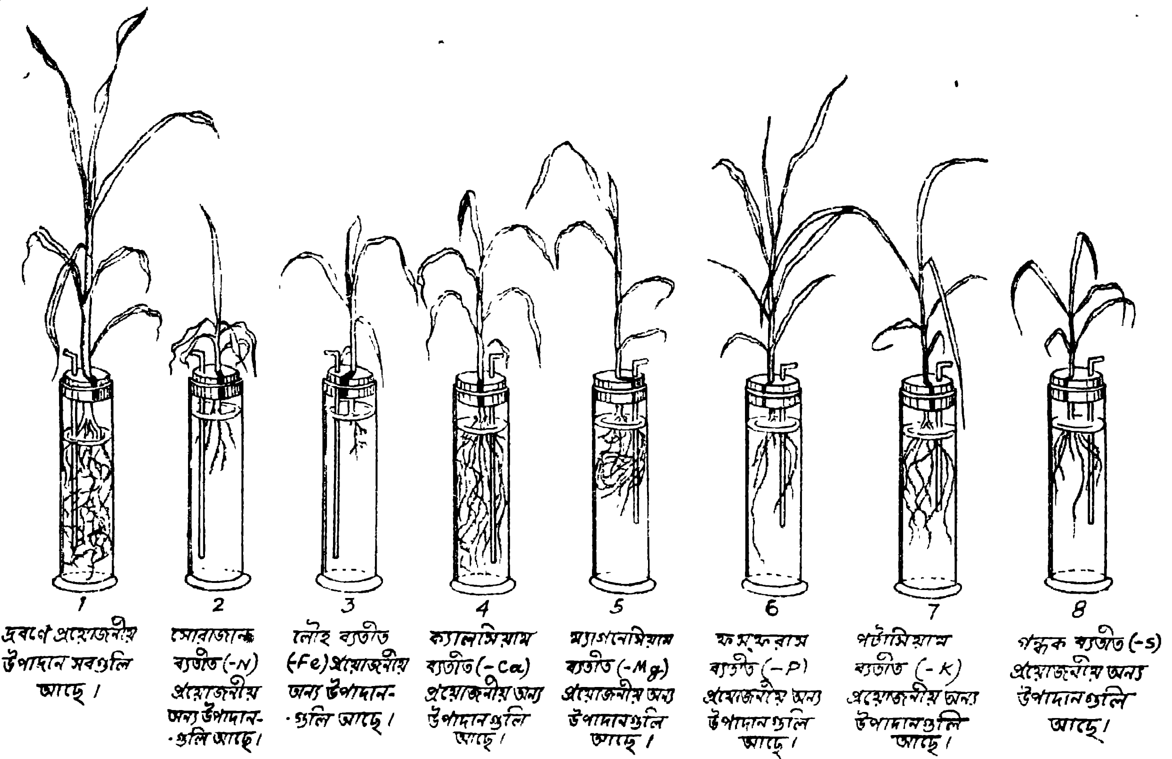
(ii) পেটাসিয়াম নাইট্রেট্ (KNO_3) ... .. 0·2 গ্রাম

(iii) পোটাসিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফস্ফেট্ (KH_2PO_4) .. 0·2 গ্রাম

(iv) ম্যাগ্নেসিযাম সালফেট ($MgSO_4$) ... .. 0·2 গ্রাম

(v) ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) ... ... অতি সামান্য

(vi) পাতিত জল (distilled water, H_2O) ... .. 1 লিটার বা (1000 C. C.)



১৪৮নং চিত্র—জল-চাষ পরীক্ষা

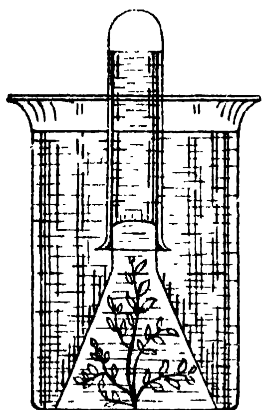
বাকি সাতটি জারে সোরাজান, গন্ধক ফস্‌ফরাস, পোটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম ও লৌহ এই সাতটি মৌলের একটি করিয়া প্রতিটিতে বাদ দিয়া দ্রবণ লওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য প্রথমে জীবাণুমুক্ত ভিজে বালিতে কতকগুলি ভুট্টার বীজ (maize seed) অঙ্কুরিত করা হয়। একই মাপের ও একই ওজনের কতকগুলি ভুট্টার চারাগাছ বাছিযা নিয়া উহাদের শিকড়গুলি পাতিত জলে ধৌত করিয়া প্রত্যেকটি জারের ছিপির মধ্যে দিয়া আটটি চারাগাছ একে একে বসাইয়া এমন ভাবে রাখা হইল যাহাতে চারাগাছের শিকড়গুলি জলের নীচে থাকে। ছিপির মধ্যে একটি করিয়া কাচের নল বসাইযা বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক রাখা হয়। চারাগাছগুলির শিকড়ে বা মূলে যাহাতে আলোক না পড়ে সেই জন্য কালো কাগজ বা কাপড় দিয়া মুড়িযা দেওয়া হয়। দ্রবণগুলি প্রত্যেকটি যেন ঈষৎ অম্লযুক্ত (acidic) হয়। প্রয়োজন হইলে কয়েক ফোঁটা ফস্‌ফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) দ্রবণের মধ্যে দেওযা হয়।

পাঁচ ছয় সপ্তাহ ধরিয়া চারাগাছগুলির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রথম জারের চারাগাছটি স্বাভাবিক ভাবে বড় হইযাছে। অপর চারাগাছগুলি অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব হইয়াছে। যে জারে নাইট্রেট অর্থাৎ সোরাজান উপাদান নাই সেই চারাগাছটি সর্ব্বাপেক্ষা কম বাড়িযাছে। ফস্‌ফেটহীন জারে অর্থাৎ যে জারে ফস্‌ফরাস উপাদান নাই সেই চারাগাছের মূলগুলি তেমন বাড়ে নাই। লৌহ-হীন জারে অর্থাৎ যে জারে লৌহ উপাদান নাই সেই চারাগাছের পাতা হরিদ্রাভ (yellowish) হইয়াছে। পোটাসিয়াম ও ক্যাল্‌সিযামহীন জার দুটিতে অর্থাৎ যে জারে পোটাসিয়াম উপাদান নাই ও যে জারে ক্যাল্‌সিয়াম উপাদান নাই তাহাদের চারা গাছগুলির পাতা ও মূল উভযই খর্ব্ব হইযাছে এবং পাতায় বাদামী দাগ পড়িয়াছে। এই পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয উদ্ভিদের সতেজ বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত মৌলগুলি প্রয়োজন। উপরোক্ত মৌলগুলি উদ্ভিদ্ খাদ্যের মাধ্যমে সংগ্রহ করে এবং নিম্নে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল।

I **বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ** অর্থাৎ **বায়ু হইতে অঙ্গার মৌল আত্মীকরণ** [Nutrition from air or Carbon assimilation (Photosynthesis)] **:** উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে পাতার সাহায্যে অঙ্গার (carbon) গ্রহণ করে।

পাতার ক্লোরোফিলকণা তাহার এই কার্য্যের প্রধান সহায়। বায়ুর সহিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস রন্ধ্রের ভিতর দিয়া পাতায় প্রবেশ করে। এদিকে আবার মূলরোম দিয়া মাটি হইতে শোষিত রস মূল, কাণ্ড ও পাতার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া পাতায় যায়। তখন পাতার **ক্লোরোফিলকণা** (chlorophyll grains) ও **সূর্য্যকিরণের** সাহায্যে **জল** ও **অঙ্গারাম্ল গ্যাসের** (carbon dioxide) বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং ফলে গাছের খাদ্য (শর্করা) প্রস্তুত হয় ও অম্লজান মুক্ত হইয়া বাতাসে মিশে। অঙ্গারাম্লকে উক্ত প্রকারের পরিবর্ত্তন করার নাম **অঙ্গার আত্মকরণ**। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অঙ্গার আত্মকরণে গাছের ওজন বাড়ে ও শক্তি সঞ্চয় হয় এবং এই ক্রিয়া আলোক ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সেইজন্য **সূর্য্যের আলোক গাছের প্রাণস্বরূপ।**

গাছ যে অঙ্গার আত্মকরণ করে এবং অম্লজান গ্যাস ছাড়িয়া দেয় তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়।



১৪৯নং চিত্র—অঙ্গার আত্মকরণ পরীক্ষা

অঙ্গার আত্মকরণ পরীক্ষা (Experiment on Carbon assimilation) : একটি কাচের পাত্রের মধ্যে খানিকটা জল ও কতকগুলি ঝাঁঝি রাখিয়া ঝাঁঝিগুলিতে একটি ফানেল উপুড় করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ফানেলের সরু মুখটি এখন জলের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। এবার একটি জলপূর্ণ পরীক্ষা-নল ফানেলের সরু মুখের উপর উপুড করিয়া বসাইয়া পাত্রটিকে দুই তিন ঘণ্টা রৌদ্রে বসাইয়া দিলে দেখিবে যে, জলের মধ্য হইতে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ উঠিতেছে এবং পরীক্ষ-নলের জলও খানিকটা বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ফানেলমধ্যস্থ ঝাঁঝিগুলির ক্লোরোফিলকণা সূর্য্যালোক পাইয়া অঙ্গার গ্রহণ ও অম্লজান ত্যাগ করিতেছে। পরীক্ষ-নলের গ্যাসকে একটি শিখাহীন জলন্ত কাঠি দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা অম্লজান। পাত্রটিকে রৌদ্র হইতে সরাইয়া অন্ধকারে রাখিলে

আর বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবে না; সূর্য্যালোক ভিন্ন গাছের অঙ্গার আত্মকরণ সম্ভব নহে।

II **মাটি হইতে খাদ্য সংগ্রহ** অর্থাৎ **বাকী নয়টি মৌল আত্মকরণ** (Nutrition from soil or assimilation of other nine elements): উদ্ভিদ্‌ মাটি হইতে সোরাজান, ফস্‌ফরাস, ক্যাল্‌সিয়াম, পোটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, লৌহ, গন্ধক, উদজান ও অম্লজান গ্রহণ করে।

(ক) **সোরাজান** (Nitrogen): মাটির স্বাভাবিক অবস্থায় যে অ্যামোনিয়াম লবণ অথবা নাইট্রেট লবণ থাকে তাহাই উদ্ভিদের সোরাজানের প্রধান উৎস। উদ্ভিদ্‌ মাটি হইতে মূল ও মূলরোমের সাহায্যে যে রস শোষণ করে তাহাতে সোরাজানের মৌল বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা হইতে উদ্ভিদ্‌ সোরাজান গ্রহণ করে। উদ্ভিদ্‌ বায়ু হইতে সরাসরি সোরাজান গ্রহণ করিতে পারে না। শিম জাতীয় উদ্ভিদ্‌ (leguminous plants) অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম। এই জাতীয় উদ্ভিদের মূলে এক প্রকার **গুটি** (nodule) থাকে। এই গুটির ভিতর (অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট) ছোট ছোট দাঁড়ির আকারের জীবাণু (bacteria) থাকে। এই জীবাণু মাটির মধ্যস্থ বায়ু হইতে সোরাজান লইয়া তাহা শিম জাতীয় উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিয়া দেয় ও জীবাণুগুলি ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্‌ হইতে শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে। এই প্রকার জীবাণুকে সোরাজান-খাদ্য-পরিণতকারক জীবাণু (nitrogen fixing bacteria) বলে।

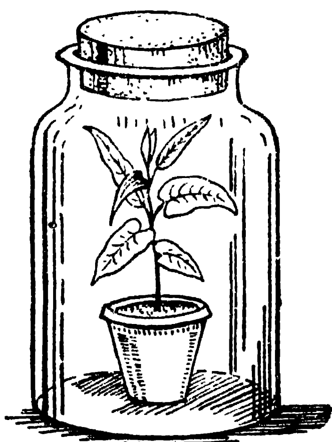
(খ) **ক্যাল্‌সিয়াম** ও **ফস্‌ফরাস** (Calcium and Phosphorus): মাটিতে ক্যাল্‌সিয়াম কার্ব্বনেট, সালফেট, ফস্‌ফেট ইত্যাদি লবণ থাকে। উদ্ভিদ্‌ মাটি হইতে মূল ও মূলরোমের সাহায্যে যে রস শোষণ করে তাহাতে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাসের যৌগ বর্ত্তমান থাকে এবং উদ্ভিদ্‌ তাহা হইতে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস গ্রহণ করে।

(গ) **পোটাসিয়াম** ও **গন্ধক** (Potassium and Sulphur): মাটির স্বাভাবিক অবস্থায় যে লবণগুলি পাওয়া যায় তাহাতে পোটাসিয়াম ও গন্ধক থাকে।

উদ্ভিদ্ মাটি হইতে মুল ও মুলরোমের সাহায্যে যে রস শোষণ করে তাহাতে পোটাসিয়াম ও সালফার যৌগিক পদার্থরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা হইতে উদ্ভিদ্ পোটাসিয়াম ও গন্ধক গ্রহণ করে।

(ঘ) **ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও লৌহ** (Magnesium and Iron): মাটির স্বাভাবিক অবস্থায় যে লবণগুলি পাওয়া যায় তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও লৌহ থাকে। উদ্ভিদ্ মাটি হইতে মুল ও মুলরোমের সাহায্যে যে রস শোষণ করে তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিযাম ও লৌহ যৌগিক অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা হইতে উদ্ভিদ্ ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও লৌহ গ্রহণ করে।

(ঙ) **উদজান ও অম্লজান বা জল** (Hydrogen and Oxygen or Water): উদ্ভিদ্ মুল ও মুলরোম দিয়া মাটি হইতে যে রস শোষণ করে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় জল অপেক্ষা অধিক জল পাইয়া থাকে। [অঙ্গার ব্যতীত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলগুলি অন্যান্য খনিজ পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া যৌগিক পদার্থরূপে মাটিতে থাকে। মাটির প্রত্যেক কণিকার চারিদিকে সামান্য পরিমাণ জল থাকে। উহাতে অথবা মূলরোম হইতে নিঃসৃত রসে ঐ পদার্থগুলি দ্রবীভূত হইয়া তরল হয়। ইহাকে **রস** বলা হয়। অন্যান্য মৌলগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে পাইবার জন্য উদ্ভিদ্‌কে অনেক রস শোষণ করিতে হয় এবং সেইজন্য উদ্ভিদ্ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জল পাইয়া থাকে]। কিন্তু এত জল গাছের দরকার হয় না। গাছ প্রয়োজনমত জল রাখিয়া বাকী অংশ পাতার রন্ধ্র দিয়া বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেয়। **যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে পত্র হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহাকে প্রস্বেদন** (Transpiration) **বলে।** অত্যধিক উত্তাপ, শুষ্ক বায়ু এবং আলোক প্রস্বেদন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। উষ্ণপ্রধান দেশে বাতাস উষ্ণ হইলে অধিক



১৫০নং চিত্র—গাছের প্রস্বেদন পরীক্ষা

পরিমাণে জল বাষ্পাকারে নির্গত হয় এবং এইরূপে উদ্ভিদ্ অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে প্রস্বেদন প্রমাণ করা যাইতে পারে।

প্রস্বেদনের পরীক্ষা (Experiment on Transpiration) **:** সূর্য্যালোকে ছিল এরূপ একটি টবের গাছ লইয়া উহার গোড়ার মাটি একখণ্ড রবারের চাদর দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইল। এখন একটি কাচের বেলজার দিয়া গাছটিকে ঢাকিয়া দিলে কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা যাইবে যে, কাচপাত্রের ভিতর দিকে জলবিন্দু জমা হইয়াছে. এই জলবিন্দু প্রস্বেদন ক্রিয়ার ফলে বৃক্ষদেহ হইতে নির্গত হয় (১৫০নং চিত্র দেখ)।

মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের সম্পর্ক (Soil, its relation to Plants) **:** মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ, কারণ উদ্ভিদেরা মৃত্তিকা হইতে তাহাদের কতকগুলি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার মধ্যে নানাবিধ পদার্থ আছে। তাহাদের মধ্যে জল, গন্ধক, সোরাজান, লৌহ, ফস্ফরাস, ক্যালসিযাম, পোটাসিযাম্ ও ম্যাগনেসিযাম এই কযটি পদার্থ গাছের দেহধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক। ইহাদের কোনটির অভাব ঘটিলে গাছ বাড়ে না, এমন কি বাঁচিতেই পারে না। ঐ জিনিসগুলি যৌগিক পদার্থরূপে মৃত্তিকার মধ্যে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। আমরা কঠিন ও তরল উভয় প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি কিন্তু উদ্ভিদ্ কঠিন খাদ্য খাইতে পারে না। জলে দ্রবীভূত ঐ সকল পদার্থ মৃত্তিকা হইতে তাহারা শিকড় বা মূল দ্বারা শোষণ করে।

যদি ঐ সকল খাদ্যের মধ্যে কোনটি জলে দ্রবণীয না হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদ্ শিকড় বা মূল হইতে এক প্রকার অম্লরস বাহির করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করে। রূপান্তর ঘটিলে জিনিসটি জলের সঙ্গে মিশিযা যায়। জলে দ্রবীভূত খাদ্যগুলি প্রথমে মূলের দ্বারা বৃক্ষদেহে প্রবেশ করে। তাহার পর কাণ্ডের ভিতর দিয়া উহারা বৃক্ষপত্রে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস আছে। বৃক্ষপত্র বায়ু হইতে তাহা গ্রহণ করে। পত্রের মধ্যে ক্লোরোফিল নামক সবুজ পদার্থ আছে। সেইজন্য বৃক্ষপত্রের রঙ সাধারণতঃ সবুজ। ক্লোরোফিল ও সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে গাছ শোষিত অঙ্গারাম্ল গ্যাস হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে। মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে সংগৃহীত এই সকল পদার্থ তাহার পর মিলিয়া মিশিয়া বৃক্ষদেহের

উপযোগী নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্যের কতিপয় অংশ দ্বারা বৃক্ষদেহের গঠন হয়, অবশিষ্ট বৃক্ষদেহের পত্রে, কাণ্ডে, ফুলে, মূলে ও ফলে সঞ্চিত হইয়া থাকে। **উহাই আমাদের খাদ্য।**

উদ্ভিদ্ হইতে মানুষের খাদ্য সংগৃহীত হয়। সেইজন্য কৃষিকার্য্য দ্বারা মানব উদ্ভিদের- বংশবৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। কৃষির জন্য উপযুক্ত মৃত্তিকা ও জলের আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসলের উপযোগী। ফসলের উপযোগিতা অনুসারে কৃষকেরা 'এক-ফসলি', 'দো-ফসলি', 'শালি', 'ভাদই', 'রবি' প্রভৃতি নামে কৃষিক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার উপাদান অনুসারে উহাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :

(১) **বেলে মাটি** (Sandy Soil) : এই শ্রেণীর মাটিতে শতকরা ৯০ ভাগ বালি ও ১০ ভাগ কাদা ও অন্যান্য জৈব পদার্থ বর্ত্তমান। এই প্রকার মাটি প্রচুর জল শোষণ করিলেও কাদার ভাগ কম থাকায় জল ধরিযা রাখিতে পারে না। এই মাটি চাষের উপযোগী নহে তবে ইহাতে তরমুজ, ফুটি, পটল ইত্যাদি ফসল ভাল জন্মে।

(২) **দো-আঁশ মাটি** (Loamy Soil) : এই প্রকার মাটিতে প্রায় সমান সমান বালি ও কাদা থাকে। প্রচুর বালি থাকায় এই মাটি জল শোষণ করিতে পারে, আবার পর্য্যাপ্ত কাদা থাকায় জল ধরিয়াও রাখিতে পারে। চাষের পক্ষে এই মাটি খুবই উপযোগী। ইহাতে গম, ইক্ষু, পেঁয়াজ, তামাক প্রভৃতি প্রচুর জন্মে।

(৩) **এঁটেল মাটি** (Clayey Soil) : এই শ্রেণীর মাটিতে ৭০।৮০ ভাগ কাদা ও জৈব পদার্থ এবং ১০।১২ ভাগ বালি থাকে। এঁটেল মাটি জল ধরিয়া রাখিতে পারে কিন্তু ইহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এই মাটি সাধারণতঃ চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়। চূণ বা ক্ষার জাতীয় কোন জিনিস দিলে এই প্রকার মাটির উর্ব্বরতা বাড়ে। এঁটেল মাটির উপর বালি পড়িলে ধান চাষ করা যায়।

(৪) **চূণে বা কষায় মাটি** (Calcareous or Marly Soil) : এই প্রকার মাটিতে শতকরা ১০।১২ ভাগ চুণ থাকে। চুণে মাটি বেশ উর্ব্বর হয় কারণ চুণের সাহায্যে মৃত্তিকার অন্তর্গত জৈব পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদ্-পোষণোপযোগী হয় এবং সোরা (KNO_3) ও সোরার ন্যায় বিশেষ সারবান পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই মাটি

এঁটেলের অতি আটাল ও বালির অতি শিথিল প্রকৃতি দূর করিয়া উভয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংস্থাপন করে।

(৫) **বোদ বা পীট মাটি** (Peat soil) **:** জৈব পদার্থ এই মাটিতে প্রচুর। ইহা চাষের উপযোগী নয, তবে ইহাতে চা গাছের চাষ করা সম্ভব।

এই সকল ব্যতীত মাটিতে কাঁকর বেশী থাকিলে, উহাকে **কাঁকর-মাটি,** বলা হয। এই মাটি ধান-চাষের উপযোগী। যে মাটিতে মোটা ও সরু দুই-প্রকার বালি থাকে, তাহাকে **'বেলে দো-আঁাশ মাটি'** বলে। যে মাটিতে লৌহজাত দ্রব্য অধিক থাকে, তাহার রঙ লাল এবং তাহাকে বলে **'লাল মাটি'**। এই মাটি ধান চাষের উপযোগী।

বাংলার মাটি (Soil in Bengal) **:** সাধারণতঃ বাংলাদেশে বেলে মাটি, দো-আঁশ মাটি, এঁটেল মাটি, কাঁকর মাটি, লাল মাটি ইত্যাদি কয়েক প্রকারের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়।

সার (Manure) **:** উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি স্বভাবতঃ মৃত্তিকার মধ্যে কিছু না কিছু বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু উৎপন্ন শস্য মৃত্তিকা হইতে অনেক খাদ্য বাহির করিয়া লয় এবং ফলে উর্ব্বরতার ক্রমশঃ হ্রাস হয়। ফসল জন্মাইবার ফলে ক্ষেতে যে সব পদার্থের অভাব ঘটে, তাহা যদি মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে অবিলম্বে উহার উর্ব্বরতা ফিরিয়া আসে। ইহাকে সার দেওয়া বলে। **যে সব পদার্থে উদ্ভিদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে তাহাদিগকে সার বলা হয়।** সার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত **:** (১) সাধারণ সার ও (২) বিশেষ সার। সোরা-জান, ফস্‌ফরাস্, পোটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম—এই চারিটি উপাদানের একটি ব একাধিকের গুণবিশিষ্ট পদার্থ 'বিশেষ শ্রেণী' সার বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে সকল পদার্থে এই চারিটি উপাদনের গুণ বর্ত্তমান তাহাকে সাধারণ সার বলে। গৃহজাত সার, খৈল সার, সবুজ সার, উদ্ভিজ্জ সার, মানুষের মলমূত্র হইতে প্রস্তুত সার, 'সাধারণ সার' পর্য্যায়ভুক্ত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অনেক অজৈব পদার্থ যেমন সালফেট অফ অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট অফ পটাস্ ইত্যাদি 'বিশেষ সার' শ্রেণীভুক্ত।

গৃহজাত সার : কৃষকগণের গোয়ালে প্রতিদিন যে পরিমাণ গোময়, গোমূত্র

ও অন্যান্য আবর্জ্জনা জমা হয়, তাহাকেই গৃহজাত সার বলে। এই সকল জিনিস সারে পরিণত করিতে হইলে গোশালার নিকটে মাটিতে একটি গর্ত্ত করিয়া নালা দ্বারা গোশালার সহিত উহার সংযোগ করিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে গোশালার প্রতিদিনের মূত্র ঐ গর্ত্তে আসিয়া জমা হইতে পারে। গোশালার যাবতীয় আবর্জ্জনা যথা গরুর ভুক্তাবশিষ্ট পদার্থ, খড়, গোময় প্রভৃতি একত্র করিয়া প্রত্যহ ঐ গর্ত্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তারপর মাঝে মাঝে কোদালি দ্বারা ঐগুলি মিশাইয়া দিলে কিছুদিন পরে উহারা পচিয়া সারে পরিণত হয়। সাধারণ কৃষকের পক্ষে গোময় সার সহজলভ্য এবং ইহা উৎকৃষ্ট সার।

কৃষকেরা অনেকে পলুপোকা পোষে এবং ছাগল, মেষ, মুরগী ইত্যাদি পালন করে। এই সকল গৃহপালিত পতঙ্গ ও পশুপক্ষীর বিষ্ঠাও ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করা হয়। ইহারা গোময় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সার।

মলজাত সার ঃ মানুষের মলমূত্র যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যায় তবে উত্তম সার প্রস্তুত করা সম্ভব। গৃহস্থের বাড়ী হইতে মলমূত্র লইয়া গিয়া বাসস্থান হইতে দূরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। কয়েক মাস বাদে উহা উত্তম সারে পরিণত হয় এবং ঐ সার জমিতে দিলে ফসল ভাল হয়। বড় বড় শহরের ড্রেন পায়খানা হইতে মলমূত্র সংগ্রহ করিয়া বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে উহাকে উত্তম সারে পরিণত করা যায়।

খৈল সার ঃ আমাদের দেশে খৈল একটি প্রধান সার। ইহাদের মধ্যে সরিষা, তিল, মসিনা, রেড়ি, চিনে বাদাম প্রভৃতি হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। খৈল সার চূর্ণ করিয়া বীজ বপনের কিছু পূর্ব্বে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এই সার সর্ব্বদাই মাটির উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়, মাটির নীচে বসিয়া গেলে কোন ফল হয় না। যে পরিমাণ খৈল জমিতে দেওয়া দরকার তাহা একেবারে না দিয়া ২।৩ দিন পরে দুইবারে দেওয়া উচিত। আখ, আলু, তামাক প্রভৃতি ফসলের জন্য প্রতি বিঘাতে প্রায় দুই মণ খৈল সার দেওয়া দরকার।

সবুজ সার ঃ ধইঞ্চা, শণ, খেসারি প্রভৃতি শিম্বীজাতীয় শস্য ক্ষেত্রে জন্মাইয়া গাছগুলি কাঁচা অবস্থায় চাষ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্ব্বরতা বাড়িয়া থাকে.; ঐ সারের নাম সবুজ সার। বীজ বপনের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে জমিতে সবুজ সার চাষ করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হয়। গাছগুলি পচিয়া উত্তমরূপে

মাটির সঙ্গে না মিশিলে এই সার হইতে ভাল ফল পাওয় যায় না। সবুজ সার দেওয়ার পর কিছু ছাই ও চূণ একত্রে মিশাইয়া জমিতে প্রযোগ করিলে কাঁচা-পাতা ও ডালগুলি সহজে পচিয়া সারে পরিণত হইতে পারে।

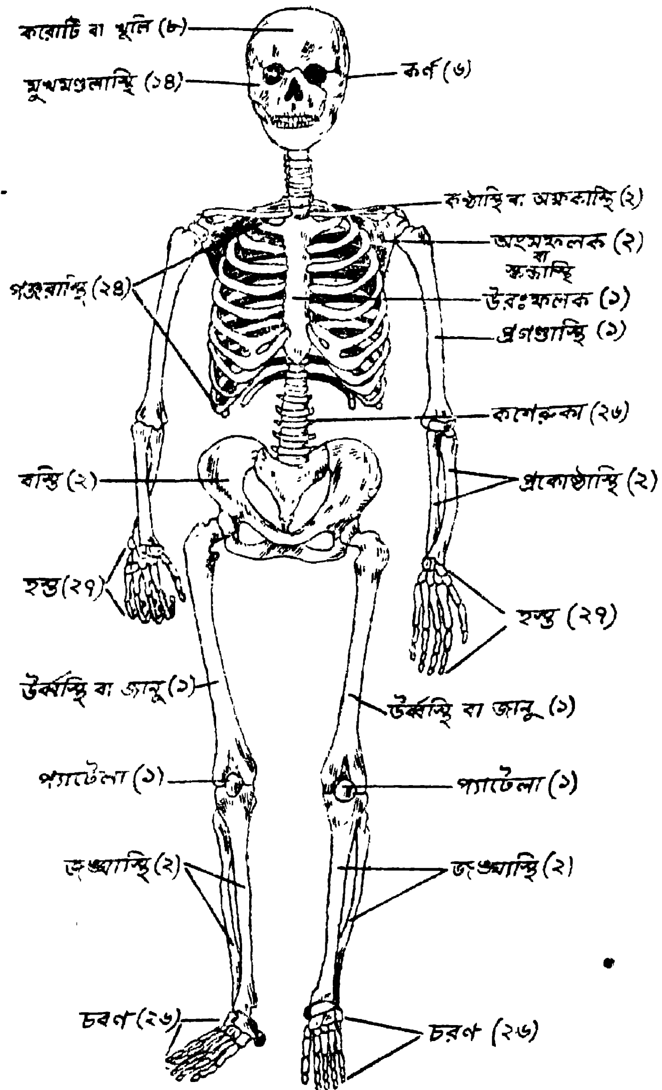
উদ্ভিজ্জ সার : গাছের ডালপালা ও পত্রাদি পচিযা যে সার হয় তাহাকে উদ্ভিজ্জ সার বলে। একটি গর্ত্ত করিয়া গাছের ডালপালা, পাতা এবং লতা, গুল্ম ইত্যাদি বৎসরকাল ফেলিযা রাখিলেই উহা পচিয়া সারে পরিণত হয়। পরে ইহা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চারাগুলি বড় না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ সার প্রয়োগ করা উচিত নহে। কারণ এই সারের মধ্যে প্রায়ই একপ্রকার কীট থাকে, উহা ছোট চারার নরম শিকড়গুলি কাটিয়া দেয।

কম্পোষ্ট : জৈব-পচন নামক বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শহরের দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা পচাইয়া 'হিউমাস' যুক্ত অতি উত্তম জৈব সার প্রস্তুত করা সম্ভব। ইহা গন্ধহীন ও ক্ষতিকর জীবাণু-বিহীন এবং এই সারের সাহায্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত বাড়ানো যায়। আবর্জ্জনা-পচানো জৈব সারকে কম্পোষ্ট বলে।

রাসায়নিক সার : রাসায়নিক সারের প্রচলন পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত সার ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত ও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে জমির 'হিউমাস' নষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে জমিতে আর ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব হইবে না। আমেরিকাতে এটা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং জমিতে রাসাযনিক সার ব্যবহার করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

Questions

1. What is meant by nutrition ? Describe the water culture experiment to demonstrate the importance of different elements in the nutrition of plants.
2. Classify soil and state which kinds of agricultural products are suited for each one of them.
3. What is manure ? Classify them and show its importance in agricultural operations.



১৫১নং চিত্র—নরকঙ্কাল

সপ্তম অধ্যায়

শারীরবিদ্যা (*Physiology*)

মানবদেহ (Human body)

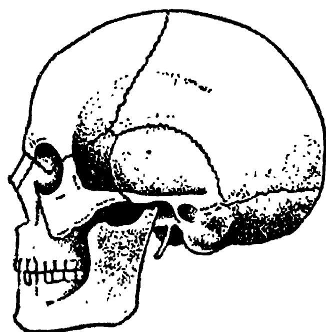
মানবদেহ সম্বন্ধে এবার আমরা কিছু আলোচনা করিব। শিল্পী যখন মৃন্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, তখন সে প্রথমে বাঁশ, বাখারি, দড়ি প্রভৃতি দিয়া একখানা শক্ত কাঠামো তৈয়ার করিয়া লয়। তারপর তাহার উপর প্রয়োজনমত খড় মাটি দিয়া উহাকে তাহার অভিলষিত আকৃতি প্রদান করিয়া থাকে। গঠন শেষ হইলে সে সেই মূর্ত্তিকে নানা রঙে রঞ্জিত করে। মানুষের দেহখানাও প্রায় ঐ প্রণালীতে গঠিত। তোমরা হাত অথবা পা টিপিয়া দেখ, কোমল মাংসের নীচে একটা কঠিন পদার্থ রহিয়াছে। উহা আমাদের দেহের কঠিন অস্থিনির্ম্মিত কাঠামো বা **কঙ্কাল** (skeleton)। তাহার উপর কোমল **মাংসপেশী** (muscles), তাহার উপর খানিক **চর্ব্বি** (fat) এবং সর্ব্বোপরি আছে **ত্বক্** বা **চামড়া** (skin)। ত্বকের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম **রঞ্জনকোষ** (pigment cell) দ্বারা ত্বকের রঙ করা হইয়াছে। দেহের বিভিন্ন স্থানের ভিতর দিয়া অসংখ্য **শিরা** (vein) ও **ধমনী** (artery) জালের মত বিস্তৃত। ইহাদের ভিতর দিয়া রক্ত চলাচল করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া মানবদেহে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম **নার্ভ** (nerve) আছে। ইহারা আমাদের অনুভূতি ও দেহের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ বহন করে।

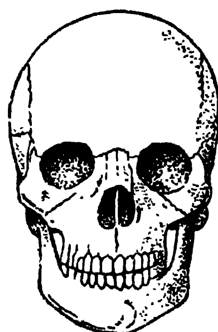
অস্থিতন্ত্র (Osseus System) : আমাদের কঠিন কাঠামোখানা অস্থি ও হাড়-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা মৃন্ময় প্রতিমার কাঠামোর মত একখানা জিনিস নয়। ছোট, বড়, গোল, চ্যাপটা, সরু, মোটা 206 খানা হাড়ের সংযোগে নরদেহের কাঠামো গঠিত। এই অস্থিময় কাঠামোর নাম **কঙ্কাল** (skeleton)। কঙ্কালখানা দেহের অন্যান্য কোমল অংশকে ধারণ করিয়া থাকে এবং সমস্ত দেহখানাকে খাড়া করিয়া রাখে। কঙ্কাল না থাকিলে কঙ্কালহীন কেঁচোর মত আমরা মাটির উপর পড়িয়া থাকিতাম এবং অতিকষ্টে নড়াচড়া করিতে পারিতাম। মাছ খাইবার সময় মাছের যে কাঁটাগুলি দেখিতে পাও, উহা মাছের কঙ্কালেরই অংশ। আবার আমাদের

কঙ্কালখানা যদি একখানা হাড়ে নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে মৃন্ময় প্রতিমার মত আমাদিগকে নিশ্চলভাবে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত।

কঙ্কালের (skeleton) স্থূলতঃ ৪টি অংশ দেখা যায়: (১) **মস্তক** (head); (২) **ধড়** (trunk); **ঊর্দ্ধশাখা** (upper limb); ও (৪) **অধঃশাখা** (lower limb)।

১। **মস্তক** (Head): ইহা একটি গোলাকৃতি কৌটার মত। ইহাই আমাদের মস্তিষ্কের আধার। মস্তকের দুইটি অংশ—**করোটি** বা **খুলি** (skull) ও **মুখমণ্ডল** (face)। 8 খানা **চ্যাপ্টা হাড়** দৃঢ়ভাবে পরস্পর যুক্ত হইয়া মাথার খুলি গঠিত করিয়াছে। করোটির নীচের অংশকে **মুখমণ্ডল** বলে। মুখমণ্ডলে 14 খানি হাড় আছে। ইহাদের মধ্যে 13 খানি খুলির সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত; অবশিষ্ট 1 খানি আমাদের নিম্নের চোয়াল (lower jaw or mandible) কব্জার দ্বারা উপরের সহিত সংযুক্ত। মুখমণ্ডলের অন্তর্গত দুই কর্ণে তিনখানি (malleus, incus, stapes)


১২২নং চিত্র—মাথার খুলি [পার্শ্বদেশ]

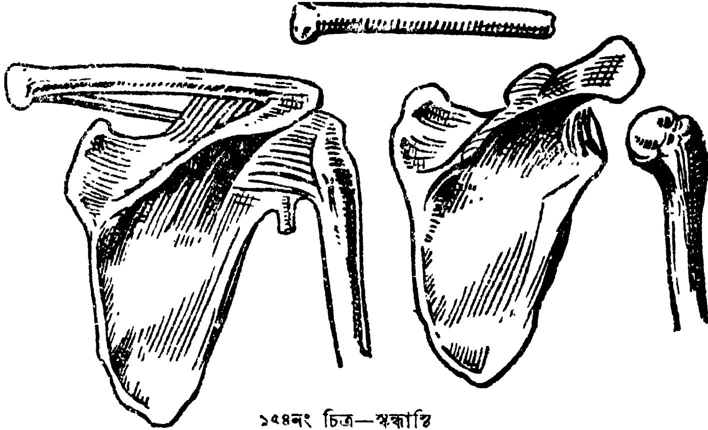

১২৩নং চিত্র—মাথার খুলি [সম্মুখ]

করিয়া 6 **খানা ক্ষুদ্রাস্থি** রহিয়াছে। ইহা ছাড়া গলদেশের কণ্ঠনালীতে **একখানি অস্থি** (hyoid bone) আছে।

২। **ধড়** (Trunk): ধড় চারিটি অংশ লইয়া গঠিত: (ক) স্কন্ধবেষ্টনী, (খ) মেরুদণ্ড, (গ) বক্ষপঞ্জর ও (ঘ) বস্তি।

(ক) **স্কন্ধবেষ্টনী** (Shoulder girdle): স্কন্ধের পশ্চাদ্দিকে দুই পার্শ্বে দুইখানা চ্যাপ্টা অস্থি আছে, ইহাদিগকে **পাখনার হাড়** বা **স্কন্ধাস্থি** (shoulder blade)

বা অংশফলক (scapula) বলে। বক্ষাস্থির উপর হইতে দুই পার্শ্বে দুইখানা বাঁকা হাড় স্কন্ধাস্থির সহিত যুক্ত রহিয়াছে। ইহাদিগকে **অক্ষকাস্থি** বা **কণ্ঠাস্থি**

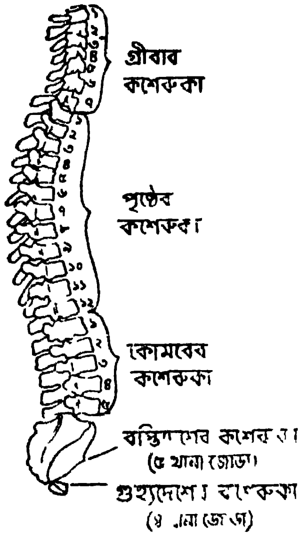


১৪৪নং চিত্র—স্কন্ধাস্থি

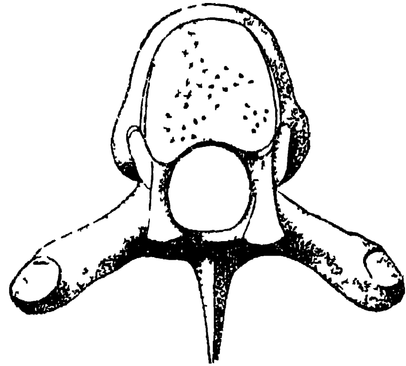
(collar bone or clavicle) বলে। এই উভয় প্রকার হাড়ের সংযোগে স্কন্ধবেষ্টনী গঠিত।

(খ) **মেরুদণ্ড** (Spine or Vertebral column) : মানবদেহের মেরুদণ্ড মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া দেহের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া ধড়ের শেষপ্রান্ত শ্রোণী পর্য্যন্ত লম্বিত আছে। ইহাতে মোট 26 খানি **গোলাকার অস্থি** বা **কশেরুকা** একটির উপর একটি করিয়া সাজান থাকে। মেরুদণ্ডটিকে সম্মুখ বা পশ্চাদ্দেশ হইতে দেখিলে ঋজু বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পার্শ্বদেশ হইতে দেখিলে ইহাতে পাঁচটি বাঁক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, (১) **গ্রীবাদেশের বাঁক** (cervical curve), 7 খানি অস্থি দ্বারা গঠিত ; (২) **পৃষ্ঠদেশের বাঁক** (dorsal curve), 12 খানি অস্থি দ্বারা গঠিত ; (৩) **কটিদেশের বাঁক** (lumbar curve), 5 খানি অস্থি দ্বারা গঠিত ; (৪) **বস্তিদেশের বাঁক** (sacral curve), শৈশবকালে ইহাতে 5 খানি পৃথক অস্থি থাকে কিন্তু পরিণত বয়সে ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। (৫) **গুহ্যদেশের বাঁক** (coccygeal curve), শৈশবকালে ইহাতে 4 খানি

পৃথক অস্থি থাকে কিন্তু পরিণত বয়সে ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। মেরুদণ্ডে এই সব বাঁক আছে বলিয়া ইহাকে ইচ্ছামত বাঁকাইতে পারা যায়।



১৫৫নং চিত্র—মেরুদণ্ড

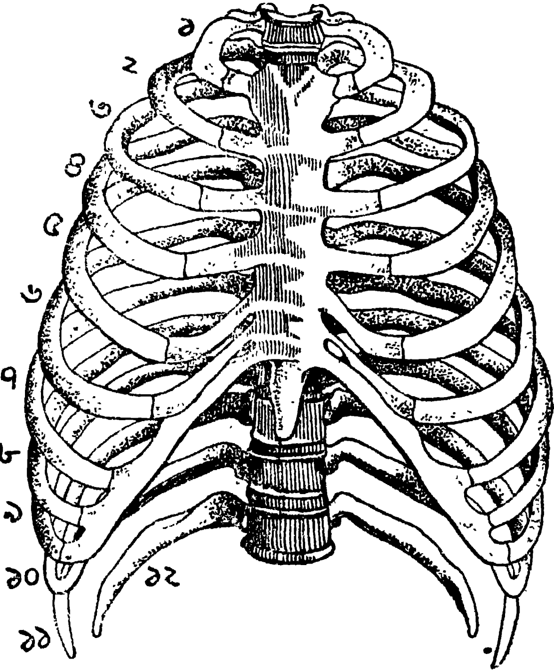


১৫৬নং চিত্র—মেরুদণ্ডের একখানি অস্থি

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক হাড়ের মধ্যে ছিদ্র আছে। মেরুদণ্ডের হাড়গুলি পরস্পর ও উপর্যুপরি এমনভাবে সাজান আছে যে, উহাদের ছিদ্রগুলি দ্বারা একটি অবিচ্ছিন্ন নলের সৃষ্টি হইয়াছে। মস্তকের পশ্চাদ্দিকে হাড়ের তলায়ও একটা ছিদ্র আছে। মেরুদণ্ডের নল সেই ছিদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। মস্তিষ্ক হইতে এক গোছা নার্ভ মেরুদণ্ডের ঐ নলের ভিতর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। ইহাকে **সুষুম্নাকাণ্ড** বা **মেরুরজ্জু** (spinal cord) বলে। **মেরুদণ্ডের** হাড়ের পাশে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া সুষুম্নাকাণ্ড হইতে শাখা-নার্ভগুলি বাহির হইয়া দেহের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে।

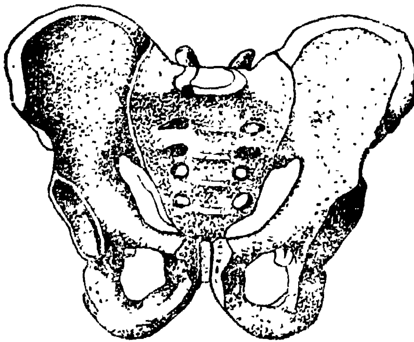
(গ) **বক্ষপঞ্জর** (Thorax): ইহার সম্মুখাংশে নিম্নগামী ছোরার ন্যায়

একখানি অস্থি আছে ; ইহাকে **উরঃফলক** (sternum or breast bone) বলে।

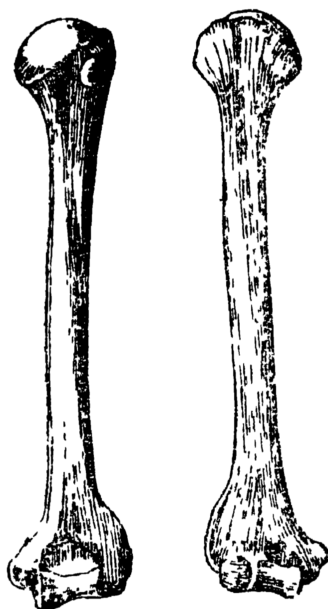


১৫৭নং চিত্র—বক্ষপঞ্জর

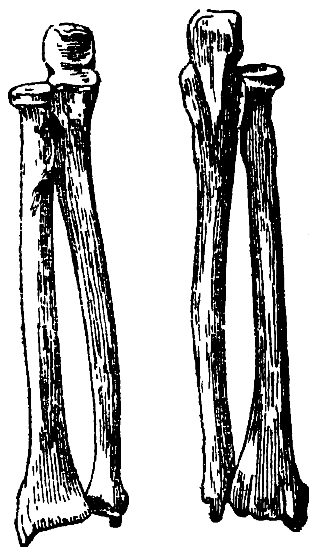
পশ্চাদ্দেশে মেরুদণ্ডের দ্বাদশটি কশেরুকা ও উভয় পার্শ্বে 12 জোড়া **পঞ্জরাস্থি** (costa or ribs) আছে। উপরের 7 জোড়া পঞ্জর **তরুণাস্থির** (cartilage) সাহায্যে সম্মুখের উরঃ-ফলকের সহিত সংযুক্ত। নিম্নের 2 জোড়া অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জর উরঃফলকের সহিত যুক্ত নয় বলিয়া মুক্ত-পঞ্জর (free or floating ribs) নামে অভিহিত।


১৫৮নং চিত্র—বস্তি-বেষ্টনী

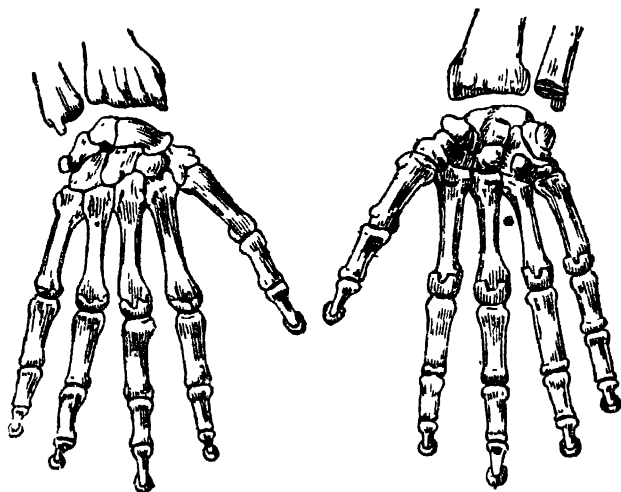
(খ) **বস্তি** (Pelvis) **:** মেরু-দণ্ডের উপরিভাগে যেমন স্কন্ধবেষ্টনী, উহার নিম্নভাগে অর্থাৎ বস্তিতে তেমনি আর একটি বেষ্টনী আছে। ইহাকে **বস্তি-বেষ্টনী** (pelvis girdle) বলে। বস্তিদেশটি সম্মুখে ও পার্শ্বে দুইখানি **অনামকাস্থি** (hip bones or os innominatum), ও পশ্চাতে **ত্রিকাস্থি** (sacrum) এবং **লাঙ্গুলাস্থি** (coccyx) দ্বারা গঠিত।



১৫৯নং চিত্র—প্রগণ্ডের অস্থি



১৬০নং চিত্র—প্রকোষ্ঠের অস্থি



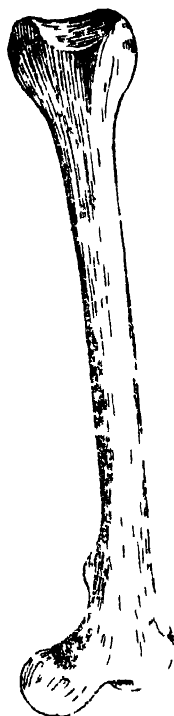
১৬১নং চিত্র—মণিবন্ধ ও করতলের অস্থি

৩। ঊর্দ্ধশাখা (Upper limbs)

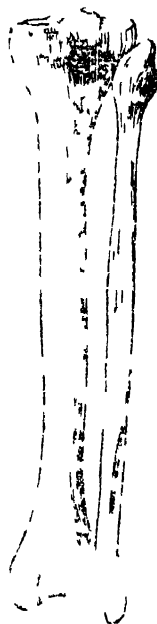
কঙ্কালের ঊর্দ্ধশাখা বলিলে দুইটি বাহুকে বুঝায়। প্রত্যেক বাহুর তিনটি অংশ—**প্রগণ্ড** (upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (forearm) ও **হস্ত** (hand)। প্রগণ্ডে 1 খানি গোল লম্বা অস্থি আছে, ইহাকে **প্রগণ্ডাস্থি** (humerus) বলে। উহার উপর প্রান্ত গোল এবং স্কন্ধাস্থির প্রান্তে একটা গর্ত্তের মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। সেইজন্য হাতখানাকে আমরা সকল দিকে ঘুরাইতে পারি। প্রকোষ্ঠে 2 খানা লম্বা অস্থি আছে; ইহাদের নাম **প্রকোষ্ঠাস্থি** (radius) ও **অনুপ্রকোষ্ঠাস্থি** (ulna)। প্রত্যেক হস্তে 27 খানি অস্থি আছে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত—কব্জির অস্থি বা **মণিবন্ধ** (carpals), করতলের অস্থি বা **করভাস্থি** (metacarpals) ও আঙ্গুলের অস্থি বা **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges)। মণিবন্ধে দুই সারিতে 4 খানা করিয়া মোট 8 খানা অস্থি আছে। করতলে সরু লম্বা 5 খানা অস্থি পাঁচটি অঙ্গুলির গোড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে 2 খানা ও অপর অঙ্গুলির প্রত্যেকটিতে 3 খানা করিয়া মোট 12 খানা সরু লম্বা অস্থি বা হাড় আছে।

৪। অধোশাখা (Lower limbs)

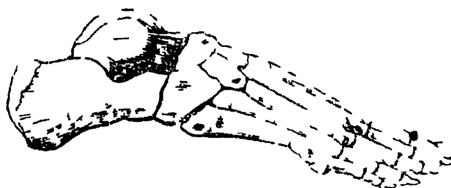
কঙ্কালের অধোশাখা বলিতে দুই পদকে বুঝায়। প্রত্যেক পদের তিনটি অংশ— **জানু** (thigh), **জঙ্ঘা** (shank) ও **চরণ** (foot)। পদের অস্থির সহিত বাহুর অস্থির সাদৃশ্য আছে। পদের প্রথম অস্থি অর্থাৎ উরুর বা **উর্ব্বস্থি** (fumer) প্রগণ্ডের অস্থির ন্যায় সংখ্যায় এক, গোল ও লম্বা। ইহার উপর প্রান্ত গোল ও বস্তির হাড়ের গর্ত্তের মধ্যে স্থাপিত; সেইজন্য আমরা ইহাকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। জঙ্ঘায় 2 খানা অস্থি—**জঙ্ঘাস্থি** (tibia) ও **অনুজঙ্ঘাস্থি** (febula)—প্রকোষ্ঠের অস্থির ন্যায় লম্বা। উরু-জঙ্ঘার সন্ধি এরূপভাবে গঠিত যে জঙ্ঘা কেবল পিছন দিকে মুড়িতে পারা যায়। সন্ধির সম্মুখে একখানা চ্যাপ্টা চাকৃতি আছে, ইহার নাম **প্যাটেলা** (patella)। প্রত্যেক চরণে 26 খানি অস্থি আছে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত—পায়ের গাঁটের অস্থি বা **চরণসন্ধাস্থি** (tarsal), পায়ের অস্থি বা **পদতলাস্থি** (metatarsal), ও আঙ্গুলের অস্থি বা **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges)। পায়ের গোড়ালিতে 7 খানি করিয়া ছোট অস্থি বা হাড়, পায়ের পাতায়

১৬২নং চিত্র—জানুর অস্থি

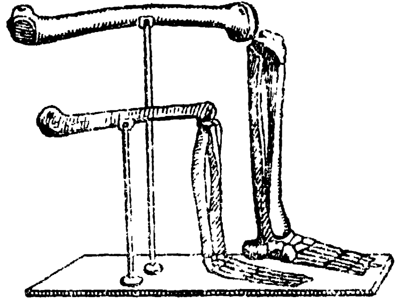



১৬৩নং চিত্র—জঙ্ঘার অস্থি




১৬৪নং চিত্র—পায়ের পাতা ও গোড়ালির অস্থি

5 খানি, বৃদ্ধাঙ্গুলে 2 খানি ও অপর আঙ্গুলে 3 খানি করিয়া মোট 12 খানি অস্থি বা হাড় রহিয়াছে। হাত অপেক্ষা পায়ের হাড়গুলি আকারে বড় এবং শক্ত। কারণ পা-ই সমস্ত দেহের ভার বহন করে।



১৬৫নং চিত্র—জানু ও জঙ্ঘার সন্ধি

এখন তোমরা জানিতে পারিলে 206 খানা অস্থি শরীরের বিভিন্ন অংশে নিম্নলিখিত ভাবে থাকে :

করোটি—22 খানা	পঞ্জর—24 খানা	মেরুদণ্ড—26 খানা
কর্ণ—6 খানা		উরঃফলক—1 খানা
কণ্ঠনালী—1 খানা		বস্তি—2 খানা
অক্ষকাস্থি—2 খানা		হস্ত—30 × 2 = 60 খানা
স্কন্ধাস্থি—2 খানা		পদ—30 × 2 = 60 খানা

আকার হিসাবে অস্থিগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায় :

(১) **দীর্ঘাস্থি** (long bone)—ইহারা সংখ্যায় 90 খানি এবং কাঠামোর কাজ করে। দীর্ঘাস্থিগুলি শূন্যগর্ভ ও ফাঁপা। ইহাদিগের মধ্যস্থিত শূন্যস্থান মজ্জা দ্বারা পূর্ণ থাকে। এই মজ্জা শোণিতকোষ (blood cells) ও মেদকোষ (fat cells) দ্বারা গঠিত। অস্থিমজ্জা হইতে শোণিতের লোহিত কণিকাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) **ক্ষুদ্রাস্থি** (short bone)—ইহারা সংখ্যায় 30 খানি এবং পরস্পরকে দৃঢ় রাখা ইহাদের কাজ। হস্তের ক্ষুদ্রাস্থি (carpus) ও পায়ের ক্ষুদ্রাস্থি (tarsus) এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) **ফলকাস্থি** (flat bone)—ইহারা সংখ্যায় 38 খানি ; মাথার খুলি, বক্ষ ও বস্তিদেশের খাঁচা বা গর্ত ইহাদের দ্বারা গঠিত।

(৪) **বিষমাস্থি** (irregular bone)—ইহারা সংখ্যায় 48 খানি ; হস্ত

পদাদির অস্থি প্রধানতঃ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কণ্ঠনালীর মধ্যস্থ 1 খানি হাড় (hyoid bone) এবং **কর্ণপটহের** মধ্যবর্ত্তী 6 খানি হাড় (auditory ossicles) বিষমাস্থির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

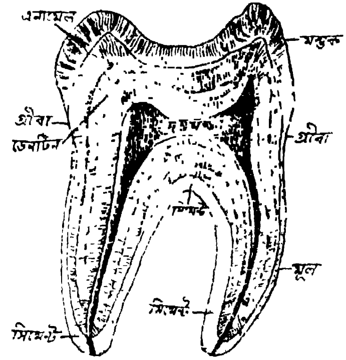
অস্থি-সন্ধি ও বন্ধনী (Joints & Ligaments) : এইমাত্র যে অস্থিসমূহের পরিচয় দেওয়া হইল, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে তাহাদের দ্বারা নরকঙ্কাল বা মানবদেহের কাঠামো গঠিত হইতে পারিত না। সুতরাং অস্থিগুলিকে যথাস্থানে সংযুক্ত করিবার জন্য অন্য প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয়। **অস্থি-সন্ধির** (joints) দ্বারা অস্থিগুলির মিলন সাধিত হয়। অস্থি-সন্ধি দুই প্রকার : (১) **অচলসন্ধি** (immovable joints) ও (২) **সচলসন্ধি** (movable joints)। অচলসন্ধি-গুলির মধ্যে কতকগুলি মোটেই নড়াচাড়া করিতে পারে না; যেমন, মাথার খুলির অস্থিসন্ধি ও বস্তির অস্থিসন্ধি : আর কতকগুলি সামান্য নড়িতে পারে ; যেমন, মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধি। সচলসন্ধির অস্থিগুলিকে (যেমন, হাতের কব্জি, কনুই, হাঁটু) আমরা ইচ্ছামত নানাদিকে ও নানাভাবে নাড়াচাড়া করিতে পারি। সচল-সন্ধিস্থলে দুইখানি অস্থি দুইদিক হইতে আসিয়া কব্জার মত মিলিত হয়। এই সংযোগস্থল এক প্রকার বন্ধনীর দ্বারা শক্তভাবে বাধা থাকে। উহাকে **অস্থিবন্ধনী** (ligament) বলে।

কিন্তু এই বন্ধনের জন্য তাহাদের সঞ্চালনের কোন অসুবিধা হয় না। যেখানে দুইখানা হাড় সংযুক্ত, তাহাদের উভয়ের মধ্যে একখানা করিয়া অপেক্ষাকৃত নরম **তরুণাস্থি** (cartilage) থাকে। উহা গদির কাজ করে। তরুণাস্থির নীচে একটি পর্দা (synovial membrane) আছে। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল জাতীয় পদার্থ বাহির হয়। এই তৈল জাতীয় পদার্থের জন্য অস্থি দুইখানি সহজে সঞ্চালিত হইতে পারে এবং ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ঐ তৈল জাতীয় পদার্থই মানবদেহের কঙ্কালের মবিল (mobil oil)।

দন্ত (Tooth) : দন্ত অস্থির ন্যায় কঠিন কিন্তু ইহা অস্থি নহে। প্রত্যেক দন্তের তিনটি অংশ—**মস্তক** (crown), **গ্রীবা** (neck) ও **মূল** (root)। দন্তের যে অংশ মাড়ির বহিরে থাকে তাহাকে ইহার **মস্তক** (crown) বলে। ইহার উপরি-ভাগে এক প্রকার সাদা ও চিকন পদার্থের আবরণ রহিয়াছে তাহাকে **এনামেল** (enamel) বলে। দন্তের যে অংশ মাড়ির ভিতরে থাকে তাহাকে **মূল**

(root) বলে। উহার উপরিভাগ অস্থিতন্তু দিয়া গঠিত; ইহাকে **সিমেন্ট** (cement) বলে। সিমেন্ট ও এনামেল যেস্থানে মিলিত হয় তাহাকে **গ্রীবা** (neck) বলে।

দাঁতের গঠন (Structure of tooth): একটি দন্ত সমান্তরালভাবে ছেদন (longitudinal section) করিলে ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল দৃষ্ট হয়। ইহারা তিন প্রকারের বিভিন্ন দ্রব্যে গঠিত হইয়াছে। (১) শক্ত **এনামেল বা মিনা** (enamel)।—যেমন কঠিন তেমনি চক্‌চকে। (২) **দন্তমজ্জা** (pulp)—মাঝখানটা ফাঁপা, তথায় পুষ্টিরস-বাহক শিরা ও ধমনী এবং অনুভূতীবাহী নার্ভ থাকে; এই সবগুলি লইয়াই দন্তমজ্জা সৃষ্ট। (৩) এনামেল ও দন্তমজ্জা বাদে দাঁতের বাকী অংশটা কঠিন পদার্থ বা **ডেনটিন** (dentine) দ্বারা তৈয়ারী।



১৬৮নং চিত্র—দন্তের গঠন

মাংসপেশী (Muscles): শরীর হইতে চর্ম্ম বিযুক্ত করিলে, চর্ব্বির নীচে লাল রঙের ও চ্যাপ্টা ধরনের যে লম্বা আঁশযুক্ত মাংসরাশি বাহির হয়, তাহারই নাম **মাংসপেশী** (muscles)। আমাদের দেহে ছোট, বড়, চ্যাপ্টা, গোল প্রভৃতি নানা আকারের কয়েক শত মাংসপেশী রহিয়াছে। দেহের ওজনের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ মাংসপেশীর ওজন। মাংসকোষগুলি মাংসযোজক পদার্থের দ্বারা একসঙ্গে গ্রথিত হইয়া মাংসতন্তুতে পরিণত হয়। অনেকগুলি মাংসতন্তু গুচ্ছাকারে একখানা **শক্ত পাতলা** (sarcolema) পর্দ্দা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এক একটি মাংসপেশীতে পরিণত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর মধ্যভাগ কিছু মোটা। উহার উভয় প্রান্ত ক্রমশঃ পাতলা ও শক্ত হইয়া ফিতা বা রজ্জুতে পরিণত হয়। মাংসপেশীর এই অংশের নাম **টেণ্ডন** (tendon)। টেণ্ডনের দ্বারা মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকে। এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে মাংসপেশী আঁশের সমষ্টি। পাঁঠার পায়ের একখণ্ড মাংস সিদ্ধ করিবার পর টিপিয়া দেখ, দেখিবে যে উহাতে অনেকগুলি আঁশ রহিয়াছে। মাংসপেশীর পুষ্টিসাধনের জন্য

উহার মধ্যে বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম রক্তবাহী ও রসবাহী জালক (capillary) রহিয়াছে।

কার্য্যকারিতা হিসাবে পেশীসমূহ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে: (ক) **ঐচ্ছিক** বা ইচ্ছাধীন (voluntary) ও (খ) **অনৈচ্ছিক** বা স্বাধীন (involuntary)। যে সকল মাংসপেশী হাড়ের সঙ্গে বাঁধা এবং আমাদের ইচ্ছানুসারে যাহাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয়, তাহারা **ঐচ্ছিক** বা ইচ্ছাধীন মাংসপেশী। আমাদের হস্তপদের পেশীগুলি এই শ্রেণীর। যে সমস্ত পেশী আমাদের দেহের যন্ত্রসমূহে থাকিয়া আমাদেরই অজ্ঞাতে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাদের **অনৈচ্ছিক** বা স্বাধীন মাংসপেশী বলে। আমশয়, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে যে সকল পেশী আছে তাহারা এই শ্রেণীর।

সকল পেশীর আকৃতি এক নহে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে **ঐচ্ছিক** পেশীগুলি প্রস্থভাবে ডোরাকাটা বা **চিহ্নিত** (striated) এবং **অনৈচ্ছিক** পেশীগুলি ডোরাকাটা নহে বা **অচিহ্নিত** (non-striated)।

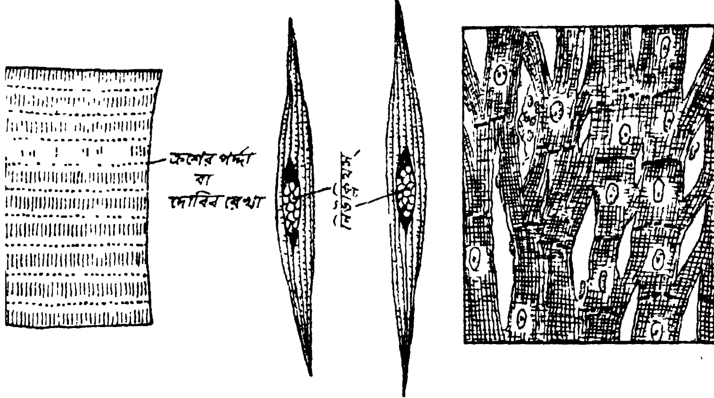
(১) **চিহ্নিত পেশী** (Striated muscle fibre): এই প্রকার পেশীতে অনেক সূতার মত পেশীকোষ আছে। উহাদের অনুপ্রস্থে সাদা ও কালো দাগ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সাদা অংশমধ্যে বিন্দুময় একটি রেখা দেখা যায়, ইহাকে **দোবির রেখা** (Dobie's line) বা **ক্রশের পর্দ্দা** (Krause's membrane) বলে। চিহ্নিত পেশীগুলিতে আবরণযুক্ত নার্ভের (medullated nerve) সংযোগ থাকে।

(২) **অচিহ্নিত পেশী** (Non-striated muscle fibre): এই প্রকার পেশীতে পটোলের ন্যায় পেশীকোষ আছে। যদিও চিহ্নিত পেশীর মত নিয়মিত (systematic) দাগ বা চিহ্ন নাই, তথাপি কোষমধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ দেখা যায়। অচিহ্নিত পেশীগুলিতে আবরণহীন নার্ভের (unmedullated nerve) সংযোগ থাকে

আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের পেশীগুলিও অনৈচ্ছিক কিন্তু ইহাদের কার্য্যপ্রণালী কিছু বিভিন্ন; সেইজন্য ইহাদিগকে আর এক শ্রেণীতে ফেলা হয়।

(৩) **হৃৎপিণ্ডের পেশী** (Cardiac muscle): যদিও হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলি **অনৈচ্ছিক** তথাপি ইহারা চিহ্নিত। ইহার কোন আবরণ (sarcolema) নাই। ইহার

কোষগুলি চতুষ্কোণ এবং মাঝখানে একটি নিউক্লিয়স্ থাকে ; অধিকাংশ কোষের শাখা আছে। যদিও ইহারা চিহ্নিত তথাপি ইহাদের দাগগুলি স্পষ্ট ও নিয়মিত নহে।

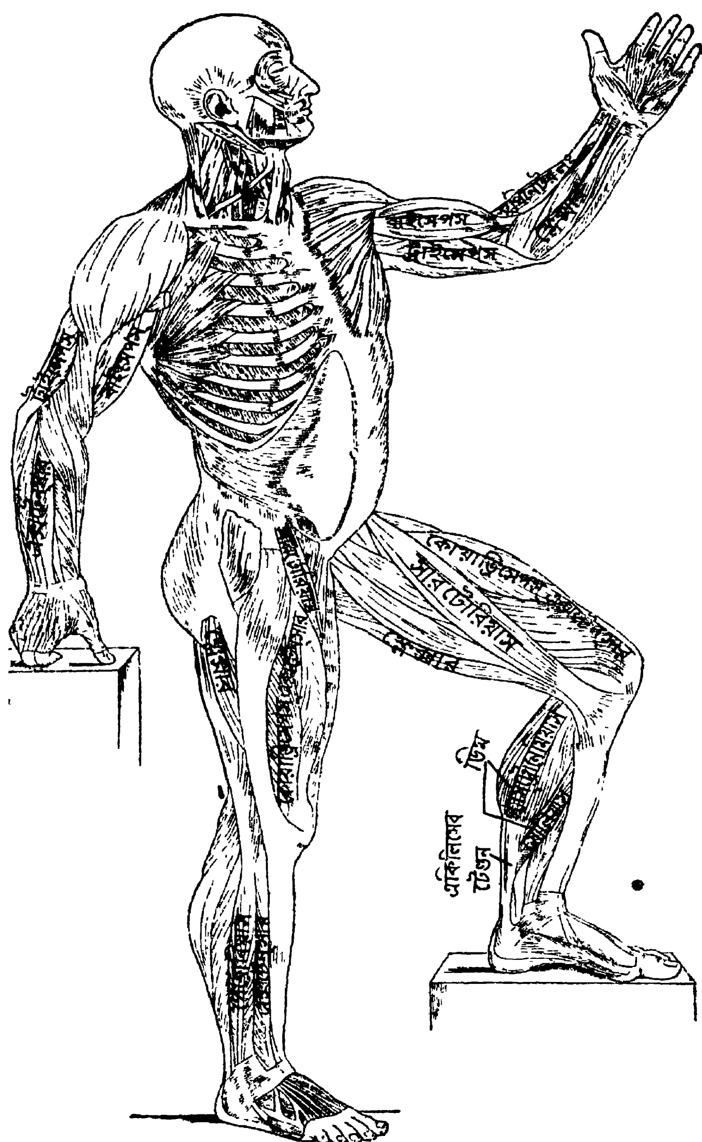


চিহ্নিত পেশী   অচিহ্নিত পেশী   হৃৎপিণ্ডের পেশী

১৬৭নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার পেশী

মাংসপেশীর ধর্ম্ম (Properties of muscles) **:** মাংসপেশীর প্রধানতঃ পাঁচটি ধর্ম্ম আছে : (ক) প্রসারণ (extension) অর্থাৎ প্রয়োজনমত পেশীগুলিকে প্রসারিত করা যায়। (খ) সঙ্কোচন (contraction) অর্থাৎ উত্তেজিত হইলে সঙ্কুচিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। (গ) স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অর্থাৎ ইহাকে টানিয়া লম্বা করা যায় এবং তাহার পর ছাড়িয়া দিলে উহা পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে। (ঘ) সমভাব (tone) অর্থাৎ খুব টান ভাবও নয়, আবার একেবারে শিথিল ভাবও নয় এমন অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা। (ঙ) আড়ষ্টভাব (rigor mortis) অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আড়ষ্ট বা কঠিন হইয়া যায়। সেইজন্য শবদেহের অঙ্গগুলি নাড়া যায় না। এই কারণেই মরা মাছ বাঁকিয়া যায়।

মাংসপেশীর কার্য্য (Functions of muscles) **:** জীবের একস্থান হইতে অন্যস্থানে ইচ্ছাক্রমে গমনাগমন কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির



১৬৮নং চিত্র—হস্ত ও পদের পেশী

কার্য্যকলাপ প্রভৃতি ক্রিয়া পেশীসমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেহখানা যাহাতে সহজে নড়াচড়া করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে 206 খানি অস্থি সংযোগে আমাদের কঙ্কাল গঠিত। হাড়ের সংযোগগুলি এরূপভাবে গঠিত যেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে আমরা সহজে প্রযোজন অনুসারে চালনা করিতে পারি। কিন্তু হাড়গুলি তো আর নিজে নড়িতে পারে না। উহাদের সঙ্গে সংবদ্ধ মাংস পেশীগুলি যখন সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় তখন উহাদের সঞ্চালন হইয়া থাকে।

বাহু ও পদের পেশী (Muscles of arm and leg): বাহু ও পদের সম্মুখভাগে ও পশ্চাদভাগের উপরিস্তরে একাধিক মাংসপেশী রহিয়াছে ও ইহার অভ্যন্তরে বহু গভীর মাংসপেশী (deep muscles) রহিয়াছে। আমরা উপরিস্তরের মাংসপেশী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কনুই ভাজ করিলে উপরের বাহুতে যে মাংসের গুলি ফুলিয়া উঠে তাহাকে **বাইসেপস্** (Biceps) বলে ও পশ্চাদভাগের পেশীকে **ট্রাইসেপস্** (Triceps) বলে (১৬৮নং চিত্র দেখ)। নিম্নের বাহু বা প্রকোষ্ঠের সম্মুখভাগে **সুপিনেটর লং** (Supinator Long) ও **ফ্লেক্সার** (Flexors) ও পশ্চাদভাগে **এক্সটেন্‌সার** (Extensor) মাংসপেশী উল্লেখযোগ্য। জানুর (thigh) সম্মুখভাগের উপরিস্তরের পেশীগুলির মধ্যে **কোয়াড্রিসেপস্ এক্সটেন্‌সার** (Quadriceps Extensor) ও জঙ্ঘার (shank) সম্মুখভাগের উপরিস্তরের পেশীগুলির মধ্যে **পেরোনিয়াস এক্সটেন্‌সার** (Peroneus Extensor) উল্লেখযোগ্য। জঙ্ঘার পশ্চাদভাগের উপরিস্তরে **গ্যাস্‌ট্রোনেমিয়াস** (Gastrognemius) ও **সোলিয়াস** (Soleus) মাংসপেশী রহিয়াছে। এই পেশীদ্বয়কে **ডিম** (Calf) বলে। এই ডিমের টেণ্ডনকে একিলিসের টেণ্ডন (Tendon Achilles) বলে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (Sense Organs)

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পথ দিয়া বহির্জ্জগতের বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দবিষয়ক সাড়া নার্ভের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় এবং সেখানে সেই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এখন আমরা এই ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

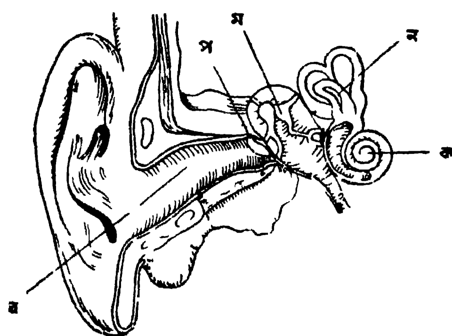
১। চক্ষু (Eye)
[Organ of Sight]

তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত আলোকীয় যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে চক্ষু আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল। ঐ স্থলে (পৃষ্ঠা ১১১-১১২) চক্ষু সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পর্য্যাপ্ত। ছাত্রগণ ঐ আলোচনা দেখিয়া লইবে।

২। কর্ণ (*Ear*)
(Organ of Hearing)

কর্ণ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি কর্ণ আছে। এই যন্ত্রটির বর্ণনার সুবিধার জন্য ইহাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়: **বহিঃকর্ণ** (external ear), **মধ্যকর্ণ** (middle ear) ও **আভ্যন্তরীণ কর্ণ** (internal ear)।

(ক) **বহিঃকর্ণ**—কর্ণের যে অংশ হস্ত দ্বারা ধরিতে পারা যায়, তাহাকে বহিঃকর্ণ বলে। ইহা কোমল তরুনাস্থি দ্বারা গঠিত। শব্দের স্বরূপ বাতাসের তরঙ্গ মাত্র। বাতাসের শব্দগুলিকে ধরিয়া কর্ণবিবরে প্রেরণ করিবার জন্য কর্ণের বহিরাংশ নানাভাবে বক্র ও কুঞ্চিত রহিয়াছে। বহিঃকর্ণের মাঝখানে একটি গর্ত্ত বা কর্ণরন্ধ্র আছে। এই গর্ত্তের শেষ প্রান্তে একটি পর্দ্দা আছে, ইহাকে **কর্ণপটহ** (tympanic membrane) বলে। বহিঃকর্ণ বহির্জ্জগৎ হইতে শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করিয়া কর্ণরন্ধ্রের মধ্যে দিয়া কর্ণপটহ-পর্দ্দায় আঘাত করিতে থাকে। এই বহিঃকর্ণ অংশটায় কতকগুলি লোম ও একপ্রকার আঁটালো পদার্থ আছে, উহা ধূলা ও পোকা মাকড় প্রভৃতিকে কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে দেয় না।



১ নং চিত্র - কর্ণ
ব, বহিঃকর্ণ ম, মধ্যকর্ণ ; প, কর্ণপটহ
ন, অর্দ্ধবৃত্তাকার নল ; ক, কর্ণকম্বু

(খ) **মধ্যকর্ণ**—কর্ণপটহ হইতে মধ্যকর্ণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটি গহ্বর (tympanic cavity)। ইহা সচরাচর বায়ুপূর্ণ থাকে এবং এই বায়ু একটি নলের মধ্যে দিয়া গলবিল (pharynx) হইতে আসে। মধ্যকর্ণ বা টিম্প্যানিক গহ্বরের মধ্যে

পরস্পর-সংলগ্ন তিনখানি অস্থি আছে—malleus, incus and stapes। ইহাদের মধ্যে প্রথম অস্থিখানি (malleus) কর্ণপটহের সহিত ও শেষ অস্থিখানি (stapes) আভ্যন্তরীণ কর্ণের একস্থানের পর্দার সহিত সংযুক্ত থাকে। এই অস্থিত্রয় কর্ণপটহ হইতে শব্দতরঙ্গ আনিয়া আভ্যন্তরীণ কর্ণের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দেয়। এই দ্বারদেশের ছিদ্র কিঞ্চিৎ গোল বলিয়া ইহাকে গোল ছিদ্র (fenestra ovlis) কহে।

(গ) **আভ্যন্তরীণ কর্ণ :** আভ্যন্তরীণ কর্ণের মধ্যেই প্রকৃত শ্রবণ-যন্ত্র অবস্থিত ; আর ইহার মধ্যেই **শ্রবণস্নায়ু** (auditory nerve) আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কর্ণ একটি গহ্বরবিশেষ এবং ইহার গঠনপ্রণালী চক্রাকার ও জটিল। সেইজন্য ইহাকে **চক্রাকার প্রণালী** (labyrinth) নামে অভিহিত করা হয়। এই চক্রাকার যন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত—অস্থিময় ও ঝিল্লীময় প্রণালী। অস্থিময় প্রণালীর মধ্যে ঝিল্লীময় প্রণালী সন্নিবিষ্ট। এই দুইটি চক্রাকার প্রণালীর মধ্যে দুইটি রস আছে। ঝিল্লীময় চক্রাকার প্রণালীর রসকে **অন্তঃরস** (endolymph) ও অস্থিময় চক্রাকার প্রণালীর রসকে **বহিঃরস** (perilymph) কহে। অস্থিময় চক্রাকার প্রণালী তিনটি অংশে বিভক্ত—**ভেষ্টিবুল** (vestibule), **কর্ণকম্বু** (cochlea) ও **অর্দ্ধবৃত্তাকার নলসমূহ** (semicircular canals)। মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের সাহায্যে আনীত শব্দতরঙ্গ আভ্যন্তরীণ কর্ণের চক্রাকার প্রণালীতে ধাক্কা দিয়া তথাকার তরল পদার্থে তরঙ্গ উৎপন্ন করে। ঐ তরল পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের দ্বারা বিভিন্ন আকারের তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে চক্রাকার প্রণালীস্থিত (labyrinth) শ্রবণস্নায়ুর চাবিতে ধাক্কা দেয় ; সেই ধাক্কাগুলি শ্রবণস্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে শব্দরূপে গৃহীত হয়।

কর্ণের বহিরাংশ বাতাসের শব্দতরঙ্গকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কর্ণবিবরে চালিত করে। এই শব্দতরঙ্গ কর্ণপটহকে আঘাত করিয়া তাহাকে কম্পিত করে ; সেই কম্পন মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্র অস্থিত্রয়দ্বারা নীত হইয়া আভ্যন্তরীণ কর্ণের ভিতর অস্থিময় ও ঝিল্লীময় প্রণালী অতিক্রম করিয়া শ্রবণস্নায়ুতে আঘাত করে। সেই শ্রবণস্নায়ু নানাপ্রকার শব্দতরঙ্গকে মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে শব্দের অনুভূতি হয়। শব্দতরঙ্গের পথিমধ্যস্থ কোন অংশ বিকৃত হইলে শব্দজ্ঞান লুপ্ত হইতে পারে।

৩। নাসিকা (*Nose*)

[Organ of Smell]

নাসিকা একটি ত্রিকোণবিশিষ্ট গহ্বর। ইহার দুইটি ভাগ আছে—(১) **বহির্নাসিকা** (external nose): ইহা মুখমণ্ডলের মধ্যস্থল হইতে বিস্তৃত ও (২) **অন্তর্নাসিকা** (nasal cavity): ইহা একটি প্রাচীর (septum) দ্বারা দুইটি নাসিকা প্রকোষ্ঠে (nasal chambers) বিভক্ত। নাসিকার সম্মুখভাগে দুইটি ও পশ্চাদ্ভাগে (মুখবিবরে) দুইটি দ্বার আছে। পশ্চাদ্দিকে যেখানে গলবিলে (pharynx) শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানে নাসাপথ শেষ হইয়াছে। নাসিকার অগ্রভাগ কোমল তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। নাসিকার সম্মুখাংশের প্রাচীরগাত্র লোমাবৃত ও অভ্যন্তরভাগ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) দ্বারা আবৃত। নাসাপথের ঐ ঝিল্লীতে অসংখ্য রক্তবহা শিরা ও ধমনী থাকে; এই ঝিল্লীর কাজ আঁটালো শ্লেষ্মা তৈয়ারী করা। নাসিকার অভ্যন্তরভাগে **ঘ্রাণস্নায়ুর** অসংখ্য ক্ষুদ্র শাখা আসিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। যখন কোন গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে নিঃসৃত গন্ধকণা বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে ও ঐ সকল স্নায়ুতে আঘাত করে, তখন মস্তিষ্কে তাহার গন্ধের অনুভূতি জন্মে। সুতরাং নাসিকা আমাদের ঘ্রানেন্দ্রিয়। ইহা শুধু ঘ্রানেন্দ্রিয় নহে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের পথ।

৪। ত্বক্ (*Skin*)

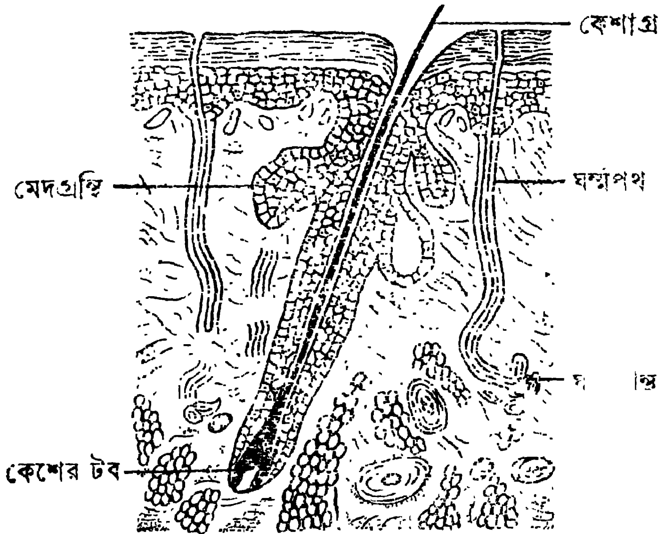
[Organ of Touch]

ত্বক্ বা চর্ম্ম আমাদের সমস্ত দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে। ইহা আমাদের দেহের বহিরাবরণ। সাধারণতঃ ইহার তিনটি স্তর আছে।

(ক) **উপচর্ম্ম** (Epidermis)—ইহা ত্বকের বাহিরের স্তর ও ঘন আচ্ছাদক তন্তু দিয়া গঠিত। ইহাতে অসংখ্য ঘর্ম্মকূপ ও লোমকূপ আছে, কিন্তু কোন শিরা বা ধমনী নাই। ঘর্ষণের ফলে এই স্তর নিত্যই উঠিতেছে এবং দ্রুত নূতন হইতেছে। এই স্তরেই কড়া (corn) ও ফোস্কা (blister) পড়ে ও ঘামাচি হয়। রক্তবহা-নালী নাই বলিয়া ফোস্কা বা কড়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও রক্ত বাহির হয় না। এই স্তরে নার্ভও নাই, সেইজন্য ছুঁচ ফুটাইলেও লাগে না।

(খ) **বর্ণকোষ ত্বক্** (Papillary or Colour layer)—ইহাই আসল চর্ম্মের উপরের স্তর। এই স্তরে রঞ্জনকোষ (pigment cell) অবস্থিত এবং এই রঞ্জনকোষগুলির মধ্যে এক প্রকার রঙ থাকে। দেহের বর্ণ এই রঙের উপর নির্ভর করে।

(গ) **চর্ম্ম** (Dermis)—ইহা ত্বকের ভিতরকার স্তর এবং স্থিতিস্থাপক আচ্ছাদক তন্তু দিয়া গঠিত। এই স্তরে বহুসংখ্যক নার্ভ, শিরা ও ধমনী, মেদগ্রন্থি (sebaceous glands), ঘর্ম্মগ্রন্থি (sweat glands), কেশের মূল প্রভৃতি আছে।



১৭০নং চিত্র—ত্বক্

ত্বকের নার্ভ দিয়া যে সাড়া মস্তিষ্কে পৌছায়, তাহা হইতে আমাদের স্পর্শজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য ত্বকের অপর নাম স্পর্শেন্দ্রিয়। শিরা ও ধমনীর দ্বারা ত্বকের মধ্যে রক্তসঞ্চালন ও তাহার পুষ্টিসাধন হয়।

ঘর্ম্মগ্রন্থি (Sweat glands)—এই জাতীয় অসংখ্য গ্রন্থি ত্বকের সকল স্থানে বিশেষতঃ হাত ও পায়ের তলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নলসমূহ

১৭ (৩০ ১২—১)

ঘর্ম্মগ্রন্থি হইতে আরম্ভ করিয়া ত্বকের উপচর্ম্মের ঘর্ম্মকূপ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। দেহাভ্যন্তরে কতকগুলি দূষিত পদার্থ (inorganic salts, carbon dioxide, urea etc) ও দেহের অনাবশ্যক জলের কিয়দংশ এই সকল নলের সাহায্যে ঘর্ম্মরূপে দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। এই সকল ঘর্ম্মকূপ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন কারণ এইগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, দেহের দূষিত পদার্থ বাহির হইবার পথ পাইবে না। ফলে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে।

কেশ (Hair)—আসল চর্ম্মের (dermis) ভিতরে ঘামাচির মত ছোট টবে এক একটি কেশ প্রবিষ্ট থাকে, ইহাকে **কেশের টব** (hair follicle) বলে। এই টবের মধ্যে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি থাকিয়া কেশের পুষ্টিসাধন করে। মেদগ্রন্থি (sebaceous glands) কেশের টবের নিকট অবস্থিত এবং এই সকল গ্রন্থি হইতে তৈলজাতীয় পদার্থ (sebum) লোমকূপ ভেদ করিয়া উপচর্ম্মে পৌঁছায়। তজ্জন্যই চর্ম্ম ও কেশ মসৃণ থাকে। প্রত্যেক কেশের গোড়ায় একটি মাংসপিণ্ড থাকে। ভয়ে, সুখে বা হর্ষে যে রোমাঞ্চ হয়, তাহা ঐ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কেশগুলি খাড়া করারই ফল।

নখ (Nail)—অঙ্গুলির অগ্রভাগে শক্ত পদার্থটিকে **নখ** বলে। উপচর্ম্ম (epidermis) মোটা কঠিন হইয়া নখ সৃষ্টি করে। নখের অগ্রে কোন নার্ভ নাই। সেইজন্য কাটিবার সময় কোন বেদনা অনুভব করা যায় না। ইহা শক্ত হইলেও অস্থি নহে।

ত্বকের কার্য্য (Functions of skin) :—ত্বক্ বহুকার্য্য সাধন করে : (১) শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোমল অংশকে অনাহত অবস্থায় রাখে এবং জীবাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। (২) অসংখ্য শিরা ও ধমনীর সাহায্যে ত্বক্ শরীরের তাপের সমতা রক্ষার সহায়তা করে। (৩) ঘর্ম্মের উৎপাদন ও নিষ্কাশন করিয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ দূষিত মল নিঃসরণ করে। (৪) ত্বক্ দিয়া তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া চর্ম্মকে মসৃণ রাখে। (৫) উহা আংশিকভাবে বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে ও তৈল, ঔষধাদি পদার্থ শোষণ করিয়া আংশিকভাবে খাদ্যগ্রহণের কার্য্য করে। (৬) ত্বকে অন্তর্মূল নার্ভসমূহ অবস্থিত বলিয়া উহার অনুভূতি মস্তকে গমন করিয়া স্পর্শবোধ জন্মায়।

৫। জিহ্বা (*Tongue*)

[Organ of Taste]

জিহ্বা গলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহা পেশীময় ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি বা **স্বাদকোরক** (taste bud) আছে। মস্তিষ্ক হইতে কতকগুলি নার্ভ আসিয়া ঐ সকল গুটিকার মধ্যে শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন গুটিকার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন রসের স্বাদ পাইয়া থাকি। জিহ্বার কিনারার গুটিকার দ্বারা আমাদের লবণ ও মিষ্ট স্বাদের অনুভূতি এবং পশ্চাতের গুটিকার দ্বারা তিক্ত স্বাদের অনুভূতি হয়। যদিও ইহা স্বাদেন্দ্রিয়ের প্রধান স্থান তথাপি পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, মুখ-বিবরের অন্যান্য স্থানেও অর্থাৎ তালু (soft palate), আল্‌জিভ (uvula), তালুগ্রন্থি (tonsil) ইত্যাদিও স্বাদগ্রহণক্ষম। ইহার কারণ স্বাদেন্দ্রিয় স্নায়ুর শাখাপ্রশাখাগুলি এই সকল স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। দ্রব না হইলে কোন দ্রব্যের আস্বাদ পাওয়া যায় না। যে দ্রব্য গলে না তাহা স্বাদহীন। জিহ্বার দ্বারা চর্ব্বনক্রিয়ার ও কতকগুলি শব্দ উচ্চারণের সাহায্য হয়।



১৭:নং চিত্র—জিহ্বা

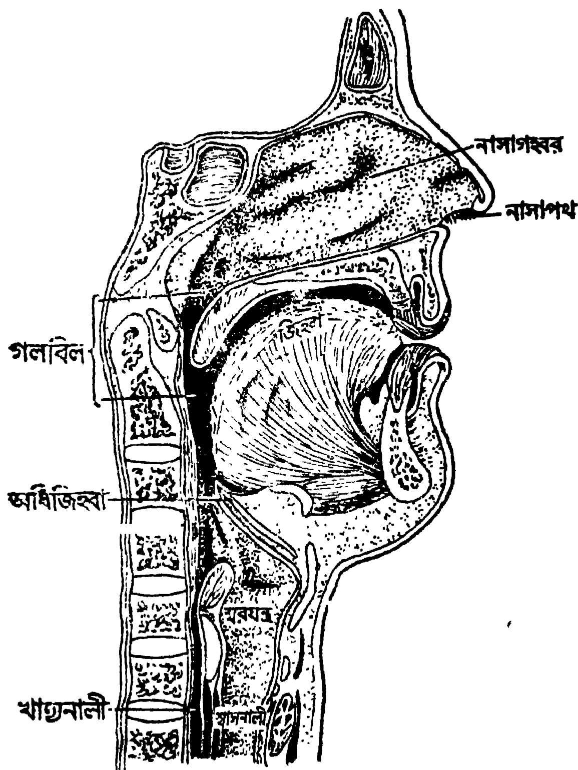
শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System)

শ্বাসকার্য্য (Respiration) **:** জীবনধারণের জন্য প্রাণীমাত্রেরই খাদ্য, জল ও বায়ুর প্রয়োজন। খাদ্য ও জল না হইলেও কিছুদিন প্রাণধারণ করিতে পারা যায়, কিন্তু বাতাস না হইলে কয়েক মিনিটের বেশী জীবিত থাকিতে পারা যায় না। সেইজন্য শ্বাসকার্য্য জীবদেহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া। পর্য্যায়ক্রমে বক্ষ-প্রাচীরের বিস্ফোরণ ও সঙ্কোচনই শ্বাসকার্য্য। এই কার্য্যের দ্বারা বায়ু ফুস্‌ফুসের মধ্যে গমন করে এবং পুনরায় ফুস্‌ফুস হইতে বাহির হইয়া আসে। বক্ষপ্রাচীর বিস্ফারিত করিয়া বাহ্যজগৎ হইতে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু লওয়াকে **শ্বাসগ্রহণ** (inspiration) এবং বক্ষপ্রাচীর সঙ্কুচিত করিয়া ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহ্যজগতে বায়ু

ত্যাগ করাকে **শ্বাসত্যাগ** (expiration) কহে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ সমষ্টির নাম **শ্বাসকার্য্য** (respiration)।

প্রধানতঃ পাঁচটি যন্ত্র সাহায্যে শ্বাসকার্য্য সম্পাদিত হয়ঃ (১) **নাসাপথ** (nares), (২) **গলবিল** (pharynx), (৩) **স্বরযন্ত্র** (larynx), (৪) **শ্বাসনালী** (trachea or wind pipe) ও (৫) **ফুস্‌ফুস্‌** (lungs)।

(ক) **নাসাপথ** (Nares): আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিয়া



১৭২নং চিত্র—শ্বাসযন্ত্রের কতকগুলি অংশ

থাকি। নাক বন্ধ থাকিলে মুখ দিয়াও শ্বাস লইতে হয়। কিন্তু মুখ দিয়া প্রশ্বাস লওয়া অস্বাস্থ্যকর; কারণ নাকের মধ্যে বাতাস ছাঁকিয়া (filter) লওয়ার ব্যবস্থা

আছে, মুখ্যের মধ্যে নাই। ইহা ছাড়া বাহির হইতে আমরা যে বাতাস টানিয়া লই তাহাকে গরম করাও নাসাপথের আর একটি কাজ।

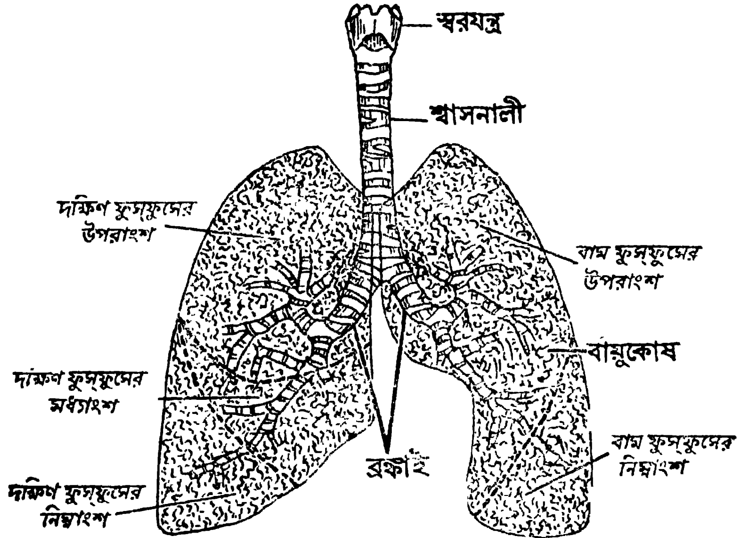
(খ) **গলবিল** (Pharynx) : ইহা মাংসপেশী নির্ম্মিত একটি নল। ইহা শ্বাসনলের ও খাদ্যনলের সংযোগস্থল। ইহার মধ্য দিয়া বায়ু নাসিকা হইতে ফুস্‌ফুসে গমন করে। এই নলটির দুই পাশে যে ছোট গ্রন্থি দেখা যায়, তাহার নাম **তালুগ্রন্থি** (tonsil)। উপরাংশে ছোট জিহ্বার মত যে মাংসটি ঝুলিতেছে তাহাকে বলে **আল্‌জিভ** (uvula)।

(গ) **স্বরযন্ত্র** (Larynx) : ইহা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। ইহার আকৃতি অনেকটা ত্রিকোণাকার। গলবিলের পরেই শ্বাসনালীর (trachea) প্রথমাংশে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। এই যন্ত্রের ছিদ্রের উপর **অধিজিহ্বা** (epiglottis) নামক একপ্রকার ঢাক্‌না আছে। আমরা যে সময় খাদ্যগ্রহণ করি তখন এই ঢাক্‌নাই স্বরযন্ত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। স্বরযন্ত্রের দুইধারে দুইটি অতি পাতলা পর্দ্দার মত সামগ্রী আছে, তাহাদিগকে **ভোকাল কর্ড** (vocal cord) বলে। ইহাদের কম্পন হইতেই কণ্ঠস্বরের সৃষ্টি হয়। **প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া গলনালী হইয়া স্বরনালীতে পৌঁছিবার পর শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে।**

(ঘ) **শ্বাসনালী** (Trachea or Wind pipe) : স্বরযন্ত্রের তলদেশ হইতে ইহা ফুস্‌ফুস্ পর্য্যন্ত বিলম্বিত থাকে। ইহা তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত। তরুণাস্থিগুলি ইহার উপর চক্রাকারে সজ্জিত থাকে। শ্বাসনালীতে ১৬টী হইতে ২০টী উপাস্থির আংটি (cartilagenous ring) দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বাসনল কিছুদূর নামিয়া দুইটি শ্বাসনালীতে (bronchus) বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক **ব্রঙ্কাস্** আবার বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম নালিকায় ও তাহাদের শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কোষ ফাঁপা, বায়ুপূর্ণ এবং সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল। ইহাদের ফাঁকে ফাঁকে বহুসংখ্যক রক্তজালক (capillary) আছে।

(ঙ) **ফুস্‌ফুস্** (Lungs) : দুইটি ব্রঙ্কাস্ হইতে ফুস্‌ফুস্ দুইটি গঠিত হইয়া বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে মধ্যচ্ছদার উপর স্থাপিত আছে। দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ তিনখণ্ডে (lobe) এবং বাম ফুস্‌ফুস্ দুইখণ্ডে (lobe) বিভক্ত। **প্লুরা** (pleura) নামক পাতলা রক্তস্রাবী আবরণ (serous membrane) দ্বারা ইহারা আবৃত। বায়ুনালিকা,

বায়ুকোষ ও রক্তজালক দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ গঠিত; সেইজন্য ইহা ফোঁপরা। প্রশ্বাসবায়ু প্রথমে নাসাপথ দিয়া প্রবেশ করে এবং শ্বাসনল ও ব্রঙ্কাসের ভিতর দিয়া গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষে উপস্থিত হয়। রক্ত যখন ফুস্‌ফুসের



১৭৩নং চিত্র—ফুস্‌ফুসের ব্রঙ্কাই ও বায়ুকোষ

জালকের মধ্যে যায়, তখন ইহার হিমোগ্লোবিন বায়ুকোষের সূক্ষ্ম পর্দ্দার ভিতর দিয়া কোষমধ্যস্থ বায়ু হইতে অম্লজান (oxygen) শোষণ করিয়া লয় এবং অঙ্গারাম্ল (carbon dioxide) কোষের মধ্যে পরিত্যাগ করে। ইহার পর ফুস্‌ফুস্‌ সঙ্কুচিত হয়, তখন এই অঙ্গারাম্লযুক্ত দূষিত বায়ু নিশ্বাসরূপে নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

পাচনতন্ত্র বা পরিপাকতন্ত্র (Digestive System)

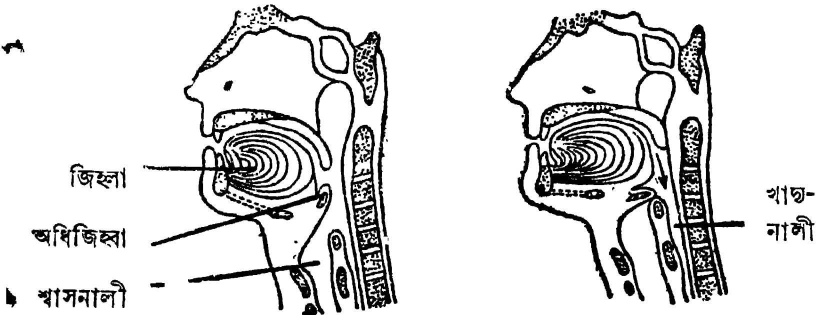
প্রাণধারণের জন্য আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির করা হইয়াছে যে আমাদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং উত্তাপ ও শক্তিসৃজনের জন্য ছয়টি মূল উপাদানের আবশ্যক—**প্রোটিন** (protein), **শ্বেতসার ও শর্করা** (carbohydrates), **চর্ব্বি** (fat), **লবণ** (salt), **জল** (water) এবং **ভিটামিন**

(vitamin)। আমাদের কোন একটি খাদ্যে ইহাদের সবগুলি থাকে না। সেইজন্য আমাদের প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ এবং আকরিক নানাপ্রকার জিনিস খাইতে হয়। আমরা যে খাদ্য খাই, সকল সময় তাহার সমস্তটাই আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। উহাতে অনাবশ্যক অংশও থাকে। তাহা ছাড়া উহার আবশ্যক অংশটিও উহার স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের কাজে লাগে না। সেইজন্য ভুক্তদ্রব্যগুলি আমাদের পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন স্থান দিয়া ধীরে ধীরে চালিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নিঃসৃত নানাপ্রকার পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহার ফলে উহাতে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত উহা তরল আকারে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া বিভিন্ন জীবকোষে নীত হইয়া থাকে। এই সকল প্রক্রিয়াকে **পাচন ক্রিয়া** (digestive sy·tem) বলে।

দেহকাণ্ডস্থ এক দীর্ঘ নালীর মধ্যে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইহার নাম **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal)। ইহা মুখবিবর হইতে পায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রধান চারিটি অংশ আছে—মুখগহ্বর (buccal cavity), খাদ্যনালী (oesophagus); আমাশয় (stomach), ও অন্ত্র (intestine)। খাদ্য এই চারিটি অংশের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইবার কালে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয় এবং ইহাকেই পাচন ক্রিয়া বলে।

১। **মুখের মধ্যে ক্রিয়া** (Action in the buccal cavity)

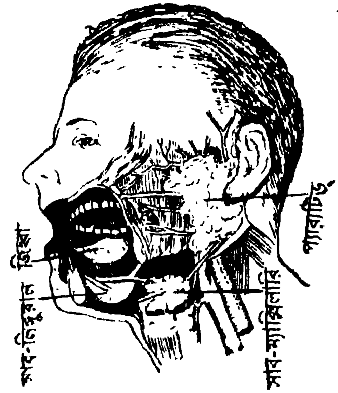
খাদ্য প্রথমে মুখের মধ্যে জিহ্বার সাহায্যে দন্তদ্বারা চর্ব্বিত, কর্ত্তিত ও পিষ্ট হইয়া



১৭৪নং চিত্র—শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী

সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। আমাদের মুখের মধ্যে তিন জোড়া **লালা নিঃসারক**

গ্রন্থি (salivary glands) আছে : (ক) কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্ত্তী **প্যারোটিড** (parotid) গ্রন্থিদ্বয়, (খ) নিম্নচোয়ালের গাত্রলগ্ন **সাব-ম্যাক্সিলারী** (sub-maxillary) গ্রন্থিদ্বয় ও (গ) জিহ্বার তলদেশস্থিত **সাব-লিঙ্গুয়াল** (sub-lingual) গ্রন্থিদ্বয়। এই সকল গ্রন্থি হইতে চর্ব্বণের সময় প্রচুর পরিমাণে **লালা** (saliva) বা রস নিঃসৃত হয়। লালা খাদ্যদ্রব্যকে নরম, সিক্ত ও পিচ্ছিল করে। ইহাতে আমরা সহজে খাদ্য গিলিতে পারি। তাহা ছাড়া সেই লালার মধ্যে **টায়ালিন** (ptyalin) নামক একপ্রকার **কিণ্বসত্ত্ব** (enzyme) আছে। এই কিণ্বসত্ত্ব খাদ্যের অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে (starch) দ্রবণীয় যবশর্করায় (maltose) ও ডেকস্ট্রিন-এ পরিণত করে। একখণ্ড রুটি বা এক মুঠা খই মুখের মধ্যে দিলে প্রথমেই উহা মিষ্ট লাগে না; কিছুক্ষণ পরে উহা শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার মিষ্টস্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে। খাদ্য চর্ব্বিত হইলে আমরা গলাধঃকরণ করি এবং সেই সময় কণ্ঠদেশের সঙ্কোচন হেতু অধিজিহ্বা বায়ুনালীর



১৭৫নং চিত্র—লালাগ্রন্থি

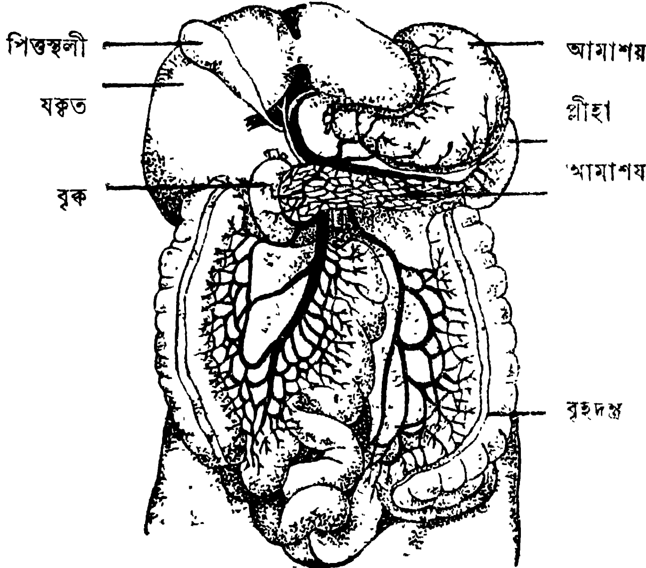
ঊর্দ্ধমুখে নীত হয়। সেই অল্প সময়ের জন্য ঢাকনিখানির দ্বারা বায়ুনালী ঊর্দ্ধমুখে আবৃত হয় এবং শ্বাসকার্য্য বন্ধ থাকে। সেই অল্পসময়ের মধ্যেই সুচর্ব্বিত লালামিশ্রিত খাদ্য **ঐ ঢাকনির উপর দিয়া আসিয়া খাদ্যনালীর** (œsophagus) **মধ্যে পতিত হয়।** খাদ্যনালীর ভিতর দিয়া খাদ্য **আমাশয়ে** উপস্থিত হয়।

২। **আমাশয়ের মধ্যে ক্রিয়া** (Action in the stomach)

আমাশয় একটি থলির আকারবিশিষ্ট। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ফুট ও প্রস্থে চার হইতে পাঁচ ইঞ্চি। ইহা আমাদের বক্ষস্থলের নীচে উদরের বামপার্শ্বে অবস্থিত। ইহা মাংসপেশীযুক্ত একখানা পর্দ্দা দ্বারা নির্ম্মিত। **আমাশয়ের তিন অংশ :** (ক) **আগম দ্বার** (cardiac end) বা যেখানে খাদ্যনালী আমাশয়ে প্রবেশ করে,

(খ) **আমাশয় স্কন্ধ** (fundus) বা মধ্যভাগ ও (গ) **নির্গম দ্বার** (pyloric end); ইহার প্রান্তদেশ হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র আরম্ভ।

আমাশয়ের ভিতরকার গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি



১৭৬নং চিত্র—পাচনক্রিয়ার যন্ত্রাদি

হইতে একপ্রকার পাচক রস নির্গত হয়। এই রসকে **আমাশয় রস** (gastric juice) বলে।

আমাশয় রসের উপাদানের মধ্যে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** (HCl) ও তিনটি কিণ্বসত্ত্ব (enzymes)—**পেপসিন** (pepsin), **রেনিন্‌** (renin) ও **লাইপেজ** (lipase) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কার্য্য দুই প্রকার: (১) physiological action—আমাশয়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে অম্ল না হওয়া পর্য্যন্ত আমাশয় ও অন্ত্রের সংযোগস্থলের কপাট (pyloric valve) খোলে না। ইহা আমাশয়ের আলোড়নকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করে এবং যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয়কে (pancreas) তাহাদের পাচক রস সৃষ্টি করিতে সাহায্য

করে। (২) bio-chemical action—জটিল শর্করাগুলিকে সরল করিতে সাহায্যে করে। আমাশয় রসের কিণ্বসত্ত্ব পেপ্‌সিন (pepsin) ইহার সাহায্য ব্যতীত প্রোটিনজাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না।

আমাশয় রসের উল্লেখযোগ্য তিনটি কিণ্বসত্ত্ব ভুক্তদ্রব্যের উপর নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য করে। (ক) **পেপ্‌সিন** হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহায়তায় ভুক্তদ্রব্যের প্রোটিন অংশের উপর কার্য্য করে এবং তাহাকে আংশিকভাবে জীর্ণ করিয়া পেপ্‌টোনে (peptone) পরিণত করে।

(খ) **রেনিন্‌** দুগ্ধ প্রোটিনের উপর (caseinogen বলিয়া পরিচিত) কার্য্য করে এবং ইহাকে অদ্রবণীয় কেসিনে (insoluble casein) পরিণত করে। কেসিন ক্যাল্‌সিয়াম যৌগের সহিত যুক্ত হইয়া ক্যাল্‌সিয়াম ক্যাসাইনেট (calcium caseinate) উৎপন্ন করে এবং পরিশেষে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পেপ্‌সিনের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে জীর্ণ হয় (absorbed)।

(গ) **লাইপেজ** ভুক্তদ্রব্যের চর্ব্বি (fat) অংশের উপর কার্য্য করে এবং ইহার অল্প অংশকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে (glycerol and fatty acid) পরিণত করে।

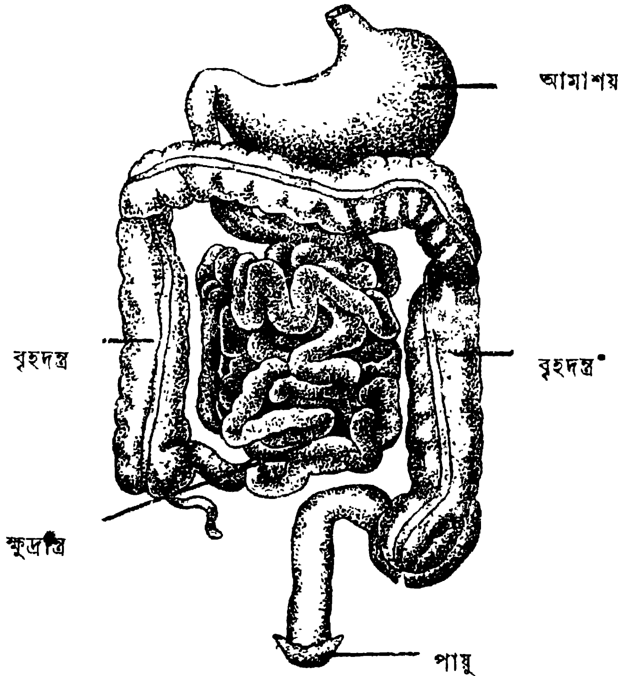
খাদ্যের সহিত যে সকল জীবাণু আমাশয়ে প্রবেশ করে তাহারা আমাশয়ের অম্ল রসে বিনষ্ট হয়। এইরূপে দেহ ব্যাধি হইতে রক্ষা পায়। আমাশয়ের মধ্যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভুক্তদ্রব্য থাকে ততক্ষণ উহা উক্ত রসের সহিত আমাশয়ের প্রাচীরের পেশীদ্বারা আন্দোলিত ও মথিত হইতে থাকে। ভুক্তদ্রব্য **মণ্ডের** (chyme) আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত এই আন্দোলন ও মন্থন ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাকে আমাশয়ের **মন্থন-ক্রিয়া** (churning movement of the stomach) বলে।

৩। অন্ত্রের মধ্যে ক্রিয়া (Action in the intestine)

ভুক্তদ্রব্য আমাশয়ে আংশিকভাবে জীর্ণ ও মণ্ডে পরিণত হইবার পর আমাশয় ও অন্ত্রের মধ্যস্থিত পেশীনির্ম্মিত কপাট খুলিয়া যায় এবং ঐ মণ্ড অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। অন্ত্রের দুইটি অংশ : (ক) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (small intestine) ও (খ) **বৃহদন্ত্র** (large intestine)। উভয় অন্ত্রই পরস্পর সংলগ্ন এবং ইহাদের মধ্যে একটি পেশীনির্ম্মিত ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের উপরিস্থিত কপাটের নাম **ইলিওসিকেল**

ভাল্‌ভ (illiocaceal valve)। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়াই জীর্ণ দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

(ক) ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) **:** ক্ষুদ্রান্ত্র একটি ফাঁপা নলবিশেষ। ইহা সরু বলিয়া ক্ষুদ্র কিন্তু দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ২০ ফুট। উদরের মধ্যে ইহা কুণ্ডলী আকারে অবস্থিত; চলতি কথায় ইহাকেই নাড়িভুড়ি বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের তিনটি অংশ**:** (অ) **ডিওডেনাম** (duodenum), এই অংশটি আমাশয়ের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং ইহার মধ্যস্থিত ছিদ্রের সহিত সংযুক্ত নলের সাহায্যে যকৃত ও অগ্ন্যাশয়



১৭৭নং চিত্র—আমাশয় ও অন্ত্র

হইতে পাচকরস অন্ত্রে পৌঁছায়। দৈর্ঘ্যে ইহা ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। (আ) **জেজুনাম** (jejunam), ডিওডেনাম বাদ দিলে সমগ্র ক্ষুদ্রান্ত্রের অবশিষ্টাংশের

ইহা ⅔ ভাগ ও (হ) **ইলিয়াম** (illium) ⅗ ভাগ মাত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরকার গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি হইতে এক প্রকার পাচক রস বাহির হয়। এই রসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষরিত **আন্ত্রিক রস** (succus entericus) বলে।

আমাশয় হইতে আগত আংশিকভাবে জীর্ণ ও মণ্ডে পরিণত আম্লিক (acidic) ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর কতকগুলি পাচক রসের সাহায্যে ক্ষারত্বে (alkaline) পরিণত হইয়া আরও জীর্ণ হয়। তিন প্রকার পাচক রস ক্ষুদ্রান্ত্রের ঐ সকল জীর্ণ দ্রব্যের উপর কার্য্য করে—যকৃত (liver) হইতে নিঃসৃত **পিত্তরস** (bile), অগ্ন্যাশয় (pancreas) হইতে নিঃসৃত **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) ও ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে ক্ষরিত **আন্ত্রিক রস** (succus entercius)।

(ক) যকৃত হইতে নিঃসৃত **পিত্তরসে** (bile) কোন **কিণ্বসত্ত্ব** (enzyme) নাই। ইহা অগ্ন্যাশয় রসকে (pancreatic juice) ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে কার্য্য করিতে সাহায্য করে। ইহা চর্বি শোষণ কার্য্যের সহায়ক এবং দেহ হইতে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া দেয়।

(খ) অগ্ন্যাশয় হইতে নিঃসৃত **অগ্ন্যাশয় রসে** (pancreatic juice) নিম্নলিখিত কিণ্বসত্ত্বগুলি (enzymes) আছে: (১) **ট্রিপ্‌সিন** (Trypsin): আন্ত্রিক রসস্থিত উত্তেজক (activator) এণ্টারোকাইনেজের (enterokinase) সাহায্য লইয়া ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য্য করে এবং ইহাকে পলিপেপটোনে (polypeptones) পরিণত করে। (২) **এমাইলেজ** (Amylase): ইহা শ্বেতসার ও শর্করার উপর কার্য্য করিয়া সরল শর্করা মল্টোজ (maltose) এ পরিণত করে। (৩) **ম্যালটেজ** (Maltase): ইহা সরল শর্করা মল্টোজকে (maltose) গ্লুকোজে (glucose) পরিণত করে। (৪) **সুক্রেজ** (Sucrase): ইহা শর্করাকে ফ্রাকটোজ (fructose) ও গ্লুকোজে (glucose) পরিণত করে। (৫) **লাইপেজ** (Lipase): ইহা চর্বি জাতীয় অংশের উপর কার্য্য করিয়া ইহাকে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে (glycerol and fatty acid) পরিণত করে।

(গ) ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে নিঃসৃত **আন্ত্রিক রসে** (succus entericus) নিম্নলিখিত কিণ্বসত্ত্বগুলি আছে: (১) **ইরেপ্‌সিন** (irepsin): ইহা প্রোটিনাংশের উপর কার্য্য করে এবং ট্রিপসিনের সহিত একযোগে ইহাকে এমাইনো অ্যাসিডে

খাদ্যের উপাদানের নাম	কিণ্বসত্ত্ব	উৎপত্তিস্থল	পরিবর্ত্তনের কাজ
I. শ্বেতসার ও শর্করার (Carbohydrate) উপর	(i) টায়ালিন (Ptyalin)	লালাগ্রন্থি	অদ্রবণীয় শ্বেতসার হইতে মল্টোজ ও ডেক্সট্রি
	(ii) এমাইলেজ (Amylase)	অগ্ন্যাশয়	শ্বেতসার ও শর্করা হইতে মল্টো
	(iii) ইন্‌ভার্টেজ (Invertase)	ক্ষুদ্রান্ত্র	শর্করা (Canesugar) হইতে গ্লুকোজ ও ফ্রাকটো
	(iv) সুক্রেজ (Sucrase)	অগ্ন্যাশয়	শর্করাকে ফ্রাকটোজ গ্লুকোজে পরিণত ক
	(v) ম্যালটেজ (Maltase)	অগ্ন্যাশয় ও ক্ষুদ্রান্ত্র	শর্করার সরল অংশ মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত ক
	(vi) ল্যাকটেজ (Lactase)	ক্ষুদ্রান্ত্র	শর্করার সরল অংশ ল্যা টোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালা টোজে পরিণত ক
II. প্রোটিনের (Protein) উপর	(i) পেপসিন (Pepsin)— আমাশয় রসের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) সাহায্য লইয়া	আমাশয়	প্রোটিন হইতে পেপটোনে
	(ii) ট্রিপসিন (Trypsin)— ক্ষারকীয় মাধ্যমে কার্য্য করে ও আন্ত্রিক রসস্থিত উত্তেজক এণ্টারোকাইনেজ-এর সাহায্য লয়	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন হইতে পেপটোন পলিপেপটাই
	(iii) ইরেপসিন (Irepsin)— ক্ষারকীয় মাধ্যমে কার্য্য করে	ক্ষুদ্রান্ত্র	প্রোটিন ও ইহার সরল অ হইতে এমাইনো অ্যাসি
III. চর্ব্বির (Fat) উপর	লাইপেজ (Lipase)	আমাশয় ও অগ্ন্যাশয়	চর্ব্বি হইতে গ্লিসারল ও ফ্যা অ্যাসি

(amino acid) পরিবর্ত্তিত করে। (২) **ইন্‌ভার্টেজ** (invertase): ইহা **জটিল** শর্করার উপর কার্য্য করে এবং তাহাদের ফ্রাকটোজ (fructose) ও গ্লুকোজে (glucose) পরিণত করে। (৩) **ম্যালটেজ্** (Maltase) : ইহা শর্করার সরল অংশ মল্টোজকে (maltose) গ্লুকোজে পরিণত করে। (৪) **ল্যাকটেজ্** (Lactase) : ইহা শর্করার সরল অংশ ল্যাকটোজকে (lactose) গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে (glucose and galactose) পরিণত করে।

(খ) **বৃহদন্ত্র** (Large intestine) : এই অন্ত্র অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট। ইহা ক্ষুদ্রান্ত্রকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার চারিটি অংশ : (ক) **সিকম্** (secum) : ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (খ) **কোলন্** (colon) : বৃহদন্ত্রের একটি প্রধান অংশ ; ইহার আবার তিনটি বিভাগ আছে—(১) উর্দ্ধগামী কোলন্, (২) অনুপ্রস্থ কোলন্ ও (৩) অধোগামী কোলন্, (গ) কোলনের পর **মলভাণ্ড** (rectum) এবং (ঘ) সর্ব্বশেষে **মলদ্বার** (anus)।

ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে জীর্ণাবশিষ্ট খাদ্য আংশিক তরল অবস্থায় বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। এখানে কোন পাচক রসের নিঃসরণ হয় না। খাদ্যের জলীয় অংশ এবং কিছু লবণ এখানে শোষিত হয়। অতঃপর খাদ্যের পরিত্যক্তাংশ মলভাণ্ডে উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মলের আকারে পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

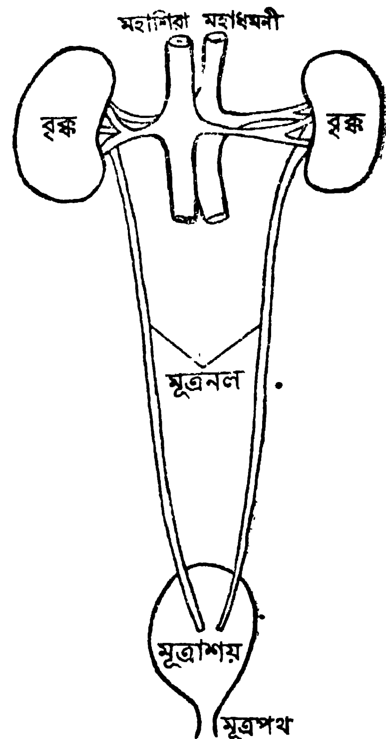
কিণ্বসত্ত্বের কার্য্য (Functions of enzymes) : আমাদের দেহের বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং উত্তাপ ও শক্তিস্হজনের জন্য যে ছয়টি মূল উপাদান আবশ্যক—প্রোটিন (protein), শ্বেতসার ও শর্করা (carbohydrate), চর্ব্বি (fat), লবণ (salt), জল (water) ও ভিটামিন (vitamin)—তাহা আমরা বিভিন্ন খাদ্য হইতে গ্রহন করি। দেহ এই উপাদনগুলিকে সরল অবস্থায় পাইতে চায় কিন্তু আমাদের খাদ্যে সাধারণতঃ এই উপাদানগুলি জটিল অবস্থায় থাকে। সেই-জন্য ভুক্তদ্রব্যগুলি আমাদের পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন স্থান দিয়া ধীরে ধীরে চালিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে নিঃসৃত নানাপ্রকার পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হয়। এই পাচক রসগুলিতে বিভিন্ন প্রকার কিণ্বসত্ত্ব (enzymes) বর্ত্তমান থাকে এবং ইহাদের প্রভাবে খাদ্যের মূল উপাদানগুলির জটিলাংশ দেহ-গ্রহণোপযোগী সরল উপাদানে পরিবর্ত্তিত হয়। কিণ্বসত্ত্বগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিলেও নিজেরা অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহারা অনুঘটকের (catalyst)

কার্য্য করে। **কোলয়ডিয়ল* জৈব অনুঘটককে** (collodial organic catalyst) **কিণ্বসত্ত্ব** (enzymes) বলে। বিভিন্ন প্রকার পাচক রস অন্তর্গত বিভিন্ন কিণ্বসত্ত্বগুলির সহিত আমরা পূর্ব্বেই পরিচত হইয়াছি এবং উহাদের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। ২৭৫ পৃষ্ঠায় ইহাদের একটি সারনী দেওয়া হইয়াছে।

রেচনতন্ত্র (Excretory System)

দূষিত পদার্থ ত্যাগ করা জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবদেহ হইতে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও নিঃশ্বাস বায়ু—এই চারিটি রেচ (excreta)—অন্ত্র, বৃক্ক, ত্বক্ ও ফুস্‌ফুস্ সাহায্যে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। ত্বকের বিষয়, মলের কথা ও নিঃশ্বাস বায়ুব কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইবার আমরা বৃক্ক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বৃক্ক (Kidney) **:**—উদরের মধ্যে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে প্রায চার ইঞ্চি লম্বা সীমবীজের আকারের দুইটি যন্ত্র আছে, তাহাদিগের নাম **বৃক্ক** বা **কিডনী** (kidney)। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে এক একটি নল (ureter—প্রায ১০।১২ ইঞ্চি লম্বা) তলপেটে অবস্থিত **মূত্রথলির** (bladder) সহিত সংযুক্ত।



১৭৮নং চিত্র—বৃক্ক, মূত্রনল ও মূত্রাশয়

বৃক্কের কার্য্য (Functions of kidney)**:** জীবনক্রিয়ার ফলে দেহের

* কোন দ্রবকে (solvent) যখন কোন পদার্থের অতি সূক্ষ্মকণা প্রলম্বিত অবস্থায় (suspended) সদা সঞ্চরণশীল থাকে তখন এইরূপ পদার্থ দুইটির অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে কোলয়েড (colloid) বলে।

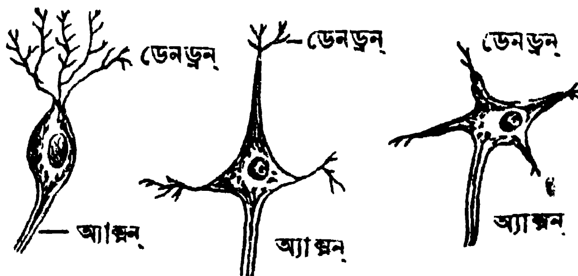
বিভিন্ন অংশে নানাবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়। রক্ত সেই সকল পদার্থ শোষণ করিয়া বৃক্কে উপস্থিত হইলে বৃক্কের কোষগুলি রক্ত হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয় এবং তাহা মূত্রে পরিণত করে। বৃক্কের দ্বারা নিয়ত মূত্র প্রস্তুত হইয়া মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয়। মূত্রথলির গায়ে পেশী আছে। তাহাদের সঙ্কোচনের ফলে মূত্রত্যাগ হয়।

এই কার্য্য ব্যতীতও বৃক্ক অন্যান্য কার্য্য করে। ইহা রক্তের ক্ষারত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করে এবং রক্তরসের (blood plasma) বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত নিয়ন্ত্রিত রাখে।

স্নায়ুতন্ত্র বা **নার্ভতন্ত্র** (Nervous System)

দেহের যেখানেই যে কার্য্যই হউক সকলই নার্ভতন্ত্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত। নার্ভতন্ত্র বুঝিতে হইলে নার্ভ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

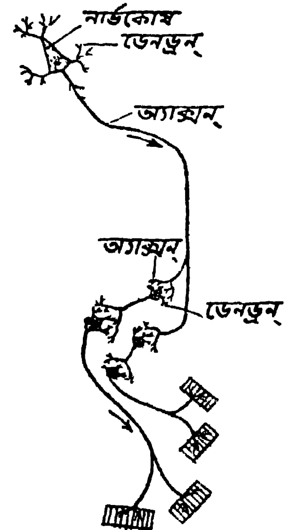
নার্ভ বা **স্নায়ু** (Nerve): আমাদের দেহস্থ নার্ভগুলির গঠন সূত্রবৎ ও বর্ণ পীতাভ। ইহাদের উৎপত্তি হয় **নার্ভকোষ** (nerve cell) হইতে। নার্ভকোষগুলি আকারে ও আয়তনে পরস্পর হইতে বিভিন্ন। ইহাদের প্রত্যেকের



১৭৯নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকার নার্ভকোষ

মধ্যে প্রোটোপ্লাজম্ ও একটি নিউক্লিয়স্ আছে। প্রত্যেক কোষেরই একটি করিয়া দীর্ঘ প্রায় শাখাহীন রজ্জু (one process) বা **অ্যাক্সন্** (axon) ও নাতিদীর্ঘ শাখাবিশিষ্ট রজ্জু (branched processes) বা **ডেনড্রন্** (dendron)

থাকে। ডেনড্রনের সংখ্যা কোষে একাধিকও হইতে পারে। যখন অ্যাক্সনের চতুর্দ্দিকে ক্রমে একটি আবরণ জন্মায় তখন উহাকে **নার্ভসূত্র** (nerve fibril) বলে। ইহারা কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া একেবারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে না পৌঁছাইয়া কিছুদূর যাইয়া ডেনড্রনের মত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং অন্য কোষের ডেনড্রনের সহিত মিলিত হয়। নার্ভগুলি নার্ভসূত্রের একটি গুচ্ছ। অনেক সময় ইহাকে নার্ভরজ্জু বলা হয়। কোথাও কোথাও এই নার্ভরজ্জুর উৎপত্তিস্থান ঈষৎ স্ফীতাকার; স্ফীত স্থানের নাম স্নায়ুগ্রন্থি (ganglion)।

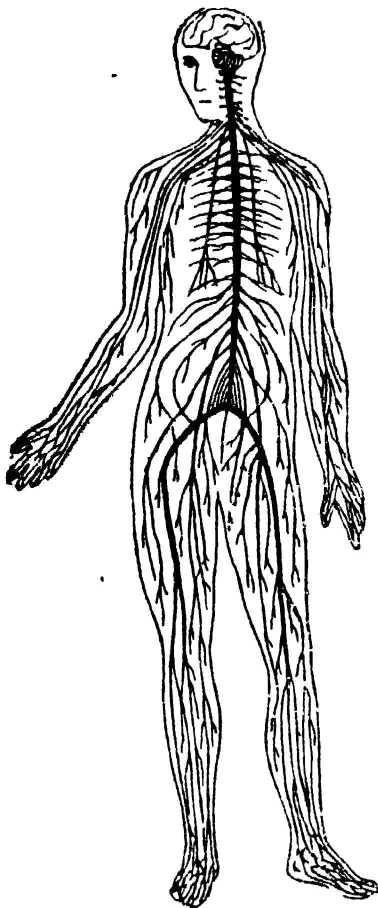


১৮০নং চিত্র—বিভিন্ন কোষের অ্যাক্সন ও ডেনড্রনের সংযুক্তি

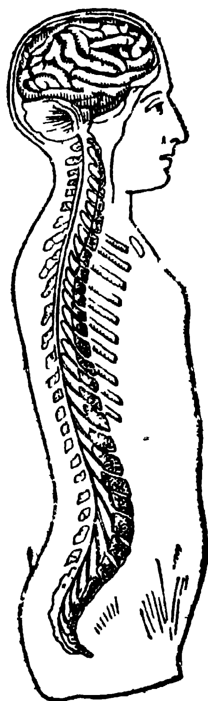
নার্ভের প্রকারভেদ (Types of nerves): নার্ভ উত্তেজনা চালনা করে। কার্য্য হিসাবে নার্ভ দুই প্রকার: (১) যে সকল নার্ভ শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে সুষুম্নাকাণ্ডের পশ্চাদ্ভাগ অথবা মস্তিষ্কের দিকে উত্তেজনা চালনা করে, তাহাদিগকে **অন্তর্ব্বাহী** (afferent) বা **সংজ্ঞাবাহী** (sensory) নার্ভ বলে। সাধারণতঃ ইহাদের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি। (২) যে সকল নার্ভ সুষুম্নাকাণ্ডের সম্মুখভাগ কিংবা মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া দেহের সর্ব্বস্থানের পেশীর সঞ্চালন করায় কিংবা গ্রন্থির রস নিঃসরণে সাহায্য করে, তাহাদিগকে **বহির্ব্বাহী** (efferent) বা **চালক** (motor) নার্ভ বলে। এই উভয় প্রকার নার্ভই একই স্নায়ুকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং তাহাদের গঠনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

নার্ভতন্ত্র বা **স্নায়ুতন্ত্র** (Nervous System):—মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড ও অসংখ্য নার্ভ লইয়া নার্ভতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক হইতে ১২ জোড়া বা ২৪ টি **মস্তিষ্ক-স্নায়ু** (cranial nerves) বাহির হইয়াছে। ইহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, মুখমণ্ডল ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, মধ্যচ্ছদা এবং পাকস্থলীতে যায়। ইহাদের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বার নার্ভগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়া না গিয়া সরাসরি উক্ত ইন্দ্রিয়-

গুলিতে গমন করে। সুষুম্নাকাণ্ডের উভয় পার্শ্ব হইতে ৩১ জোড়া বা ৬২ খানা **সুষুম্না-স্নায়ু** (spinal nerves) নির্গত হইয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে গিয়াছে।



১৮১নং চিত্র—নার্ভতন্ত্র



১৮২নং চিত্র—সুষুম্নাকাণ্ডের সহিত মস্তিষ্কের যোগাযোগ

মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের অন্তর্গত স্নায়ুগুলিকে **কেন্দ্রীয় স্নায়ুমালা** বা **মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড সংপৃক্ত স্নায়ুমালা** (cerebro spinal nervous system) বলে।

বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি ও দেহ সঞ্চালন এই সকল স্নায়ুমালার সাহায্যে সংঘটিত হয়। আবার সুষুম্নাকাণ্ড হইতে নির্গত সুষুম্না-স্নায়ুগুলি কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাহাদের দেহ হইতে অনেক স্নায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তাহারা **সমব্যথী স্নায়ুমালার** (sympathetic nervous system) অন্তর্গত। এই জাতীয় স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের কর্তৃত্ব মানিয়া চলে না এবং আপনাদের আপনারাই চালনা করে বলিয়া ইহাদিগকে স্বাধীন বলে। আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত উত্তেজনার বিরুদ্ধে দ্রুত ও চরমভাবে কার্য্য করাই সমব্যথী স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য আধুনিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে মস্তিষ্কের কিছু প্রভাব এই স্নায়ুতন্ত্রের উপর বর্ত্তমান।

প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (Reflex action) : নার্ভতন্ত্রের মূলে রহিয়াছে যেমন নার্ভ-কোষ তেমনি আমাদের দেহ চাঞ্চল্যের মূলে আছে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় অন্তর্ব্বাহী উত্তেজনা বহির্ব্বাহী উত্তেজনায় পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার জন্য সাধারণতঃ (ক) একটি গ্রাহক ইন্দ্রিয়, (খ) তৎসংশ্লিষ্ট একটি অন্তর্ব্বাহী স্নায়ু, (গ) কেন্দ্রসংলগ্ন একটি বহির্ব্বাহী স্নায়ু ও (ঘ) চাঞ্চল্য উৎপাদনের জন্য পেশী বা গ্রন্থি আবশ্যক। সমস্ত প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উত্তেজনায় সাড়া মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে অন্য কোন কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হইতে পারে।

রান্নাঘরে একখানা লোহার হাতা অত্যন্ত গরম অবস্থায় রহিয়াছে। তুমি তাহা না জানিয়া উহাতে হাত দিলে। হাতের কতকগুলি নার্ভ তৎক্ষণাৎ সুষুম্নাকাণ্ডে সংবাদ পাঠাইল যে, হাতাখানা অত্যন্ত গরম। তথা হইতে অপর কতকগুলি নার্ভের দ্বারা হাতের পেশীর প্রতি আদেশ আসিল সঙ্কুচিত হইয়া হাত সরাইয়া লও। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ মত কাজও হইল। এইরূপ সংবাদ প্রেরণ ও আদেশ বহন মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঘটিয়া থাকে; ইহা মস্তিষ্কের অনুভূতি সাপেক্ষ নহে।

রাত্রিকালে রাস্তায় চলিতেছ। সম্মুখে রাস্তার উপর রজ্জু পড়িয়া আছে। অস্পষ্ট আলোকে তোমার মনে হইল সাপ; তৎক্ষণাৎ তুমি দুই পা পিছাইয়া গেলে। সম্মুখে সাপ দেখিয়া চক্ষুর নার্ভ মস্তিষ্কে সংবাদ পাঠাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক হইতে নার্ভের দ্বারা পায়ের পেশীতে ও পিছাইতে আদেশ হইল। কিন্তু মস্তিষ্কে খবর পৌঁছিলে যখন জানা গেল উহা সাপ নয়, একটা দড়ি মাত্র, তখন পুনরায় চলিবার আদেশ হইল এবং তোমার পা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এক্ষেত্রে অবশ্য মস্তিষ্ক কার্য্য করিতেছে।

নার্ভতন্ত্রের কার্য্য (Functions of Nervous System) :—আমাদের দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, বেদনাবোধ, উষ্ণতাবোধ, স্পর্শানুভূতি ; ভাল-মন্দের বিবেচনা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ; দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ইচ্ছানুসারে অথবা কখনো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই চালনা করা ইত্যাদি কার্য্যসমূহ নার্ভতন্ত্রের সাহায্যে সংঘটিত হয়। নার্ভগুলি টেলিগ্রাফের তারের মত দেহের সমস্ত অংশে কোথায় কি হইতেছে সেই সংবাদ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডে বহন করিয়া আনে এবং সেখান হইতে আজ্ঞা বহন করিয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে।

খাদ্য ও উহার উপাদান

(Food and its ingredients)

খাদ্য বা খাদ্যের কার্য্য (Functions of food) : যে কোন আহার্য্যই খাদ্য নহে। আহার্য্যের কার্য্যকারিতা দেখিয়া একটি দ্রব্যকে খাদ্য বলা হয়। যে সকল সামগ্রী আহার করিলে (ক) শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়, (খ) শরীরের দৈহিক ক্ষয়পূরণ হয়, (গ) আবশ্যকমত কার্য্য করিবার শক্তি জন্মায়, (ঘ) সকল অবস্থায় শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষিত হয় এবং (ঙ) শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি জন্মে, তাহাই **খাদ্য** (food) বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ আমরা প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ এই তিন শ্রেণীর খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। যে কোন দ্রব্যই আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি না কেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য-উপাদান (nutritive principle) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন—(১) **প্রোটিন** ; (protein) (২) **শ্বেতসার ও শর্করা** (carbohydrate) ; (৩) **চর্ব্বি** (fat) ; (৪) **লবণ** (salt) ; (৫) **জল** (water) ; (৬) **ভিটামিন** বা **খাদ্যপ্রাণ** (vitamin)। ইহাদিগের মধ্যে প্রোটিন, লবণ ও জল আমাদের দেহগঠনের ও ক্ষয়পূরণের সাহায্য করে। চর্ব্বি ও শর্করা শরীরের কর্ম্মশক্তি ও উত্তাপ সৃষ্টি করে। ভিটামিনগুলি আমাদের দেহে রোগের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

১। **প্রোটিন** (Protein)—মাছ, মাংস, ডিমের শ্বেতাংশ, ছানা, দুধ, ডাল, আটা প্রভৃতি খাদ্য হইতে আমরা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যসার পাইয়া থাকি। প্রোটিন একটি যৌগিক পদার্থ। ইহাতে যথেষ্ট সোরাজান (nitrogen) আছে। ইহার উপাদান হইতেছে অঙ্গার (carbon), উদজান (hydrogen) ও সোরাজান (nitrogen)। আমাদের দেহের পক্ষে প্রাণীজাতীয় প্রোটিন উদ্ভিজ্জজাতীয় প্রোটিন অপেক্ষা বেশী মূল্যবান, কারণ উদ্ভিজ্জজাতীয় প্রোটিন পরিপাক করা বেশ কঠিন। প্রোটিন দ্বারা কোষের গঠন ও ক্ষয়পূরণ হইয়া থাকে। ইহার অভাবে শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই জাতীয় খাদ্য হইতে দেহমধ্যস্থ নানাপ্রকার রসও উৎপন্ন হয়।

২। **শ্বেতসার ও শর্করা** (Carbohydrate)—আটা, চাল, সাগু, বার্লি, আলু, শটি প্রভৃতি শ্বেতসার খাদ্য। চিনি, গুড়, মধু, মিছরি, আখ, খেজুর রস, নানাবিধ ফলের মিষ্টিরস প্রভৃতি খাদ্যে যথেষ্ট শর্করা বা চিনি থাকে। শাক-সব্জীতে 'সেলুলোজ' জাতীয় দ্রব্য থাকে। শ্বেতসার, শর্করা ও সেলুলোজের উপাদান অঙ্গার (carbon), উদজান (hydrogen) ও অম্লজান (oxygen)। শ্বেতসার ও শর্করার দহনে দেহের উত্তাপ জন্মে, তাহা ছাড়া ইহারা কিছু মেদও উৎপন্ন করিয়া থাকে। সেলুলোজ আমাদের দেহ হইতে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩। **চর্ব্বি** (Fat)—মাখন, ঘৃত, তৈল, প্রাণীর চর্ব্বি, দুধ প্রভৃতি হইতে চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। চর্ব্বির উপাদান অঙ্গার (carbon), উদজান (hydrogen) ও অম্লজান (oxygen)। চর্ব্বি দহনে দেহের উত্তাপ জন্মে ও উহা শরীরে মেদরূপে জমা থাকে। ইহা যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের রস নিঃসরণে সাহায্য করে।

শ্বেতসার, শর্করা ও চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া প্রায় একরূপ, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্যই আমাদের আবশ্যক।

৪। **লবণ** (Salt)—শাক-সব্জী, ফলমূল, দুধ, প্রভৃতি খাদ্যে অল্পবিস্তর পরিমাণে নানাজাতীয় লবণ থাকে। তাহাদের মধ্যে সাধারণ লবণ প্রধান। তাহা ছাড়া রান্নার এবং খাইবার সময় স্বতন্ত্রভাবে লবণ অনেক খাদ্যের সহিত যোগ করা হয়।

অস্থি, মাংস, রক্ত প্রভৃতি দেহের উপাদানগুলি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার

লবণের আবশ্যক। সাধারন লবণ আমাশয়ের লবণাম্ল (hydrochloric acid ; HCl) উৎপন্ন করে এবং উহা রক্তেরও একটি উপাদান। লৌহঘটিত লবণ ডিম, কাঁচকলা, গম, পালম্ ও কলমী শাক, পলতা প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় লবণ লোহিতকণিকার একটি উপাদান। ইহার অভাবে দেহ ফ্যাকাসে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পটাস্‌ঘটিত লবণ আমাদের নার্ভ ও পেশীকে সুস্থ করিয়া রাখে। আলু, দুধ ও নানাজাতীয় ফল হইতে ইহা পাওয়া যায়। আমাদের অস্থি ও দন্তের প্রধান উপাদান চুণঘটিত লবণ। ইহা ডাল, ফুলকপি, গুড়, কমলালেবু, ডিম, দুধ, নানাজাতীয় ফল ও শাক হইতে পাওয়া যায়। চাল, ডাল, আটা, কমলালেবু, ফুলকপি, পালম্ শাক্, বিলাতি বেগুন, মাছ প্রভৃতি খাদ্য হইতে ফস্‌ফরাসঘটিত লবণ পাওয়া যায়।

৫। **জল** (Water)—শরীরের সর্ব্বত্র জল থাকে। মানবদেহের ওজনের শতকরা প্রয় ৭০ভাগ জল। জল পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে, রক্তকে তরল রাখে, এবং ঘর্ম্ম ও মুত্রের সহিত থাকিয়া দেহের দূষিত পদার্থগুলিকে বাহির করিয়া দেয়। আমাদের কঠিন ও তরল খাদ্যে যথেষ্ট জল থাকে। তাহা ছাড়া আমরা জল পান করিয়া থাকি।

৬। **ভিটামিন** (Vitamin)—পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার খাদ্য আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু অধ্যাপক **হপ্‌কিনস্** (Prof. Hopkins) পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ঐ পাঁচটি ছাড়া খাদ্যের আর একটি উপাদান আছে, তাহাদের নাম **খাদ্যপ্রাণ** বা **ভিটামিন**। তাঁহার পরীক্ষাদ্বারা ইহা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভিটামিনহীন খাদ্য যতই পুষ্টিকর হউক না কেন, উহা দ্বারা আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব। অনেকের ধারণা, **ভিটামিন পদার্থই শক্তির কেন্দ্র কিন্তু ইহা সত্য নহে**। খাদ্যে এই উপাদানের অভাব ঘটিলে, দেহের বৃদ্ধি হয় না এবং শরীর রোগপ্রবণ ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। মানুষের দীর্ঘায়ুর উপর ইহার কিছুটা প্রভাব আছে। ইহার অভাব ঘটিলে সংক্রামক শোথ, (epidemic dropsy), স্কার্ভি (scurvy), বেরিবেরি (beriberi), রিকেট (ricket) প্রভৃতি রোগ উৎপত্তি হয়।

ভিটামিন জিনিসটা যথার্থ স্বরূপ এখন প্রায় জানা গিয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা মুখ্যতঃ উদ্ভিদ্‌জগতের

অবদান এবং প্রাণীরা উদ্ভিদ্ হইতে ইহা পাইয়া থাকে। নানা প্রকৃতির ভিটামিন আছে। তাহাদের বিভিন্ন উৎপত্তিস্থান ও বিভিন্ন রোগের উপর তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। এ পর্য্যন্ত যতগুলি ভিটামিনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি প্রধান। ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে তাহাদের নাম দেওয়া হয়—এ, বি, সি, ডি এবং ই। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি আছে। **এ ডি এবং ই ভিটামিন চর্ব্বিতে দ্রবণীয়। বি এবং সি ভিটামিন জলে দ্রবণীয়।**

এ-ভিটামিন (Vitamin A)—ইহা দেহ বৃদ্ধি করে, চক্ষু সুস্থ রাখে এবং দেহে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি দেয। খাদ্যের এ-ভিটামিন সিদ্ধ বা রন্ধনে নষ্ট হইযা যায় না।

ইহা ঘি, ননী, মাখন, কাঁচা দুধ, পালম্ শাক, বাঁধাকপি, বিলাতি বেগুন, ডিম, কড্ মাছের তৈল প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এ-ভিটামিনের অভাব হইলে চক্ষুরোগ, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া প্রভৃতি রোগ জন্মে।

বি-ভিটামিন (Vitamin B)—এই ভিটামিন নার্ভকে উত্তেজিত করে, পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং বেরিবেরি ও পেলাগ্রা (pellagra) রোগ প্রতিরোধ করিযা থাকে। ইহার অভাব ঘটিলে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদ্‌রোগ জন্মিয়া থাকে।

বি-ভিটামিন আছাঁটা চাল, গম, পালম্ শাক, বিলাতি বেগুন, কাঁচা দুধ, দধি, বাঁধাকপি, আলু, নারিকেল, বরবটি, ডিমের কুসুম প্রভৃতি খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সি-ভিটামিন (Vitamin C)—ইহাও নানারূপ রোগের প্রতিরোধক। ইহার অভাব ঘটিলে স্কার্ভি (scurvy) রোগ জন্মিয়া থাকে।

সকল প্রকার লেবু, মটরশুটি, বিলাতি বেগুন, পালম্ শাক, মূলা, আনারস, আঙুর, লঙ্কা, বাঁধাকপি প্রভৃতি খাদ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ডি-ভিটামিন (Vitamin D)—ইহার সাহায্যে মাংসপেশী দৃঢ় হয়। ইহার অভাব ঘটিলে রিকেট (ricket) রোগ জন্মে।

ডিমের কুসুম, মাছের যকৃতের তৈল ও কাঁচা দুধে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আটার রুটি, গম, মাখন প্রভৃতিতে কম পরিমাণে ডি-ভিটামিন পাওয়া যায়।

ই-ভিটামিন (Vitamin E)—ইহা মাতৃস্তনে দুগ্ধ ও সন্তানোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাব ঘটিলে সন্তানজননশক্তি কমিয়া যায়। কড্‌লিভার অয়েল, ডিমের কুসুম, আছাঁটা গম, যব প্রভৃতিতে ইহা অল্পমাত্রায় বিদ্যমান।

চীনাবাদাম ও মহুয়ার তৈল, কলের ময়দা ও কলের চিনি, কলের ছাঁটা চাল, ভেজিটেবল ঘি, পোড়া ঘি, শুষ্ক শাক-সব্জী প্রভৃতি খাদ্যে ভিটামিন প্রায় থাকে না। এই সকল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

পরিপূরক বা সুসম খাদ্য (Balanced diet):—পরিপূরক বা সুসম খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তোমাদের একটা কথা জানা দরকার। তোমরা সকলেই জান, সকল জিনিসের মান নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট একক আছে যেমন দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের একক হ'ল ইঞ্চি (বৃটিশ বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী), সেন্টিমিটার (ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী) ইত্যাদি, তেমনি খাদ্যমান নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট একক আছে। খাদ্য গ্রহণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য দেহে তাপ সৃজন। সেইজন্য তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণের এককই খাদ্যমান স্থির করে। তাপের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় ক্যালোরি (calorie) এককের সাহায্যে। ক্যালোরি যে কতখানি তাপ নির্দ্দেশক সেকথাও তোমরা জান। এক গ্রাম জলকে 1°C উত্তপ্ত করিতে যতখানি তাপ লাগে তাহাই এক ক্যালোরি। ইহার সাহায্যেই আমরা খাদ্যমান নির্ণয় করি। বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা কোন্ মানুষের কি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই গবেষণার পূর্ব্বেও মানুষ প্রকৃতির শাসনে এই ব্যাপারটা অনুভব করিত। যেমন ধর, যাহারা মেরুপ্রদেশে বাস করে, তাহাদের শরীরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক উত্তাপের প্রয়োজন। এজন্য অশিক্ষিত ও অসভ্য এস্কিমোদের গবেষণা করিতে হয় নাই। প্রকৃতিই তাহাদের ঐ প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছে। এস্কিমোরা হরিণ শিকার ও নানাপ্রকার মৎস্য শিকার করিয়া খায়। ইহাই তাহাদের শরীরে প্রচুর তাপের সৃষ্টি করে।

এখন তোমাদের খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ দিতেছি। সাধারণ কর্ম্মশীল পুরুষের প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি এবং একজন সাধারণ কর্ম্মশীল স্ত্রীলোকের জন্য প্রায় ২৭০০ ক্যালোরি উত্তাপ দরকার। কঠোর পরিশ্রমশীল পুরুষের জন্য প্রায় ৪০০০ ক্যালোরি উত্তাপের প্রয়োজন এবং শিশুদের বয়সের উপর নির্ভর করে।

আমাদের খাদ্য এইভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে খাদ্যে **বিভিন্ন উপাদানগুলি** হইতে আমরা ঐ পরিমাণ ক্যালোরি আহরণ করিতে পারি। একটি খাদ্যের উপাদান হইতে বেশী ক্যালোরি গ্রহণ করা স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ। এইজন্যই পরিপূরক বা সুসম খাদ্যের গুরুত্ব। নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া হইল :—

প্রোটিন (Protein)	···১০০ গ্রাম	(৪১০ ক্যা:)
চর্ব্বি বা ফ্যাট (Fat)	···১০০ গ্রাম	(৯৩০ ক্যা:)
শ্বেতসার ও শর্করা (Carbohydrate)	···৪০০ গ্রাম	(১৬৪০ ক্যা:)
		মোট ২৯৮০ ক্যা:

অবশ্য যে ক্যালোরিমান খাদ্য ক্রয করা হয তাহা দেহ সমস্তটাই পায না, কারণ কিছুটা রন্ধনের সময নষ্ট হয এবং কিছুটা পরিপাক ক্রিযায নষ্ট হয। খাদ্যের পরিমাণ নিম্নলিখিত কযেকটা বিষযের উপর নির্ভর করে—

(ক) **বয়স ও লিঙ্গ** (Age & Sex) **:**—প্রোটিন ও চর্ব্বি শিশুদিগের ও বালকবালিকাদিগের অধিকতর প্রযোজন, কারণ তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী চঞ্চল ; ফলে তাহাদের শরীরে ক্ষয বেশী হয ও এই সময তাহাদের শরীরের বৃদ্ধি হয। একজন স্ত্রীলোকের কার্য্য পুরুষের অপেক্ষা লঘু।

(খ) **শরীর গঠন** (Formation of the body) **:**—দৈহিক গঠনের উপর খাদ্যের পরিমান নির্ভর করে। দেহের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ওজনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয।

(গ) **শারীরিক অবস্থা** (Physicai condition of the body) **:**—অলস বা অসুস্থ অবস্থায় কর্ম্মঠ ও সুস্থ অবস্থা অপেক্ষা কম খাদ্যের প্রযোজন হয। অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমে প্রোটিন, শ্বেতসার ও শর্করা এবং চর্ব্বি বেশী দরকার হয়।

(ঘ) **জলবায়ু** (Climate) **:**—জলবায়ুর উপর যে খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে সেকথা তোমাদের আগেই বলিযাছি। শীতকালে বা শীতপ্রধান দেশে, গ্রীষ্মকাল বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা অধিক খাদ্যের প্রযোজন হয।

খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিষযে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমত:, খাদ্যে যেন কোনরূপ ভেজাল না থাকে। দ্বিতীযত:, দৈনন্দিন খাদ্যে ক্যালোরি-

মানের পরিমাণ এরূপ হইবে যে সমুচ্চিতি ক্রিয়ার (metabolism) কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে। তৃতীয়তঃ, দৈনন্দিন খাদ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে থাকিবে। গবেষণা-দ্বারা এই তথ্যটি সম্বন্ধে এখন অনেক কিছুই জানা গিয়াছে। খাদ্যে খাদ্য-উপাদানগুলি কিরূপ পরিমাণে থাকিবে তাহা তোমাদের পূর্ব্বেই উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থতঃ, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য সহজপাচ্য, মুখরোচক, সুস্বাদু ও প্রকৃতিপ্রদত্ত হওয়া চাই। খাদ্য প্রকৃতিপ্রদত্ত না হইলে ভিটামিনের অভাবহেতু নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। খাদ্য সহজপাচ্য না হইলে পরিপাকযন্ত্রকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করা হইবে. কারণ যন্ত্রমাত্রেরই এই নিয়ম, যে যতটা কাজ করিতে পারে ততটা কাজ দিবে, না হইলে অকালে বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। খাদ্য সহজপাচ্য ও মুখরোচক না হইলে, যথেষ্ট পরিমাণ লালা নিঃসরণ হইবে না, ফলে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিবে। সেইজন্য নানাপ্রকার ঝাল-মশলা দিয়া খাদ্য রন্ধন করা হয়, কিন্তু অধিক পরিমাণ মশলা, ঘৃত বা তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করা অনুচিত, কারণ ইহার ফলে পাচনতন্ত্র অধিক পরিশ্রম করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

Questions

1. Briefly describe the human skeleton.
2. Give a short account of the structure of tooth.
3. What do you know of muscles ? What are its functions ?
4. Describe the important muscles of arm and leg.
5. Name the sense organs and give a short account of each one of them.
6. Why do we perspire in hot and moist weather ? Explain the function of the skin in this connection.
7. Why do we need air for iife ? Explain what it does and how it is carried through the body.
8. Describe briefly the process of digestion of food in the alimentary canal.

9. Give an account of juices that participate in the process of digestion.
10. What are enzymes? Describe their action in details.
11. What are the organs that are responsible for the removal of excreta from our body? Discuss the functions of kidney.
12. How do you classify foodstuffs? Explain what kinds of food are required to balance the loss of the system.
13. What are vitamins? Give an account of the varieties of vitamins and their significance in dieteties.
14. What classes of food are mainly responsibe for (a) building new tissues, (b) maintaining energy.

কয়েকটি সাধারণ খাদ্যের উপাদান

গড় শতকরা হিসাব

খাদ্য	জল	প্রোটিন	শ্বেতসার ও শর্করা	চর্ব্বি	লবণ
চাল	১৩	৮	৭৭½	১	½
গম	১৪	১৪	৭০	১	১
গাভী দুগ্ধ	৮৭	৪	৪	৪	১
সাদা মৎস্য	৭৮	১৮	১	২	১
ডিম	৭[illegible]	১৪	—	১০½	১½
মাংস	৭৫	১৯	১	৪	১
মাখন	১১½	½	½	৮৭	½
গোল আলু	৭৫	২	২২	৪/১০	৭/১০
কাঁচকলা	১৩	৪	৮০	½	২½

বিভিন্ন খাদ্যে ভিটামিনের তালিকা

ভিটামিন

খাদ্য	ভিটামিনের নাম
চাল	এ, বি
গম	এ, বি, ই
কাঁচা দুধ	এ, বি, সি, ডি
মৎস্য	এ, বি
মাংস	এ, বি
ডিম	এ, বি, ডি, ই
ঘৃত	এ
আলু	এ, বি, সি
বাধাকপি	এ, বি, সি
ফুলকপি	এ, বি
পালম্ শাক	এ, বি, সি
বিলাতি বেগুন	এ, বি, সি
কমলালেবু	এ, বি, সি
পেঁয়াজ	এ, বি, সি
নারিকেল	এ, বি
মটরশুঁটি	এ, বি, সি
মসুর	এ, বি, সি
কলাই	এ, বি, সি